শ্রীশ্রীশুকদেবকথামৃত

——০(*)০——

পরম ভাগবত বৈষ্ণবাচার্য্য

প্রভুপাদ শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী

মহোদয়ের উপদেশাবলী

প্রথম ভাগ

—ঃ)*(ঃ—

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

সন ১৩৪৮।

মূল্য ১৲ এক টাকা

প্রকাশক :—

শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

১৯-সি, সিমলাই পাড়া লেন,

পাইকপাড়া, কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

১। প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত গৌরহরি গোস্বামী।
৫-সি, গোঁসাইপাড়া লেন, হাটখোলা, কলিকাতা।

২। শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী।
রামরাজাতলা, হাওড়া।

৩। শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ বাখণ্ডি।
২৮, মুন্সীগঞ্জ রোড্, খিদিরপুর, কলিকাতা।

৪। শ্রীযুক্ত মঙ্গল চাঁদ শেঠ।
এম্, এল্, সাহা লিমিটেড্, ৫।১, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

৫। শ্রীযুক্ত কালীপদ বিশ্বাস। (প্রকাশক)
১৯-সি, সিমলাইপাড়া লেন, পাইকপাড়া, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ্‌চী

মানসী প্রেস

৭৩, মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী

রাধাবল্লভ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্

১।৪এ, কাঁটাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে

২য় ও ৩য় ফর্ম্মা মুদ্রিত।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

—:*:—

প্রভু!

আপনি অসীম করুণা ও প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহরূপে পরমদয়াল পতিত-পাবন জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আপনার অশেষ কল্যাণগুণে মুগ্ধ হইয়া আপামর সর্ব্বসাধারণের চিত্ত স্বতঃই আপনার শ্রীচরণতলে আকর্ষিত ও সসম্ভ্রমে প্রণত হইত। শ্রীভগবানের কৃপাশক্তি সর্ব্বোপরি বলবান্; তাই আপনি 'বাহিরে আচার্য্যরূপে' মাদৃশ অস্পৃশ্য অধমকেও 'জগতে দুর্ল্লভ' আপনার সুখশীতল শ্রীচরণপ্রান্তে বসিবার অধিকার দিয়াছিলেন এবং যে সমস্ত প্রাণস্পর্শী অমৃতোপম উপদেশবাণী আপনার শ্রীমুখকমল হইতে নিঃসৃত হইয়া নিরন্তর শত শত দুঃখী-তাপী জীবের সন্তপ্ত প্রাণ শান্তির সুস্নিগ্ধ ধারায় শীতল করিয়া দিত, আপনি 'অন্তরে অন্তর্য্যামীরূপে' আমার মত ক্ষুদ্র ও নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তির হৃদয়ে একটা করুণার প্রেরণা দিয়া জগতের কল্যাণার্থে সেই শ্রবণমঙ্গল উপদেশবাণীগুলির কিছু কিছু সংগ্রহ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভু! আপনি আজ আমাদিগকে ছাড়িয়া লোকান্তরে—নিত্যধামে—চলিয়া গিয়াছেন; তাই আপনার আশীর্ব্বাদ শিরোধার্য্য করিয়া এবং আপনার কৃপাকেই একমাত্র সম্বল করিয়া আপনারই নির্দ্দেশমত সেই উপদেশবাণীগুলি—আপনারই দেওয়া নিধি—যথাশক্তি গ্রথিত করিয়া আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত উদ্দেশে আপনার শ্রীকরকমলে অর্পণ করিলাম; গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা সার্থক হইল।

আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী সেবক—

কালীপদ।

আবির্ভাব—
৮ই চৈত্র,
শুক্রবার,
৯৯ সাল।

তিরোভাব-
২১শে ভাদ্র,
বৃহস্পতিবার
শ্রীশ্রীজন্মাষ্টমী
১৩৩৫ সাল

"বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দং"

প্রকাশকের নিবেদন।

পরম ভাগবত গৌরগতপ্রাণ বৈষ্ণবাচার্য্য **প্রভুপাদ শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী** মহোদয় ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া সাধারণের নিকট, বিশেষতঃ ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। ইনি কলিকাতা মহানগরীর অন্তর্গত কুমারটুলী গোস্বামীপাড়ায় সন ১২৯৪ সালে ১৮ই চৈত্র, শুক্রবার, কলিপাবনাবতার শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম প্রভুপাদ শ্রীমৎ রাখালচন্দ্র গোস্বামী এবং মাতার নাম শ্রীমতী গোদাবরী দেবী। প্রভুপাদের পিতৃদেব পরম নিষ্ঠাবান্ তেজস্বী অথচ স্নিগ্ধ-প্রকৃতি ও ভক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন। ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণ বলিয়া থাকেন,—ধর্ম্মাচরণ করাই মানবের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য কর্ম্ম এবং শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ মানবজীবনের প্রধানতম উদ্দেশ্য। প্রভুপাদের পবিত্র ও ভজননিষ্ঠ জীবনের অধিকাংশ সময় কেবল উন্নত আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুসন্ধান এবং ভক্তিতত্ত্ব, ভগবৎ-তত্ত্ব প্রভৃতি পারমার্থিক ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনায় ব্যয়িত হইত। বলিতে কি, নিরন্তর ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গের আলোচনা দ্বারা ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবগণের অন্তরে ধর্ম্মভাব অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তিভাব জাগরিত ও বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়াই তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল।

যে সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ অর্থাৎ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে শ্রীভগবানের প্রতি জীবের ভক্তিভাব বিকশিত ও পরিবর্দ্ধিত হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তন্মধ্যে একখানি অতি উৎকৃষ্ট উচ্চশ্রেণীর ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া ধার্ম্মিক মহৎ ব্যক্তিগণের নিকট বিশেষরূপে সমাদৃত। উল্লিখিত ভক্তিগ্রন্থে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্ব মহাগুণগণ বৈষ্ণব শরীরে।
কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণের গুণ সকল সঞ্চরে॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় ভগবদ্ভক্তে শ্রীভগবানের গুণসকল সঞ্চারিত হয়। প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ করিলে অথবা আদর্শ ভক্তচরিত্র আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সেই অশেষ কল্যাণগুণময় শ্রীভগবানের কৃপায় এবং তাঁর শুভেচ্ছার প্রেরণায় ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণ ভগবদ্বিমুখ-মায়ামগ্ন সাধারণ জীবগণের জন্য সতত কাতর ও ব্যাকুল হইয়া থাকেন। প্রভুপাদের করুণামাখা প্রাণও বর্ত্তমান জগতের ভগবৎ-বহির্ম্মুখ জনগণের ভগবৎ-বিস্মৃতিজাত দুরবস্থা দেখিয়া সর্ব্বদাই কাতর থাকিত; তাই তিনি তাহাদিগকে ভক্তিপথে উন্মুখ করিয়া দিবার নিমিত্ত সতত ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকিতেন। আমাদের মত ভক্তিহীন জীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া সত্যই তাঁর প্রাণ কাঁদিয়াছিল তাই তিনি আমাদিগকে সতত ভগবদ্ভক্তিমূলক সদুপদেশ প্রদান করিতেন। তাঁর শ্রীমুখের উপদেশ এবং সুমধুর ভক্তি-কথাগুলি একদিকে যেমন সহজ, সরল ও সত্যের অভিব্যক্তি, তেমনি অন্য-দিকে সুগভীর গবেষণা-প্রসূত, দার্শনিক যুক্তি-সমর্থিত এবং সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বর্জ্জিত উদার ও সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহী। ধর্ম্মতত্ত্বের জটিল রহস্যগুলি তিনি এমনই সরল এবং সহজবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় ও অতি সুমধুর ভাবে বুঝাইয়া দিতেন এবং তাঁহার সরস ও জ্ঞানগর্ভ উপদেশবাণীগুলি এতই শ্রবণসুখদ ও প্রাণস্পর্শী ছিল যে, নানাস্থান হইতে বহু জিজ্ঞাসু ও পিপাসু ভক্ত ভগবৎ-গুণ-লীলা-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য নিত্য তাঁহার চরণপ্রান্তে আসিয়া সমবেত হইতেন এবং তাঁর শ্রীমুখে ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন ও নিজেদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেন। বলিতে কি, তাঁহার সেই মহান্ চরিত্রের সমুন্নত আদর্শ এবং ভক্তজনোচিত ব্যবহারের স্নিগ্ধতা এতই মনোরম ও লোভনীয় ছিল এবং তাঁর হসনোন্মুখ

সকরুণ চাহনি এতই প্রীতিপ্রদ ও আশাপ্রদ ছিল যে, যিনি একবার তাঁর চরণান্তিকে বসিয়া তাঁর শ্রীমুখের সদুপদেশ অর্থাৎ ভগবদ্‌বিষয়ক সংপ্রসঙ্গ শ্রবণ করিতেন তিনি নিত্য আসিয়া তাহা শুনিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেন না। এই ব্যবহারের সততা ও স্নিগ্ধতাই তাঁহার অনন্যসাধারণ শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব ছিল। আমরা তাঁর শ্রীচরণপ্রান্তে বসিয়া তাঁর শ্রীমুখের জ্ঞানগর্ভ তত্ত্বকথা ও সুধামাখা ভক্তিকথাগুলি শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ, এমন কি, সময়ে সময়ে আত্মহারা হইয়া যাইতাম।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা বর্ণন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"দুই ভাই হৃদয়ের থালি অন্ধকার।
দুই ভাগবত সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার॥
এক ভাগবত হয় ভাগবত শাস্ত্র।
আর ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র॥"

বাস্তবিক, প্রভুপাদের পবিত্র জীবনে আমরা এই 'ভক্তিরসপাত্র' পরম ভাগবতের চাক্ষুষ সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলাম। বলিতে কি, তাঁহার স্বভাবসুন্দর মানসমোহন সৌম্য বপু ও কমনীয় চরিত্রের মাধুর্য্য সন্দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভক্তি-প্রেমের মূর্ত্ত-বিগ্রহ বলিয়াই আমাদের মনে হইত। তাঁহার সুমধুর চরিত্রে আর একটি মহৎ গুণ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাঁহার মত আদর্শ মাতৃভক্ত আমরা খুব কমই দেখিয়াছি। তিনি প্রত্যহ ভক্তিভরে তাঁর মাতৃদেবীর চরণে প্রণাম করিতেন এবং মায়ের পদধুলি গ্রহণ না করিয়া কদাচ বাহিরে আসিতেন না।

জন্মজন্মান্তরের পুঞ্জীভূত পুণ্যফলে মাত্র কএক বর্ষ ধরিয়া সেই মহান্ আদর্শের পদপ্রান্তে বসিয়া তাঁর শ্রীমুখে সুধামাখা ভগবৎ-কথা শুনিবার

সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। আমাদের বড় আশা ছিল তাঁর পবিত্র সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া সেই মহান্ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া আমরা আমাদের জীবনের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইব। কিন্তু দুরদৃষ্টবশে আমাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই। বিগত সন ১৩৩৫ সালে ২১শে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, শুভ জন্মাষ্টমী পুণ্যতিথিতে তিনি আমাদিগকে শোকের সাগরে ভাসাইয়া নিত্যধামে গমন করিয়াছেন। সেই অবধি আমরাও তাঁর সুখময় সঙ্গে বঞ্চিত হইয়াছি। তাঁহার সুগভীর ঈশ্বর-বিশ্বাস এতই সুদৃঢ় ও অটুট ছিল যে শেষজীবনে প্রায় বৎসরাধিক কাল কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইয়া ভীষণ রোগযন্ত্রণা নিরবে অম্লান বদনে সহ্য করিয়াও একদিনের তরেও সেই পরম কল্যাণময় শ্রীভগবানের করুণায় সন্দিহান হন নাই; অন্তপক্ষে জীবনের শেষ মূহুর্ত্ত পর্য্যন্ত একমাত্র ভগবদ্মুখাপেক্ষী হইয়া স্বানুভবে বলিয়া গিয়াছেন,—'শ্রীভগবান্ মঙ্গলময়'। প্রভুপাদের জীবনের বহু জনহিতকর সদনুষ্ঠানের মধ্যে (১) যুগোচিত চাতুর্মাস্য হরিনাম-যজ্ঞের প্রথম প্রবর্ত্তন এবং (২) তাঁহার স্বগঠিত সকীর্ত্তন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম বিতরণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কালের কি অচিন্তনীয় গতি! কি অনতিক্রমনীয় প্রভাব! একদিন যাঁর শক্তিতে ও মধুর আকর্ষণে কুমারটুলী গোস্বামীপাড়ায় নিত্য কত শত সাধু, ভক্ত ও মহাত্মার সমাগম হইত; সুমধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনের উত্তাল আনন্দতরঙ্গে যে পবিত্র পুণ্যস্থানের বায়ু আকাশ পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণই তরঙ্গায়িত ও গৌরবান্বিত থাকিত; আজ তাঁর অভাবে ও অদর্শনে সেই স্থানের সকলই যেন নিরানন্দে ম্রিয়মাণ হইয়া গিয়াছে। আমরাও আমাদের সাধকজনোচিত চরিত্রের বৈশিষ্ট রক্ষা করিতে পারি নাই; তাই আজ তাঁর প্রতি এবং আমাদের পরস্পরের প্রতি সেই সুমধুর প্রীতির বন্ধন অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের

সকলই গিয়াছে, আছে কেবল তাঁর সুখময় সঙ্গের একটু একটু ক্ষীণ স্মৃতি।

প্রভু! আপনি নিত্য আনন্দময়ধামের অধিবাসী! বুঝি পথভুলে এই অনিত্যের দেশে এসে পড়েছিলেন; তাই অত্যল্পকালস্থায়ী অতিথির মত অতি অল্পদিন মাত্র এই মর-জগতে থাকিয়া নিজের মহৎপ্রাণতা ও করুণার সমুন্নত আদর্শ জীবের নিকট প্রকাশ ক'রে দিয়ে অকালে অতি শীঘ্রই স্বধামে ফিরে চ'লে গিয়েছেন। আপনি সহস্র সহস্র নরনারীর তাপদগ্ধ জীবন করুণার দৃষ্টিতে চেয়ে শীতল ক'রে দিয়েছেন; কত হতভাগ্য জীবের কলুষ-কলঙ্কিত অধোগামী জীবনস্রোত আপনার পবিত্র ও মহান্ আদর্শে উন্নতির পথে চালিত হ'য়ে জীবনের সার্থকতা লাভ করিয়াছে। আমাদের বিক্ষিপ্ত জীবনের দুরবস্থা দেখে সত্যই আপনার করুণামাখাপ্রাণ কেঁদেছিল, তাই আপনি আমাদিগকে আগে 'মানুষ' ক'রে দিয়ে সেই নিত্য আনন্দস্বরূপিনী ভগবদ্ভক্তির সন্ধান ব'লে দিতে চেয়েছিলেন। আমাদের মত অকৃতি অধম পতিত জীবের দুঃখে কাতর হ'তে—আমাদের মত হ'য়ে, আমাদের সহিত হৃদয় মিশিয়ে, আমাদের দুঃখে সহানুভূতি করিতে —এবং ভালবেসে হৃদয়ের গুরুভার লঘু ক'রে দিতে আমরা আপনার মত দরদী ব্যথার ব্যথী সাথের সাথী আর কাহাকেও দেখি নাই। আমাদের মনে হয়, বহুদিন জীবের ভাগ্যে এমন মহান্ আদর্শ লাভ ঘটে নাই। অন্ধ আমরা, অপানার স্বরূপ দেখিবার দিব্যদৃষ্টি আমাদের ফোটে নাই; মূর্খ আমরা, অপানার প্রকৃত আদর, প্রকৃত কদর, বুঝি নাই। যে অমূল্য রত্ন আমরা হারিয়েছি, ইহজীবনে আর আমরা তাহা পাইব না। প্রভু! আপনি একদিন আমাদিগকে ব'লেছিলেন,— "ওরে! শ্রীগুরুদেবের তুল্য জ্বালা জুড়াবার স্থান আর নাই।" আজ আপনার অভাবে আমরা সেই অমর বাণীর সত্যতা উপলব্ধি

করিতেছি। আমাদিগকে যদি আধ্যাত্মিকতায় অর্থাৎ পারমার্থিক ভক্তি-পথে বেঁচে থাকিতে হয়, তবে আপনার সেই সুখময় সঙ্গের ও আপনার পবিত্র প্রীতির স্মৃতিপূজাই আমাদের একমাত্র অবলম্বন; এবং আপনার শ্রীমুখের উপদেশবাণীগুলির সর্ব্বদা পঠন পাঠন ও তদনুযায়ী ধর্ম্মজীবন গঠন করাই আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য।

শ্রীভগবানের অপার করুণায় বিগত সন ১৩২৭ সালে দণ্ড-মহোৎসব উপলক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কিত পবিত্র পুণ্যভূমি এবং শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিত্য লীলাস্থান পানিহাটি গ্রামস্থ শ্রীল রাঘব-ভবনের মন্দির-প্রাঙ্গণে প্রভুপাদের প্রথম দর্শনের সৌভাগ্যলাভ এই অধমের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল। তখন তাঁহার নাম ধাম ইত্যাদির কোন পরিচয় আমি জানিতাম না। প্রথম দর্শনেই সেই সুদীর্ঘকায় সুগঠিত সুঠামবপু গৌরকান্তি পুরুষশ্রেষ্ঠের মধ্যে এমনই একটি অনন্যসাধারণ চিত্তাকর্ষক সুদৃপ্ত সাত্ত্বিক তেজ লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে দণ্ড-মহোৎসবে সমাগত এত লোকের মধ্যে কেবলমাত্র 'তিনি কে?' ইহাই জানিবার জন্য চিত্ত সহসা মুগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। সত্যই আমার মনে হইয়াছিল,—"ইনি কে? এই অসাধারণ প্রতিভামণ্ডিত বস্তুটি কি? যাঁহাকে বহু ভক্ত এবং শ্রীপাট খড়দহের গোস্বামী প্রভুগণ ঘেরিয়া অতি সমাদরে শ্রীল রাঘবের মন্দিরাভিমুখে লইয়া যাইতেছেন।" আরও মনে হইয়াছিল—"ইনি হয়তো আমার কোন সুদূর অতীতের সুপরিচিত প্রিয়তম প্রিয়-জন; নহিলে ইঁহার দর্শনমাত্রেই ইঁহার শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আমার মনপ্রাণ এরূপভাবে ব্যাকুল হইল কেন?" এই ঘটনার কিছুদিন পরে তাঁহার নিজ বাসভবনে ভক্তমণ্ডলী পরিবেষ্টিত অবস্থায় পুনরায় আমি তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া ধন্য হই এবং তাঁর শ্রীচরণে শরণ লই (১০ই মে, ইংরাজী ১৯২১ সাল)। তাঁর পবিত্র সঙ্গলাভের অল্পদিন

পরেই তিনি কৃপা করিয়া এই অস্পৃশ্য অধমকে তাঁর আশ্রিত সেবকরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমানের ঋষিকল্প ভজননিষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য **শ্রীপাদ গৌরসুন্দর ভাগবত-দর্শনাচার্য্য** প্রভুপাদের জীবনের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত আছেন। প্রভুপাদ তাঁহার নিকট কিছুদিন সংস্কৃত ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তিনি প্রভুপাদকে আন্তরিক ভালবাসিতেন ও স্নেহের চক্ষে দেখিতেন। প্রভুপাদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ এবং তাঁহার প্রতি প্রভুপাদের সশ্রদ্ধ আনুগত্য ও আদর্শ গুরুভক্তি আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতাম।

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎকৃপাপ্রাপ্ত পরম ভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য **শ্রীল রামদাস বাবাজী** মহাশয় প্রভুপাদের জীবন-লীলার সহিত বিশেষভাবে সুপরিচিত আছেন। তিনি প্রভুপাদকে যথেষ্ট ভক্তি করিয়া থাকেন। প্রভু-পাদও বাবাজী মহাশয়ের মত নিতাইগতপ্রাণ আদর্শ ভক্তের অশেষ গুণগ্রামের কথা শতমুখে আমাদের নিকট কীর্ত্তন করিয়া প্রীতিলাভ করিতেন। এমন কি, বাবাজী মহাশয় যখন মধ্যে মধ্যে আমাদের আশ্রম গৃহে প্রভুপাদকে দর্শন ও প্রণাম করিতে আসিতেন তখন তিনি সশিষ্যে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার মত আদর্শ ভগবদ্ভক্তের সংবর্দ্ধনা করিতেন এবং কিরূপে ভক্তের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে হয় তাহা নিজে আচরণ করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিতেন।

শ্রীশ্রীগৌরলীলা-গীতিকাব্যের অমর কবি গৌরগতপ্রাণ ভক্ত অবধূত ব্রহ্মচারী **শ্রীপাদ বিশ্বরূপ গোস্বামী** প্রভুপাদের জীবন-লীলার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠভাবে অন্বিত ছিলেন এবং বহুবর্ষ ধরিয়া প্রভুপাদ-পরিচালিত সঙ্কীর্ত্তন সম্প্রদায়ের অগ্রণী ও প্রধান কর্ম্মী হইয়া নামযজ্ঞ মহোৎসবাদিতে যোগদান করিয়া জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম প্রচার করিতেন। প্রভুপাদ

তাঁহার ভক্তজনোচিত সুমধুর চরিত্রে মুগ্ধ হইয়া অকৃত্রিম স্নেহে তাঁহাকে নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনিই তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভাবে ভাবিত দেখিয়া 'বিশ্বরূপ' এই নামে ডাকিতেন। শ্রীপাদ বিশ্বরূপের শ্রীগৌরলীলা বর্ণনের এবং শ্রীকৃষ্ণলীলা ও শ্রীগৌরলীলা বিষয়ক কীর্ত্তন-গীতিগুলির মনোমুগ্ধকর ভাবমাধুর্য্যসম্বলিত ভাষাবিন্যাসের স্বভাবসিদ্ধ অদ্ভুত প্রতিভা দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সুললিত কণ্ঠে সেই সঙ্গীতগুলি শ্রবণ করিয়া তিনি পরম প্রীতি লাভ করিতেন।

শ্রীল শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর মধ্যমা কন্যা শ্রীমতী কৃষ্ণপ্রিয়া দেবীর বংশসম্ভূত ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর একনিষ্ঠ পরম ভক্ত প্রবীণতম মনীষী বৈষ্ণবাচার্য্য **শ্রীমৎ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ** মহোদয় প্রভুপাদের পবিত্র জীবনের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত আছেন। তাঁহার শতাধিক বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ জীবন শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের—প্রেমধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মের—প্রচারকল্পেই অতিবাহিত হইয়া আসিতেছে। তিনি আমার পরমারাধ্য আচার্য্যদেবকে প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং তাঁহার মত উদীয়মান আদর্শ ধর্ম্মাচার্য্যের স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভা ও মহানুভবতা দর্শন করিয়া বিশেষ সন্তোষলাভ করিতেন। গত বৎসর শ্রীধাম নবদ্বীপে শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অবস্থানকালে সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমি আমার প্রভুর শ্রীমুখের উপদেশবাণীগুলির পাণ্ডুলিপি কিছু কিছু তাঁহার নিকট পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি আমার প্রভুর কথাগুলিকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া বলিয়াছিলেন—"আপনার উপদেষ্টা শ্রীমৎ শুকদেব গোস্বামী মহোদয় আমার সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার উপদেশ বাণীর যে অংশগুলি আপনি আমাকে শ্রবণ করাইলেন তাহাতে আমি পরিতৃপ্তি লাভ করিলাম।

ভক্তির অনুশীলনাত্মক তাঁর- এই সহজ সরল অথচ সারগর্ভ উপদেশগুলি বড়ই উপাদেয়। এইগুলি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইলে তদ্দ্বারা জন-সমাজের সমূহ কল্যাণ সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এবিষয়ে আর কাল বিলম্ব করা উচিত নয়; কারণ মানুষের শরীর গতিকের কথা কিছু বলা যায় না।" বলিতে কি, শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের এইরূপ মন্তব্য প্রকাশে আমি আমার সুচিরসঞ্চিত অথচ শিথিলীভূত শুভ সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য তাঁহার ন্যায় বিশিষ্ট বৈষ্ণবাচার্য্যের ভিতর দিয়াই যেন ইঙ্গিতে আমার পরমারাধ্য আচার্য্যদেবেরই কৃপাদেশ পুনরায় প্রতিধ্বনিত হইল মনে করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত এই গ্রন্থপ্রকাশ কার্য্যে ব্রতী হই। আরও এক কথা এই যে, শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে বাল্যাবধি অতিশয় স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আসিতেছেন। বলিতে কি, তাঁহারই লেখনি প্রসূত ভক্তিগ্রন্থরাজি পাঠেই সেই পতিত-পাবন 'প্রেমের ঠাকুর' শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গের মধুময়ী লীলাকথায় আমার মন সর্ব্বপ্রথমে আকৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে বিশেষভাবে শ্রীমৎ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

প্রভুপাদ শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর আশ্রিত ও বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত বাগবাজার নিবাসী **শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়** ও খিদিরপুর নিবাসী **শ্রীযুক্ত শিবকৃষ্ণ রায়** এবং ঠাকুর হরনাথের আশ্রিত ও একান্ত অনুগত প্রিয় সেবক সারকিউলার রোড্ নিবাসী **শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র ঘোষ** প্রমুখ বিশিষ্ট ভক্তগণ প্রভুপাদের গুণমুগ্ধ হইয়া বহুদিন ধরিয়া তাঁহার সঙ্গ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পূজনীয় যোগীনবাবুর মত এমন সর্ব্ব সদ্‌গুণের আধার স্নিগ্ধপ্রকৃতি অন্তরনিষ্ঠ ভক্ত আমি খুব কমই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আমাদের আশ্রম গৃহে দৈনন্দিন ভগবৎ-কথা-প্রসঙ্গের আলোচনার সময় যেদিন যোগীনবাবু আগমন করিতেন সেদিন প্রভুপাদ

তাঁর মত মর্ম্মজ্ঞ ও রসজ্ঞ ভক্তের আগমনে বিশেষ প্রীতিলাভ করিতেন। তিনি এই গ্রন্থ প্রকাশ বিষয়ে আমায় যথেষ্ট উৎসাহিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তিনি আমার আন্তরিক ধন্যবাদার্হ।

জানি না পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবানের কি শুভেচ্ছায় এবং তদীয় আচার্য্যশক্তির প্রেরণায় সেই মহান্ ও পবিত্র আদর্শের চরণপ্রান্তে বসিয়া মাদৃশ অজ্ঞ, অভক্ত ও নিতান্ত অযোগ্য ব্যক্তি প্রভুপাদের শ্রীমুখের সুধামধুর উপদেশ ও ভক্তিভাবপূর্ণ কথাগুলি, আলোচনাকালে সূত্রাকারে তাহার নোট্‌বুকে টুকিয়া লইত এবং নিজ বাসায় আসিয়া নীরব নিস্তব্ধ গভীর নিশীথে প্রশান্তচিত্তে তাঁর কথাগুলি স্মরণ করিয়া আরও পরিস্ফুট করিয়া লিখিয়া রাখিত। একদিন আমাদের আশ্রমগৃহে বসিয়া আমি ও আমার সোদরপ্রতিম গুরুভ্রাতা শ্রীমান্ গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার নোট্‌বুকে লিখিত প্রভুর শ্রীমুখের কথাগুলি পড়িতেছিলাম ; এমন সময়ে তিনি হাসিতে হাসিতে সহসা আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কালীপদ ! ও কি পড়ছিস্ রে ?" আমি ব'ল্‌লাম—"প্রভু ! আপনারই শ্রীমুখের কথাগুলি লিখে নিয়েছি, সেইগুলি পড়ছি।" তিনি ব'ল্‌লেন—"দেখি, কি লিখেছিস্ ?" তারপর আমার নোট্‌বুকে লিখিত কথাগুলি প'ড়ে ব'ল্‌লেন—"বাঃ রে ! আমি যা যা ব'লে গেছি, তুই ঠিক ঠিক হুবহু সেই কথাগুলিই টুকে নিয়েছিস্ ; বেশ হ'য়েছে তো ! আমি আসনে ব'সে—নিতাই চাঁদ যখন যেমন বলিয়েছেন—তখন তেমনি ব'লে গেছি ; কিন্তু কখন কা'র কোন্ প্রশ্নের উত্তরে কি ব'লে গেছি, তা' আমারই স্মরণ নাই। তা ভালই হ'য়েছে, এইরূপ কিছু কিছু ক'রে কথাগুলো যদি টুকে রাখতে পারিস্, তবে ভবিষ্যতে এগুলো তোদের কাজে আসতে পারে। আর দ্যাখ্, এ সব কথা আমার নিজের কথা নয় বাবা ! সবই সেই পাগল প্রভু নিতাই চাঁদের অপার দয়ার

দান; যেমন বলান তেমনি তোদিগকে ব'লে যাই; এ সব কথা বলবার মত বিশেষ কোন লেখাপড়া বোধ আমার নাই।" বাস্তবিক, বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উল্লেখযোগ্য উচ্চশিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রভুপাদের ছিল না; তথাপি এই সমস্ত আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা —ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধীয় যুক্তিপূর্ণ ও জ্ঞানগর্ভ সৎকথা—কেমন করিয়া এমন সুললিত ভাষায় এবং সুমধুর ভাবে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে ব্যক্ত হইত তাহা তিনি নিজেই স্থির করিতে পারিতেন না। তাই অনেক সময় তাঁর শ্রীমুখে আমরা বলিতে শুনিয়াছি যে, এ সকল কথা তাঁর নিজের কথা নয়—সবই সেই পরম দয়াল পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দের করুণার প্রেরণা। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এমনি একটা অনন্যসাধারণ মহতী প্রতিভা ছিল, যাহাতে ভগবৎকথার আলোচনা প্রসঙ্গে কত উন্নত তত্ত্ব ও ভক্তিকথা তাঁর হৃদয়ে স্বভাবতঃই স্ফুরিত হইত।

আমার পরমারাধ্য আচার্য্যদেবের শ্রীমুখের অমূল্য উপদেশবাণী তাঁহার প্রকটকালে কিছু কিছু প্রবন্ধাকারে গ্রথিত হইয়া সন ১৩৩২।৩৩ সালে কলিকাতা বহুবাজার নিবাসী আমাদের শ্রদ্ধেয় পরম ভক্ত এবং প্রভুপাদের বিশেষ অনুগত শ্রীযুক্ত ললিত মোহন দে, বি, এল, মহোদয় কর্ত্তৃক "শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত" এবং "শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত কথা" এই নামে খণ্ডাকারে (সাতখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় সাতটি প্রবন্ধে মোট ১০৪ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। তার পর এযাবৎ তাঁর কোন উপদেশবাণী কাহারও কর্ত্তৃক মুদ্রিত পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নাই। আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের প্রেরণায় ও আদেশে তাঁর যে সমস্ত উপদেশবাণী আমার নোট্‌বুকে লিখিয়া লইয়া সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম, তাঁহার অপ্রকটের পর সেইগুলি গ্রন্থাকারে গ্রথিত ও প্রকাশিত করিবার জন্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চৌধুরী,

শ্রীযুক্ত গোবিন্দ লাল ঘোষাল, শ্রীযুক্ত যাদবানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযুক্ত গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বন্দোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রাসবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত দুলাল চন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত ননীগোপাল দত্ত, শ্রীযুক্ত সত্য চরণ মণ্ডল, শ্রীযুক্ত হরিপদ কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত নিতাই চরণ পাল, শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার বসু, শ্রীযুক্ত শুকলাল দাস বাবাজী ও শ্রীযুক্ত ভূপতি চরণ বাখণ্ডি প্রমুখ আমার গুরুভ্রাতাগণ তাঁহাদের অভিপ্রায় জানাইলেও নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরার জন্য এতদিন সেগুলি মুদ্রণের সুযোগ ও সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই। আজ ত্রয়োদশ বৎসর পরে আমার কর্ম্মজীবনের অবসরে সেই অন্তর্য্যামী অভয়দাতা মঙ্গলময় শ্রীগুরুদেবের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া তাঁর শ্রীমুখের উপদেশ-বাণীগুলির সারমর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমি আমার নিজের ভাষায় সেইগুলি সাজাইয়া এবং একত্র গ্রথিত করিয়া এই গ্রন্থ বিরচন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। যদিও মাদৃশ অজ্ঞ ও অনধিকারী ব্যক্তির পক্ষে প্রভুপাদের সহজ, সরল অথচ যুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ সদুপদেশগুলি ভাষায় যথাযথ সাজাইয়া গ্রন্থন করা বামনের চন্দ্রস্পর্শের ন্যায় প্রগল্‌ভতা প্রকাশ মাত্র, তথাপি তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃত সুমধুর নীতি ও ভক্তি-কথাগুলি ভক্তজনের আনন্দপ্রদ হইবে বলিয়া এই গ্রন্থে সেই উপদেশবাণীগুলির স্নিগ্ধ সরসতা, সুখবোধ্য ভাষার সৌন্দর্য্য এবং প্রাণস্পর্শী ভাবের মাধুর্য্য যথাশক্তি অব্যাহত রাখিতে বিশেষভাবে চেষ্টা করিয়াছি; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি তাহা সহৃদয় ভক্ত পাঠকগণেরই বিবেচ্য।

যে সাতটি প্রবন্ধ খণ্ডাকারে মুদ্রিত হইয়া পূর্ব্বে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল, মৎকর্ত্তৃক গ্রথিত ও প্রকাশিত এই গ্রন্থে নিবদ্ধ

প্রবন্ধগুলি সেগুলি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি আমার শ্রীগুরুদেবের নির্দ্দেশমত পূর্ব্ব প্রকাশিত গ্রন্থের ধারাবাহিক সংখ্যা (Continuation) হিসাবে "শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত" এই নাম দিয়াই গ্রন্থখানি মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে এই গ্রন্থের 'নামকরণ' লইয়া একটা অচিন্তিতপূর্ব্ব আপত্তি উত্থাপিত হয়;—"শ্রেয়াংসি বহুবিঘ্নানি"। অতএব আরব্ধ সৎকার্য্যে যাহাতে ভবিষ্যতে কোনপ্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হয় তদুদ্দেশ্যে বিশেষ কোন অনিবার্য্য কারণবশতঃ এই গ্রন্থের পূর্ব্বমনোনীত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া আমার শ্রীগুরুদেবের সম্পূর্ণ নাম দিয়া গ্রন্থের "শ্রীশ্রীশুকদেবকথামৃত" এই নামকরণ করিতে বাধ্য হইলাম এবং গ্রন্থের প্রথম এক ফর্ম্মা পুনর্মুদ্রিত করিয়া তাহার প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে (Page Heading এ) গ্রন্থের পরিবর্ত্তিত নাম সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম। সমগ্র গ্রন্থ ইতঃপূর্ব্বেই মুদ্রিত হইয়া যাওয়ায় সমস্ত ফর্ম্মার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় গ্রন্থের পরিবর্ত্তিত নাম বিন্যস্ত করিয়া দেওয়া একপ্রকার অসম্ভব; অতএব এই গ্রন্থে যে যে স্থলে "শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত" নাম মুদ্রিত হইয়া রহিল সহৃদয় পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক সেই সেই স্থলে "শ্রীশ্রীশুকদেব-কথামৃত" এই নাম হইবে বলিয়া বুঝিবেন। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে উহা সংশোধন করিয়া দেওয়া হইবে।

আদর্শ ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের প্রাণস্পর্শী উপদেশবাণীগুলি জগতের কল্যাণার্থে যে কোনরূপে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হওয়াই সর্ব্বথা বাঞ্ছনীয়, নতুবা তাঁহাদের আবির্ভাবের আংশিক প্রয়োজন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়—একথা বলা বোধ হয় কোন মতেই অযৌক্তিক হয় না। সেই জন্যই আমি আমার পরমকরুণ শ্রীগুরুদেবের কৃপাদেশ শিরোধার্য্য করিয়া এবং একটা শুভ উদ্দেশ্য লইয়া তাঁর শ্রীচরণ স্মরণ পূর্ব্বক এই গ্রন্থ প্রণয়ন কার্য্যে ব্রতী

হইয়াছিলাম। মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছায় "শ্রীশ্রীশুকদেবকথামৃত" প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। তাঁর ইচ্ছা হইলে এবং মহানুভব ভক্ত-জনের কৃপাশীর্ব্বাদ, আনুকূল্য ও উৎসাহ পাইলে আমার শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখের সুমধুর উপদেশবাণীগুলির অবশিষ্ট অংশ (যাহা আমার নিকট সংগৃহীত আছে) ক্রমশঃ এই গ্রন্থের অন্যান্য ভাগে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইতে পারে। এখন এই গ্রন্থখানি সাধকজীবন-লাভেচ্ছু নরনারীবৃন্দের কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রদ হইলেই আমার সমস্ত শ্রম-যত্ন সফল হইবে। শ্রীভগবানের মঙ্গলময়ী ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক্।

শুভ বিজয়াদশমী, মঙ্গলবার,
১৩ই আশ্বিন, সন ১৩৪৮ সাল।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৫৬।

মহৎ-পদরজঃপ্রার্থী—
বিনীত নিবেদক
শ্রীকালীপদ বিশ্বাস।

সূচীপত্র

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দৌ জয়তাম্

মঙ্গলাচরণ।

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন-সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতান্ শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥

আজানুলম্বিতভুজৌ কনকাবদাতৌ
সঙ্কীর্ত্তনৈকপিতরৌ কমলায়তাক্ষৌ।
বিশ্বম্ভরৌ দ্বিজবরৌ যুগধর্ম্মপালৌ
বন্দে জগৎপ্রিয়করৌ করুণাবতারৌ ॥

বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং স্মিতসুভগমুখং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং।
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকর-বসনং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্মগোপালবেশং ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধাগোবিন্দ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

শ্রীশ্রীশুকদেবকথামৃত

সাধকজীবন ও ভক্তির অনুশীলন।

যাহা মানবকে স্বরূপে ধরিয়া রাখে অর্থাৎ যাহা মানবকে তাহার স্বরূপ হইতে বিচলিত, ভ্রষ্ট বা বিচ্যুত হইতে দেয় না, তাহাই মানবের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম, নীতি ও সদাচারের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ধর্ম্ম হইতে শ্রীভগবানে ভক্তি এবং তৎকথা শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে, তাহাই মানবের পরম ধর্ম্ম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। একমাত্র শ্রীভগবানের প্রতি এই ভক্তির দ্বারাই মানবাত্মা সম্যক্ প্রসন্নতা লাভ করে। ভক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই আত্মার প্রসন্নতা জন্মাইতে পারে না। এই ভক্তি-ধর্ম্ম বা ভাগবত-ধর্ম্মই জীবকে তাহার স্বরূপে ধারণ করিয়া রাখে। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"ভক্তি বিনা জগতের নাহি অবস্থান।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

দেখ, ধর্ম্মাচরণের মূল উদ্দেশ্য শ্রীভগবানে ভক্তি ও প্রেম লাভ। ভগবদ্ভক্তি-বর্জ্জিত ধর্ম্মাচরণ কখনই শোভনীয় হইতে পারে না। শ্রীভগবানের প্রতি এই প্রেমভক্তির আস্বাদন এতই মধুর যে পূর্ব্বতন মনীষী ভক্তিশাস্ত্রকারগণ উহার লাভকে জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রেমভক্তির মাধুর্য্য অনুভব করিতে

হইলে মানবকে অবশ্যই একটা সাধক-জীবন নিয়মিতরূপে যাপন করিতে হইবে।

মনুষ্যত্বই মানবের ধর্ম্ম। এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হইলে অর্থাৎ মানবোচিত সদ্‌গুণরাশির সম্যক্ বিকাশ হইলে, মানব ভক্তি ও প্রেমের মাধুর্য্য অনুভব করিতে সক্ষম হয়। শ্রীভগবানে বিশ্বাস—এই মনুষ্যত্বের প্রথম স্তর। শ্রীভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা বিশ্বাস সুদৃঢ় হইলে, ক্রমশঃ যতই তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উৎকর্ষ লাভ হয়, ততই মানবের মন, একদিকে তাঁহার অনন্ত মহিমা ও অপরদিকে তাঁহার অপার করুণা ও মাধুর্য্য দর্শনে স্বতঃই তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ মনে হয়, এমন যে করুণাময় ও মাধুর্য্যময় শ্রীভগবান্ তাঁহার সহিত 'আমার' কি কোন সম্বন্ধ নাই? এই তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে করিতে যত প্রকার সম্বন্ধবোধ মানবের প্রাণে আছে, একে একে সেইগুলি তাঁহার প্রতি স্থাপন করিয়া মানুষ বুঝিতে পারে যে, তাহার প্রাণ কিছুতেই পরিতৃপ্ত হইতে পারে না, যতক্ষণ না সেই পরম কারুণিক মঙ্গলময় শ্রীভগবানের প্রতি একটা প্রীতি-ভালবাসার মধুময় সম্বন্ধ স্থাপন করা হয়। শ্রীভগবানের সহিত জীবের এই যে প্রীতি-ভালবাসার সম্বন্ধ স্থাপন,—ইহাকেই মহানুভব শাস্ত্রকারগণ **ভক্তি** আখ্যা দিয়াছেন।

এই ভক্তি মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিকী বৃত্তি। ইহা পূর্ব্ব হইতেই দয়াময় শ্রীভগবান্ জীবের হৃদয়ে ন্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষ আমরা, আমাদের চিত্ত নানাপ্রকার অবনত সংস্কারে সর্ব্বদা আচ্ছন্ন থাকে; তাই ঐ স্বাভাবিক ভক্তিভাব প্রকাশিত হইতে পায় না। বাহিরের যে সমস্ত আবর্জ্জনায় আমাদের হৃদয় মলিন ও কলুষিত হইয়া রহিয়াছে, কেবল সেইগুলি সরাইয়া দিলেই ভক্তির মধুময় ভাব স্বতঃই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। স্থির ও স্বচ্ছ জলের নিম্নস্থ পদার্থ যেমন সহজে

আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়, তরঙ্গায়িত মলিন জলে যে তেমন হয় না, একথা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার।

মানবাত্মার এই ব্যতিব্যস্ত অবস্থাকে সরাইয়া দিয়া শান্ত অবস্থা লাভ করিবার জন্য যে কিছু প্রয়াস বা চেষ্টা যত্ন,—ইহাকেই আপাততঃ আমরা **সাধন** বলিয়া থাকি। যিনি সর্ব্ব অবস্থার ভিতর দিয়া সর্ব্বদা নিজের শান্তিকে বজায় রাখিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন, তাঁহার সাধক-জীবন আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। দেখ, যে সমস্ত মানবোচিত সদ্‌গুণরাশির পরিপুষ্টির কথা ইতঃপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলা হইয়াছে, সেইগুলিরই এক একটিকে ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তি বলে। এই বৃত্তিগুলির যথাযথ অনুশীলন ব্যতীত ভক্তির মনোরম ভাব মানুষের হৃদয়ে কখন স্থায়ী হইতে পারে না। কাজেই সেইগুলির নিয়মিতরূপ অনুশীলন যে সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন, একথা বোধ হয় তোমাদিগকে বেশী করিয়া বলিতে হইবে না। এখন, এই ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তিগুলির মধ্যে প্রথমতঃ 'সৎসঙ্গ' সম্বন্ধে এস আমরা যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

সৎসঙ্গ।

দেখ, এই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া জীবনে নানাপ্রকার সাংসারিক সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করিয়া মানুষের মন যখনই ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হয়, তখনই সর্ব্বাগ্রে তাহার প্রাণে সৎসঙ্গ লাভের বাসনা উদয় হয়। বলিতে কি, যে দিন হইতে সৎসঙ্গে ভগবদ্‌গুণ-লীলা-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য মানুষের মনে একটা প্রবল ইচ্ছা জাগে, সেই দিন হইতেই তাহার প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন গঠনের ভিত্তি পত্তন হয়। অতএব সাধকজীবন-লাভেচ্ছু ব্যক্তির সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই যে,—নিজেকে সর্ব্বদা একটা সৎসঙ্গের গণ্ডীর মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া রাখা। এই সৎসঙ্গের তুল্য

উপকারী আর কিছুই নাই। যদিও ইহা আমাদিগকে সদ্যোসদ্যঃই শ্রীভগবান্ লাভ করিয়ে দেয় না সত্য, তথাপি এই সৎসঙ্গ প্রথম অবস্থায়, মানবের আত্মোন্নতির অন্তরায়-স্বরূপ বহুবিধ অসৎ প্রলোভনের হাত হইতে আমাদিগকে বাঁচাইয়া রাখে এবং প্রকৃত সাধকজীবন লাভের পক্ষে সমূহ সহায়তা ক'রে থাকে।

প্রশ্ন। 'সৎসঙ্গ' বলিতে আমরা কি বুঝিব ?

উত্তর। যাঁহারা সাধু, মহৎ বা ভগবদ্ভক্ত বলিয়া খ্যাত, তাঁহাদের সঙ্গ করা, তাঁহাদের সদুপদেশ শ্রবণ করা এবং তাঁহাদের সহিত সৎপ্রসঙ্গের আলোচনা করা,—এইগুলিকেই অপাততঃ তোমরা 'সৎসঙ্গ' বলিয়া বুঝিও। দেখ, পিপাসা নিবারণের জন্য আমাদিগকে যেমন নদী সরোবরাদি হইতে শীতল জল আহরণ করিয়া পান করিতে হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে জানিতে হইলে অবশ্যই আমাদিগকে ভগবৎ-তত্ত্ব-অভিজ্ঞ সাধু, ভক্ত বা মহাপুরুষদিগের কাছে যাইতে হইবে এবং তাঁহাদের সঙ্গ করিতে হইবে।

দেখ, শ্রীভগবান্ করুণাময় ; তিনি মরুভূমির মধ্যে যেরূপ স্থানে স্থানে মরু-উদ্যান সৃষ্টি ক'রে রেখেছেন, তেমনি এই সংসাররূপ মরুভূমির মধ্যেও তিনি তৃষিত তাপিত জীবের জন্য সাধু, ভক্ত বা মহাপুরুষরূপী এক একটি সুস্নিগ্ধ মরু-উদ্যান স্থানে স্থানে সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন। তাঁর এই বিরাট বিশ্বরাজ্যে ভক্তরূপী কল্পতরুর অভাব নাই। সেই সমস্ত ভক্তরূপী কল্পতরুর ছায়ায় দু'দণ্ড বসিলে এই সংসারের ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রাণ আপনিই স্নিগ্ধ ও শীতল হ'য়ে যায়। অতএব সাধু, ভক্ত ও মহতের পবিত্র সঙ্গে থেকে সর্ব্বদা সৎপ্রসঙ্গ আলোচনা করিতে তোমরা কখন অবহেলা করিও না। দেখ সৎসঙ্গ কি রকম জান? ঠিক যেন 'ইন্‌জেক্‌সনের ওষুধ'—খুব শিগ্র কাজ করে। সাধককে উন্নতির পথে

এগিয়ে দিতে এর তুল্য আর কিছু নাই। সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষগণ সমুন্নত জ্ঞানরাশির অক্ষয় ভাণ্ডার; তাঁহাদের আদর্শ চরিত্র এবং মধুময় প্রাণস্পর্শী উপদেশাবলী এই সংসারের মোহমুগ্ধ পথভ্রান্ত জীবের পক্ষে দিগদর্শন-স্বরূপ। তোমরা সর্ব্বদা তাঁহাদের সঙ্গ করিবে এবং তাঁদের হিতোপদেশগুলি শুনিবে—একই কথা দশবার শুনিবে। দেখ, মহৎ ব্যক্তিগণের উপদেশগুলি গভীর দার্শনিক যুক্তি সমন্বিত; কাজেই তাঁহাদের কথাগুলিকে সাধারণ কথা মনে ক'রে কখন অবজ্ঞা করিবে না। বারবার তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি শুনিতে শুনিতে তোমাদের হৃদয়ের কুসংস্কার-গুলি চ'লে যাবে, পূর্ণজ্ঞানে তোমাদের হৃদয় ভরিয়া যাইবে এবং সহসা কোনরূপ মোহ তোমাদিগকে অভিভূত করিতে পারিবে না। তোমরা হয়তো শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যাবে যে, মানুষের হৃদয়-ভরা এত অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ও আবর্জ্জনা আছে যাহাতে দু-দশখানা মিউনিসি-প্যালিটির বড় বড় ময়লা ফেলা গাড়ী (Scavenger Cart) ভর্ত্তি হ'য়ে যেতে পারে। সৎসঙ্গে থাকিয়া ক্রমাগত উন্নত জ্ঞানালোচনা করিতে থাকিলে জ্ঞানগুলি হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে যাবে; তারপর ঐ সমস্ত কুসংস্কার ও আবর্জ্জনারাশি মন থেকে চ'লে যাবে। তোমাদিগকে তো ব'লেছি যে, উন্নত সংস্কারগুলির আবির্ভাব ব্যতীত কখনই মানবচরিত্রের অন্তর্নিহিত অবনত সংস্কারগুলি নষ্ট হয় না এবং অনবরত সৎসঙ্গ ও সৎবিষয়ের চর্চ্চা ভিন্ন উন্নত সংস্কারগুলির আবির্ভাবেরও উপায়ান্তর নাই।

এমন অনেক সাধু মহাপুরুষের কথা আমরা শুনিতে পাই যাঁহারা যোগাদি ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অভিজ্ঞতা দ্বারা অনেক প্রকার অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। সাধারণ লোকে তাঁহাদের ঐ সমস্ত অলৌকিক শক্তির পরিচয় পাইয়াই তাঁহাদিগকে সাধু অথবা মহাপুরুষ বলিয়া মানিয়া লয় এবং নিজেদের কোনরূপ জাগতিক সুবিধা করিয়া লইবার জন্য তাঁদের

প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কিন্তু তোমরা জানিয়া রাখিও যে, সাধু সঙ্গের প্রকৃত ফল কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বুজরুকি শেখা বা কোনরূপ অলৌকিক শক্তি লাভ করা নয়। সাধু সঙ্গের প্রকৃত ফল কি তা জান? **মোহান্ধ ভগবদ্বহির্ম্মুখ জীবকে তার একটা অন্তর্দৃষ্টি জাগিয়ে দেওয়াই সাধুসঙ্গের প্রকৃত ফল।** আমাদের যে দৃষ্টি বহির্বিষয়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে আমরা সর্ব্বক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হইতেছি, সাধুসঙ্গ তাহাকে জোর ক'রে অন্তর্ম্মুখী করিয়া দিবে; ফলে, আমাদের নিজের ভিতরটা অনুসন্ধান করিবার জন্য একটা হুঁস্—একটা প্রবল ইচ্ছা ও চেষ্টা—জেগে যাবে; তখন নিজের ভিতরটা পরিষ্কার করিবার জন্য, অর্থাৎ নিজের চরিত্রে যেখানে যেখানে ছিদ্র বা গলদ (ইংরাজীতে যাকে বলে Weak points) আছে, সেগুলি শোধরাইবার জন্য একটা প্রবল চেষ্টা হইবে। প্রকৃত সাধুর পবিত্র সঙ্গের এমনই একটা শক্তি, এমনই একটা মহিমা যে, কিছুদিন তাঁহার সঙ্গ করিলেই বহির্ম্মুখী বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবের গন্তব্য পথের মোড় ফিরে যায়; তাহার অধোগামী জীবনস্রোত উন্নতির পথে চালিত হয়। এইজন্য শাস্ত্রাদিতে সাধুসঙ্গের মাহাত্ম্য-প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে,—'লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়'; 'ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা'। বাস্তবিক, একমাত্র সাধু-সঙ্গের ফলে জীব প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ ক'রে শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হয় এবং চরমে ভক্তি লাভ করতঃ পরমা শান্তি লাভ করিয়া ধন্য হয়। অতএব যাঁহারা নিজেদের সাংসারিক কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা করিয়া লইবার জন্য সাধুসঙ্গ করিতে যান, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে ঠকেন বই জেতেন না; কারণ যতদিন না মানবের একটা অন্তর্দৃষ্টি জাগে, ততদিন বহির্জ্জগতের বস্তু-বিষয় সম্বন্ধে তিনি যতই কেন জ্ঞানী হউন না, আত্মতত্ত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকায় তাঁহাকে

ঠিক ঠিক জ্ঞানবান্ লোক বলা যায় না। একজন ভগবদ্ভক্ত মহাত্মা বলিয়া গিয়াছেন,—"যেই জন কৃষ্ণ ভজে সে বড় চতুর" অর্থাৎ যিনি শ্রীভগবান্‌কে ভজনা করেন, তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানবান্।

প্রশ্ন। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁরা অনেক সাধু মহতের সঙ্গ করিয়াছেন বা করিতেছেন; কিন্তু তাঁদের চরিত্রের তেমন কোন বিশেষ উন্নতি হইতে দেখা যায় না। এরূপ হইবার কারণ কি?

উত্তর। ইহার কারণ কি জান? অনেকে সাধুসঙ্গ করিতে যান বটে, কিন্তু চোকে ঠুলি বেঁধে যান। দেখ, একটা বৃথা তর্ক করিবার প্রবৃত্তি লইয়া সাধুসঙ্গ করিতে গেলে কোন সুফলই লাভ হয় না; কারণ সাধু মহাপুরুষগণ বহুলোক-চরিত্র-অভিজ্ঞ; এক কথাতেই তারা হেতুবাদী তার্কিকের অযথা তর্ক-প্রবৃত্তি ধ'রে ফেলেন এবং তৎক্ষণাৎ নিজেরা একটু চেপে যান অর্থাৎ সেই অযথা তর্ককারীর সহিত বৃথা বাক্যব্যয় করেন না। কিন্তু ঠিক ঠিক জানিবার, বুঝিবার বা শিখিবার আকাঙ্ক্ষা লইয়া সাধু মহাত্মাদিগের নিকট গেলে, তাঁহাদের হৃদয়ে একটা স্পন্দন জাগিয়া যায়; তার ফলে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমুন্নত মধুময় তত্ত্বগুলি তত্ত্বজ্ঞান-লাভেচ্ছু জিজ্ঞাসু ও বিনীত ব্যক্তির নিকট ক্রমশঃ স্বতঃই প্রকাশিত ও উপলব্ধ হয়। সাধু মহাত্মাদিগের জ্ঞানভাণ্ডার সমস্ত জগদ্বাসী জীবের কল্যাণার্থে সর্ব্বদাই উন্মুক্ত থাকে; কিন্তু বৃথা এবং অযথা তর্ক করিবার প্রবৃত্তি নিয়ে গেলে সেই জ্ঞানভাণ্ডার হইতে কোন রত্ন আহরণ করা যায় না। অতএব অনুগত, বিনয়ী ও জিজ্ঞাসু হ'য়ে সাধু মহতের সঙ্গ করিতে হয়; চোকে ঠুলি বেঁধে সাধুসঙ্গ করিতে গেলে কোন সুফল লাভ হয় না। এ বিষয়ে একটি ছোট গল্প কথিত আছে, শুনিলে কথাটা তোমরা আরও স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিবে। গল্পটি এই :—একদিন হরপার্ব্বতী ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করিয়া কাশীধামের রাজপথে নগর

পরিদর্শন করিতেছিলেন। পার্ব্বতী একজন অতি দরিদ্র লোকের দুঃখ দেখিয়া মহাদেবকে বলিলেন—"নাথ! এই দরিদ্র লোকটির বড় কষ্ট, ইহাকে কিছু অর্থ দিলে এর কষ্ট দূর হয়।" তখন ঠাকুর বলিলেন,—"দেবি! দিলে কি হবে? ও তো নেবে না।" দেবী বলিলেন,—"সে কি! ও এত দরিদ্র এবং দুরবস্থাগ্রস্ত, ও অর্থ নেবে না, এ কেমন কথা?" ঠাকুর বলিলেন,—"তার প্রমাণ দেখবে?" এই কথা ব'লে তিনি, লোকটি যে পথে চলিয়া যাইতেছিল, তার অনতিদূরে একটি টাকার তোড়া ফেলে রেখে দিলেন। লোকটি বরাবর চোক্ চেয়েই আসিতেছিল; কিন্তু টাকার তোড়াটির কাছ বরাবর এসে দৈবাৎ তার মনে হ'ল,—'আচ্ছা, চোক্ বুজে কি পথ চলা যায় না? দেখাই যাক্ না'। এই মনে ক'রে সে চোক্ বুজে পথ চলিতে লাগিল। এইরূপে চোক্ বুজে খানিকটা রাস্তা চলিবার পর অর্থাৎ টাকার তোড়াটি যে স্থানে ছিল, সে স্থান পার হ'য়ে গিয়ে, তারপর সে চোক্ চাইল; ফলে, টাকার তোড়া লাভ তার ভাগ্যে ঘটিল না। চোকে ঠুলি বেঁধে সাধুসঙ্গ করিতে যাওয়াও ঠিক এইরূপ; অর্থাৎ হেতুবাদী তার্কিকগণ কখন সাধু মহাত্মাদিগের সদুপদেশ সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না; কাজেই তাঁহারা সাধুসঙ্গের সুফল লাভে বঞ্চিত হন।

প্রশ্ন। সাধু মহাত্মাদিগের পবিত্র সঙ্গগুণে মানবাত্মার যে যথেষ্ট উন্নতি হইয়া থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; বলিতে কি, জগতে যখনই যে কোন ব্যক্তি ধর্ম্মজীবনে উন্নতি লাভ করিয়াছেন, একমাত্র মহতের সঙ্গগুণই তার মুখ্য কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু আজকাল সেরূপ পবিত্র সৎসঙ্গ লাভ অতি দুর্ল্লভ। আমাদের মনে হয়, সেরূপ শুভ সুযোগ অর্থাৎ মহৎ-ব্যক্তির সঙ্গলাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে।

উত্তর। তোমরা সত্যই বলিয়াছ; যেরূপ মহৎ-ব্যক্তির সঙ্গগুণে মানবাত্মার উন্নতি লাভ হয়, সেরূপ সৎসঙ্গ পাওয়াও আজকাল বড়ই দুর্ঘট হইয়া পড়িয়াছে। সেদিকে দুই প্রকারের বাধা আছে; একে তো সাধু মহাত্মাগণ বৃথা তার্কিকের কাছে আত্মপ্রকাশ করেন না; যেহেতু তাঁরা তো তোমার আমার মত জগতের মুখাপেক্ষী নহেন, তাঁরা শ্রীভগবানে পূর্ণ-নির্ভরশীল; জগতের লোকের কাছে তাঁদের কোন লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার প্রত্যাশা নাই; কাজেই অযথা হেতুবাদী তার্কিকের কাছে তাঁরা প্রায়ই গা-ঢাকা দিয়ে থাকেন। আর অন্যপক্ষে আমাদেরও এমন সামর্থ্য নাই, যাহাতে আমরা তাঁদের সুগভীর চরিত্র ও আচরণের ভিতর প্রবেশ করিতে পারি এবং আমাদের এই অত্যল্প জ্ঞানবুদ্ধির দ্বারা তাঁদের মহান্ চরিত্রের সমালোচনা ক'রে তাহাদিগকে ঠিক ঠিক চিনে নিতে পারি। মহাপুরুষগণকে চেনা কেমন জান? ঠিক যেন পাহাড় দেখার মত। পাহাড় দেখিতে গেলে আমাদের মনে হয়,—'এই বুঝি পাহাড়ের খুব নিকটেই এসে পড়েছি'; কিন্তু যতই পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই আরও দূরে বোধ হয়; এবং স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, পাহাড়ের নিকট পৌছান, দূর হইতে যত সহজ ব'লে মনে হইতেছিল, প্রকৃতপক্ষে তাহা তত সহজ নয়। ঠিক সেইরূপ দুই চারি দিন সাধু মহতের সঙ্গ ক'রে মনে হ'তে পারে যে, তাঁদের জ্ঞান বুদ্ধি ও চাল চলন সব জেনে নিয়েছি—সব বুঝে ফেলিছি; অর্থাৎ তাঁদের কাছ থেকে যাহা জানিবার ও বুঝিবার ছিল, সে সব জানা ও বোঝা হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা' হয় না; যেহেতু একান্ত অনুগত ও শরণাপন্ন না হ'লে তাঁদের সমুন্নত ও গম্ভীর হৃদয়ের কিঞ্চিৎমাত্রও পরিচয় পাইবার উপায় নাই। তবে তোমাদিগকে তো ব'লেছি, ঠিক ঠিক জানিবার ও বুঝিবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁদের কাছে

গেলে এবং অনুগত ও শরণাপন্ন হ'য়ে কিছুদিন ধ'রে অনবরত তাঁদের সঙ্গ করিলে, ক্রমশঃ তাঁদের মহদনুভবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। কাজেই তাদৃশ স্থলে সৎসঙ্গ যে প্রচুর সুফলই প্রসব করে, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

আরও দেখ, সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষগণের সঙ্গ সর্ব্বত্র সুলভ না হইলেও তাঁহাদের সুগভীর জ্ঞানোপদেশপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থাদির অভাব নাই। সেই সমস্ত সদ্‌গ্রন্থ নিয়মিতরূপে পাঠ ও শ্রবণ করিলে মানব আধ্যাত্মিক জীবনে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করিতে পারে। অতএব মনোযোগপূর্ব্বক সাধু মহাত্মাদিগের জ্ঞানগর্ভ উপদেশপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থগুলি পাঠ অথবা শ্রবণ করিলেও সাধুসঙ্গের যথেষ্ট সুফল লাভ হয়।

শ্রদ্ধা।

দেখ, ভক্তির সহিত শ্রদ্ধার অতি নিকট সম্বন্ধ। সাধককে অন্যান্য সদ্‌গুণগুলি নিজ চরিত্রে আয়ত্ত করিবার পূর্ব্বে সাধু মহতের প্রতি এবং তাঁহাদের সদুপদেশের প্রতি এই 'শ্রদ্ধা' স্থাপন করিতে হয়। সাধনপথে ইহার প্রয়োজনীয়তা এত বেশী যে, মনীষী ভক্তিশাস্ত্রকারগণ যাবতীয় ভক্তির অনুশীলনের মধ্যে মহতের প্রতি এই 'শ্রদ্ধা'কে সর্ব্বপ্রথমে স্থাপনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; যথা,—"আদৌ শ্রদ্ধা"। বলিতে কি, আমরা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইয়া যদি সাধু মহতের সঙ্গ করিতে যাই, তবে তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে ততক্ষণ আমরা কিছুই শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না, যতক্ষণ না তাঁহাদের প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা স্থাপন করিতে পারিব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং" অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্

ব্যক্তিই জ্ঞানলাভ করিতে সমর্থ হন। আরও দেখ, আচার্য্যগণ শ্রদ্ধাবিহীন জনকে সদুপদেশ প্রদান করেন না; কেন না ভক্তিশাস্ত্র উহাকে একপ্রকার অপরাধ ব'লে গণ্য করিয়াছেন। এই শ্রদ্ধা সম্বন্ধে (ইংরাজীতে যাকে Regard করা বলে) তোমরা আমার এই কথাটি মনে রেখো যে, যদি কোন সূত্রে কোন মহৎ-ব্যক্তির প্রতি তোমরা একদিনও বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা স্থাপন ক'রে থাক, তবে সে শ্রদ্ধাটুকু খুব যত্নের সহিত বাঁচিয়ে রেখো, যেহেতু সেটুকুর দাম খুব বেশী। কালে সেই শ্রদ্ধার বীজ অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া মহৎ ফল প্রসব করিবেই করিবে। তবে, ব্যবহারিক জগতে এই শ্রদ্ধাকে বাঁচিয়ে রাখা যে একটা খুব শক্ত কাজ, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন। বুঝিলাম, মহৎ ব্যক্তির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা স্থাপন ব্যতীত কোন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায় না। কাঁহারও কোন সদ্‌গুণ সন্দর্শন করিলে তাঁহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার ভাব উদয় হওয়া স্বাভাবিক; কিন্তু যাঁহাকে অতি সজ্জন জানিয়া আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা অর্পণ করিলাম, হয়তো কাহারও মুখে তাঁহার সামান্য একটি দোষের কথা বা নিন্দার কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আমাদের সেই শ্রদ্ধার হ্রাস, এমন কি, হয়তো একেবারে নাশ হ'য়ে যায়। শ্রদ্ধা জিনিষটি যদি এত সহজেই নষ্ট হ'য়ে যায়, তবে উপায় কি?

উত্তর। এই জন্যই তো তোমাদিগকে এ বিষয়ে এত সাবধান হইতে বলিতেছি। শ্রদ্ধা বস্তুটি যদি এত ভঙ্গপ্রবণ ও অস্থায়ী হয়, তবে জগতে কাহারও নিকট হইতে তোমরা কিছুই জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবে না। এরূপ স্থলে তোমরা এই দুটি কথা মনে রাখিও। প্রথমতঃ জেনে রেখো,—মানব মাত্রেই দোষে গুণে জড়িত; যাহার দোষাংশ বেশী গুণাংশ অল্প, তাহাকেই আমরা অসৎ-প্রকৃতি দুর্জ্জন বলি এবং

যাঁহার গুণাংশ বেশী, দোষাংশ অল্প, তাঁহাকেই আমরা সাধু-প্রকৃতি সজ্জন বা মহাপুরুষ ব'লে থাকি। সম্পূর্ণরূপে দোষবর্জ্জিত বা গুণশূন্য মানুষ জগতে দেখা যায় না। কাজেই কাহারও মুখে কোন্ সাধু সজ্জনের সামান্য একটি দোষের কথা শুনিয়া, তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করিবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই; যেহেতু তাঁহার নিকট হইতে শিখিবার অর্থাৎ গ্রহণ করিবার যথেষ্টই আছে। অতএব এরূপ স্থলে তোমরা অদোষদর্শী ও গুণগ্রাহী হইবে। আর দ্বিতীয়তঃ, যে সাধুব্যক্তির সহিত তোমরা হয়তো বহুদিন ধরিয়া সঙ্গ করিয়াছ এবং তাঁর শ্রীমুখে বহু সদুপদেশ শ্রবণ করিয়া ও তাঁর অতি স্নিগ্ধ সদ্ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাকে তোমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান করিয়াছ, ভালরূপ না জেনে শুনে, যার তার একটা কথায় তোমরা যদি তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হও, তবে তার তুল্য অবিবেচনার কার্য্য এবং দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? আশা করি, কাহারও কোন কথায় কোন সাধু মহাপুরুষের প্রতি সহসা বীতশ্রদ্ধ না হইয়া ধীরভাবে এই দুইটি কথা মনে করিলে তোমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার প্রতি চিরদিনই অটুট থাকিবে। ফলে, সেই মহাপুরুষের একটি দিনের একটিমাত্র সদুপদেশের কথা স্মরণ করিয়াও তোমাদের মন, আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে তাঁহার চরণে সর্ব্বদা প্রণত থাকিবে।

অতঃপর তোমাদিগকে সাধক-জনোচিত 'সরলতা' সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, মনোযোগ দিয়া শুন।

সরলতা।

দেখ, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে তোমাদিগকে একটা সহজ, সরল ও আড়ম্বরশূন্য জীবন যাপন করিতে হইবে; কথায়, কাজে এবং লোক-ব্যবহারে সর্ব্বদা সরলতাকে অবলম্বন করিতে হইবে। আজকাল ব্যবহারিক জগতেই বল, আর আধ্যাত্মিক পথেই বল, একটা অপ্রয়োজনীয় আড়ম্বরপূর্ণতা এবং কপটতা অতিশয় প্রতিপত্তি লাভ করিয়া আসিতেছে। এই আড়ম্বরপূর্ণতা ও অসরলতা হইতে লোক-ব্যবহারে, বিশেষতঃ সাধক-জীবনে, সমূহ ক্ষতি হইতেছে; যেহেতু উহা প্রকৃত সত্য বস্তুটিকে গোপন করিয়া রাখিতেছে। ইহা এক প্রকার মায়া। ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য আমরা অনেক সাধু, সন্ন্যাসী অথবা ভক্ত নামে পরিচিত ব্যক্তির নিকট যাই বটে, কিন্তু অনেক সময় দেখিতে পাই তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত ধার্ম্মিকতা খুবই কম—নাই বলিলেই হয়; বাহিরে কেবল ধর্ম্মের বাহ্যাড়াম্বর—একটা কপটতার আবরণ দেওয়া ভান মাত্র। আন্তরিক সরলতার অভাববশতঃ অনেক স্থলে তাঁহাদের উপদেশগুলি হৃদয়গ্রাহী হয় না। অতএব জানিয়া রাখিও, ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সার সত্যগুলি উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে অতি অবশ্যই সরলতার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ সরল হইতে হইবে। আমরা দুটো কথা ব'লে—দুটো বচন আউড়ে—আর একজনকে মুগ্ধ ও প্রতারিত করিতে পারি বটে, কিন্তু নিজ নিজ হৃদয়কে প্রতারিত করিতে পারি না। যদি আমরা আমাদের নিজের দিকে চাহিয়া নিজ নিজ হৃদয়টি সমালোচনা করি, তবে আমাদের মধ্যে কেহই অস্বীকার করিতে পারিব না যে, আজিও আমরা ঠিক ঠিক সহজ, সরল এবং সত্যের পথ অবলম্বন

করিতে পারি নাই। চাই এই সহজ, সরল এবং সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করা। কি আশ্চর্য্য! আমরা একটা কথা অপরকে বলি, তাও মনে মনে কত প্যাঁচ এঁটে। ঐ প্যাঁচটা (ইংরাজীতে যাকে বলে Duplicity), ঐটাই মায়া। ঐ কপটতাই অর্থাৎ অসরলতাই আমাদিগকে ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্গত মধুময় সত্যবস্তুগুলিকে উপলব্ধি করিবার পক্ষে যথেষ্ট বাধা প্রদান করিতেছে। কথায় এবং কাজে চাই সহজ, সরল এবং সত্য আচরণ; নতুবা ধর্ম্মালোচনা ক'রে কোন লাভ নাই।

আরও দেখ, কপটতা 'ধর্ম্ম' নহে, জুয়াচুরী; 'সরলতা'ই ধর্ম্ম। কায়মনোবাক্যে সরল হইতে চেষ্টা কর, ধর্ম্ম অবশ্য তোমাতে আসিবেন। কিন্তু বিন্দুমাত্র কপটতা থাকিতে কখনও তিনি প্রকাশ পাইবেন না। সরলতা—বালকের মত সরলতা—চাই; মনে, মুখে এবং কাজে একবার সম্পূর্ণ সরল হইয়া দেখ দেখি, কেমন সুন্দর, কেমন মধুময় বলিয়া বোধ হইবে। যদি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় অন্তরের সমস্ত কপটতা দূর ক'রে দিয়ে তোমার ব্যবহারে সম্পূর্ণ সরল হইতে পার, তবে কি যে এক অনির্ব্বচনীয় আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিবে, তা' তখনই বুঝিতে পারিবে। এই সরলতার আনন্দ যিনি যখন পান, তখন তিনি যেন একটি সোনার মানুষ হ'য়ে যান; তাঁর চলন বলন সবই ব'দলে যায়; তাঁর মনটি সাদা এবং মুখখানি সদাই হাসিমাখা। সেই সরলতার মূর্ত্তিখানি দেখিলেই মনে হয়—আহা! মানুষ এমনটি হয় গা? এই কপটতার দেশে ও যুগে সরলতা মানুষকে সত্যই এমনি মধুময় করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারে।

দেখ, তোমাদের প্রভু শ্রীভগবান্ সরলতাই ভালবাসেন; তোমরা যখন তাঁহাকে পাইতে অর্থাৎ অনুভব করিতে চাও, তখন সর্ব্বাগ্রে সরল হইতে চেষ্টা কর। একমাত্র সরল হৃদয়ই শ্রীভগবান্‌কে উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত স্থল অর্থাৎ তাঁর বসিবার আসন-স্বরূপ। ধ্রুব, প্রহ্লাদ, ও ব্রজের

রাখালবালক—এরা সব সরলতার মূর্ত্তি। ভেবে দেখ দেখি এদের সরলতা! ধ্রুব বনের হিংস্র ব্যাঘ্রাদি দেখে সরল ভাবে ছুটে গিয়ে ব'লেছিল—"তুমি কি আমার পদ্মপলাশলোচন হরি?" আর অমনি তারা হিংসা ভুলে গিয়েছিল। প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর শত অত্যাচারেও সরল প্রাণে পিতাকে সেই শ্রীহরির কথাই ব'লেছিল। সরল বিশ্বাসে হাসিমুখে বিষমিশ্রিত দুধের বাটি মুখে ধ'রে পান ক'রেছিল, আর শ্রীহরির ইচ্ছায় বিষ জল হ'য়ে গিয়েছিল। ব্রজের রাখালবালকেরা কি সরল অন্তঃকরণেই তাদের ভাই-কানাইকে উচ্ছিষ্ট ফল খাইতে দিত! আর তিনি তাদের বিশুদ্ধ সখ্যভাবে প্রীত হইয়া সেই উচ্ছিষ্ট ফলের স্বাদাধিক্য গ্রহণ করিতেন। অতএব তোমরা সরল হও, তিনি চান সরলতা। সরলতার কত শক্তি দেখিলে তো? হও সরল, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। তবে কি জান? কালপ্রভাবে বর্ত্তমানে সারাদেশটা কপটতায় ভরিয়া গিয়াছে; বিন্দুমাত্র সরলতা এখানে বড় দুর্ল্লভ জিনিষ।

প্রশ্ন। আপনি যেরূপ সরলতার কথা বলিলেন, তাহা অনেক উপরের জিনিষ। তবে এ বিষয়ে আমাদের একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, মানুষের মনে সময়ে সময়ে এমন অনেক দুর্ব্বার কামনা বাসনা উদয় হয়, যেগুলি নীতির দিক্ দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে, সাধারণের চক্ষে বাস্তবিকই অতীব নিন্দনীয় বলিয়াই গণ্য হয়। আমাদের মনে হয়, সেই জন্য মানুষ সকলক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সরল হইতে পারে না। সেরূপ স্থলে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

উত্তর। তোমরা যথার্থই ব'লেছ; মানবমাত্রেরই মনে সময়ে সময়ে এমন অনেক কুপ্রবৃত্তির ঢেউ ওঠে, যেগুলি কোনক্রমেও সরলভাবে ব্যক্ত করা যায় না। সেগুলিকে তোমরা প্রাক্তন অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মকৃত কুকর্ম্মের সংস্কার ব'লেই বুঝিবে। যতদিন ব্যবহারিক হিসাবে সাধারণের মুখাপেক্ষা

না করিলে চলিবে না, ততদিন যে যে স্থলে সরলতার অভিব্যক্তিতে অনর্থের উৎপত্তির সম্ভাবনা, সেই সেই স্থলে সেগুলি প্রকাশ না করাই যুক্তিযুক্ত। তবে ইহা নিশ্চয় জানিও যে, সরলতার অভিব্যক্তি ভিন্ন মানব হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুক্কায়িত ঐ সমস্ত সুগুপ্ত মনোমল কদাচ বিধৌত হইতে পারে না। কাজেই আত্মার পবিত্রতা সাধনের জন্য তোমরা অবশ্য তোমাদের অন্তরঙ্গ মর্ম্মী সঙ্গী অথবা জীবনে মরণে একমাত্র হিতকারী বন্ধু এবং অতি প্রত্যক্ষ দেবতা শ্রীগুরুদেবের নিকট অকপটে মনের সমস্ত কথা সরল ভাবে প্রকাশ করিতে পার; তাহাতে তোমাদের চরিত্র সংশোধিত হইবে এবং অবনত সংস্কারগুলি ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া যাইবে। এইরূপে ক্রমশঃ তোমাদের লোকাপেক্ষা কমিয়া যাইবে এবং তোমরা নিজ নিজ চরিত্রে শিশুসুলভ সরলতা সহজেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইবে। আর এক কথা এই যে, জাগতিক লাভ, পূজা ও প্রতিষ্ঠা যখন সাধকজীবন-লাভেচ্ছু ব্যক্তির প্রার্থয়িতব্য নয়, তখন নিন্দা, লোকাপেক্ষা, এ সব ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ সরল হইতে চেষ্টা করা উচিত নয় কি? সরলতার অভিব্যক্তিতে সময়ে সময়ে হয়তো আমরা জগতের নিকট ঘৃণ্য ও উপেক্ষিত হইতে পারি বটে, কিন্তু জীবমাত্রই যাঁর করুণার পাত্র, যিনি জীব-হৃদয়ের অন্তঃস্থলদর্শী অর্থাৎ তাদের দৌর্ব্বল্য ও অপটুতা যিনি বুঝেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ আমাদের দুর্ব্বলতার জন্য কদাচ আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না; বরং সেই মঙ্গলময়ের করুণার হস্ত স্বতঃ-প্রসারিত হ'য়ে আমাদিগকে কোলে লইতে ছুটে আসিবে তখন, যখন জগৎ আমাদিগকে ঘৃণা ও উপেক্ষা ক'রে স্থান দিতে চাহিবে না।

মোট কথা, ভক্তিরাজ্যের যে সমস্ত মধুময় ভাব আধ্যাত্মিকতার প্রাণ, সম্পর্ণ সরলতা ভিন্ন সেই সমস্ত মনোরম ভাব অভিব্যক্ত হইতে পারে

না। যতক্ষণ কপটতা, ততক্ষণ ভাবলাভ সুদূর পরাহত। ভাবের পাগল সে—সরল যে। চলিত কথায় লোকে ব'লে থাকে,—"যার মনে নাই উত্তর পূব, তার মনে সদাই সুখ।" সে এক ভারি মজার—ভারি আনন্দের অবস্থা। অতএব দেখ, একবিন্দু সরলতা কত আনন্দের—কত সুখের। উহা মানব হৃদয়কে কত স্নিগ্ধ ও মধুর ক'রে থাকে। আমি তোমাদিগকে জোর করিয়া বলিতে পারি যে, একমাত্র সরল প্রাণের ব্যাকুলতা দ্বারা তোমরা অবশ্যই শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইবে, নতুবা বিন্দুমাত্র কপটতা থাকিতে কি করিয়া তিনি তোমাদের মানস-নয়নের গোচরীভূত হইবেন?

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, অন্য কোন সাধন-ভজন থাকুক আর নাই থাকুক, শিশুসুলভ সরলতাই ভগবৎপ্রাপ্তির একটি শ্রেষ্ঠ সম্বল। ইহার দৃষ্টান্ত আমরা ধ্রুব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি ভক্তচরিত্র আলোচনা করিলেই পাইয়া থাকি। যে ভাগ্যবান্ নিজ চরিত্রে শিশুসুলভ সরলতা আয়ত্ত করিতে পারিয়াছেন, যাঁহার মনটি শুভ্রবস্ত্রের ন্যায় একেবারে নিষ্কলঙ্ক হইয়াছে, কুত্রাপি কপটতার লেশমাত্র নাই, তাঁর ভগবৎপ্রাপ্তি অন্য কোন সাধন-ভজনের অপেক্ষা রাখে না। আরও দেখ, সরল শিশুরা শুদ্ধ—অপাপবিদ্ধ। যারা সাধন-পথের পথিক, তাঁহাদিগকে অবশ্যই বালকের মত সরল হইতে হইবে। দেখ, একটা রহস্য এই যে, আমাদের সকলেরই ভিতর বালকের মত একটা স্বাভাবিক সরলতার ভাব ও মূর্ত্তি রহিয়াছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা তাহার উপরে বাহিরের কতকগুলি অস্বাভাবিক আবিলতা ও কপটতার আবরণ দিয়া ফেলিয়াছি, তাই সেগুলি অভিব্যক্ত হইতে পারিতেছে না। আমাদিগকে ঐ সমস্ত কপটতার আবরণ ঘুচাইয়া ভিতরের সেই সরল রূপটিকে পুনরায় ফুটাইতে হইবে—সেই সরল ভাবটিকে জাগাইতে হইবে। শিশুর অনাবিল সরলতা যে অযাচিতভাবে মানবমাত্রেরই হৃদয়ে একটি অতি মধুময় স্নেহের ভাব উদয় করিয়া দেয়, এ

কথা কে না জানে? কোলে উঠিবার অধিকার একমাত্র শিশুরই আছে; কেননা সে সম্পূর্ণ সরল। বয়োবৃদ্ধের মত তার স্বভাবসিদ্ধ সারল্য আজিও কপটতার আবরণে আবৃত ও কলুষিত হয় নাই। যদি কেহ তোমায় জিজ্ঞাসা করে—'সরল শিশুকে তোমার কোলে নিতে ইচ্ছা হয়?' তুমি অবশ্যই বলিবে 'হয়'। তবেই বুঝিয়া দেখ, শ্রীভগবান্ তোমার হৃদয়ে থেকেই তোমাকে জানাইয়া দিতেছেন যে,—'শিশুর মত সম্পূর্ণ সরল হও, আমিও তোমায় কোলে তুলে নেবো'। সরল প্রাণে সরল বিশ্বাসে তাঁকে ডাকিলে তিনি যে জীবকে কোলে তুলে নিয়ে থাকেন এ অতি সত্য কথা।

এ বিষয়ে আরও একটি কথা তোমরা লক্ষ্য করিতে পার। শাস্ত্র বলিতেছেন,—'শ্রীভগবান্ সত্যস্বরূপ'। একটু চিন্তা করিলেই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, ঐ সত্যের সহিত সরলতার ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ রহিয়াছে; অর্থাৎ যাহা সত্য, তাহাই সরল। কাজেই সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে পাইবার পথ অবশ্যই সরল ও সুগম হইবে। যদি আমরা আমাদের ব্যবহারে এই স্বভাবসিদ্ধ সরলতাকে বিসর্জ্জন দিয়া কপটতা ও মিথ্যার প্রশ্রয় দিতে থাকি, তবে যে আমরা সাধনপথ অর্থাৎ আত্মোন্নতির পথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ক্রমশঃ অবনতির পথে চলিয়া যাইব, এ কথা বলাই বাহুল্য। অতএব এই কয়েকটি কথা তোমরা বিশেষ মনোযোগের সহিত ধারণা করিও যে, শ্রীভগবান্‌কে ডাকা এবং খোঁজা যখন জীবের স্বাভাবিক বৃত্তি, * তখন তাহা অবশ্যই সহজ এবং সরলই হইবে; তাহার ভিতর কোনরূপ জটিলতা, কুটিলতা বা কপটতা থাকিতেই পারে না। বালকোচিত সরলতা যাঁর ডাকে আছে, তিনিই শ্রীভগবান্‌কে পাইতে এবং অনুভব করিতে সক্ষম, নতুবা কপটতা মিশান ডাক তাঁর কাছে পৌছায় না। বিন্দুমাত্র কপটতা থাকিতে প্রকৃত সাধক জীবনের

* শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত ১ম খণ্ডে 'প্রকৃত নাস্তিক কেহই নাই' প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

আরম্ভই হয় না। চাই শিশুর মত সম্পূর্ণ সরলতা। অতএব তোমরা সর্ব্বদা কথায় এবং কাজে সরল হইতে চেষ্টা করিও এবং এই সরলতাকে ভগবৎপ্রাপ্তির পক্ষে অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুশীলন বলিয়া মনে রাখিও। সরলতা সম্বন্ধে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা একরূপ বলা হইল। এইবার 'পবিত্রতা' সম্বন্ধে তোমাদিগকে দুই চারিটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। মনোযোগ দিয়া শুন।

পবিত্রতা।

সাধনপথে 'পবিত্রতা'র যে বিশেষ প্রয়োজন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই পবিত্রতা দ্বিবিধ :—বাহ্যিক ও আন্তরিক। আমাদের আহার বিহার বেশভূষা প্রভৃতি বাহ্য বিষয়ে যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজন, সেইরূপ আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে, মানসিক পবিত্রতার বিশেষ প্রয়োজন। যেমন ধূলা মাটি আবর্জ্জনা প্রভৃতির দ্বারা আমাদের শরীর মলিন ও অপবিত্র হয়, ঠিক সেইরূপ অসৎ চিন্তা, কুৎসিত প্রসঙ্গ, এমন কি একটা কুৎসিত কল্পনার দ্বারাও আমাদের মন অপবিত্র হয়। শরীরকে সুস্থ এবং সবল রাখিতে হইলে, যেমন বাহ্য শৌচের প্রয়োজন হয়, সেইরূপ মনকে উন্নতচিন্তাশীল করিতে হইলে আন্তর শৌচের বিশেষ প্রয়োজন। এই উভয়বিধ শৌচ বা পবিত্রতা অবলম্বন ভিন্ন সাধনপথে মোটেই অগ্রসর হওয়া যায় না। অতএব তোমরা বাহ্য শৌচের সঙ্গে সঙ্গে আন্তর শৌচের দিকে সর্ব্বদা বিশেষ দৃষ্টি রাখিও। মনের অন্তঃস্থলেও যদি বিন্দুমাত্র কোন প্রকার নিষিদ্ধ অথবা কুৎসিত কল্পনা লুক্কায়িত থাকে, তবে এখনি তাহা সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে যত্নবান্ হও, একেবারে খাঁটি খাঁটি পবিত্র হও। যতক্ষণ স্বর্ণে খাদ মিশ্রিত থাকে, ততক্ষণ তাহার উজ্জ্বলতা বাড়ে না ; সেইরূপ

মনের মধ্যে যদি কোনরূপ অপবিত্রতা বিদ্যমান থাকে, তবে ধর্ম্মজীবনের সাত্ত্বিক তেজ নষ্ট হইয়া যায়।

আরও এক কথা এই যে, আমাদের হৃদয় অন্তর্যামী শ্রীভগবানের বসিবার আসন-স্বরূপ। কাজেই তাঁর আসন সর্ব্বদা পবিত্র রাখিও; নতুবা তিনি কেমন করিয়া তোমার হৃদয়াসনে আসিয়া বসিবেন। মনে কর, তোমার বাড়ীতে তোমার একজন পরম আত্মীয়, বন্ধু অথবা কোন পূজনীয় ব্যক্তি আগমন করিয়াছেন; তখন তুমি কি করিবে? তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া সর্ব্বাগ্রে একখানি বসিবার আসন দিবে তো? আচ্ছা, বল দেখি, তুমি কি কোন আবর্জ্জনা-পূর্ণ অপরিষ্কৃত স্থানে তাঁহাকে বসিবার আসন দিতে পার? অবশ্যই পার না। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি, চাই পবিত্রতা,—কায়মনোবাক্যে সম্পূর্ণ পবিত্রতা। যিনি যতই সাধন-ভজন করুন না কেন, বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা থাকিতে কোন দিনই তাঁর অর্থাৎ শ্রীভগবানের সাড়া পাওয়া যাইবে না। চরিত্রের পবিত্রতা অতি সযত্নে রক্ষণীয়। মনটিকে ঠিক যেন স্বচ্ছ সলিলের মত করিয়া রাখিতে হইবে; তবেইতো সেই স্বচ্ছ ও পবিত্র মনে ভগবদ্দর্শন হইবে; তবেইতো সেই পবিত্র হৃদয়ে ভগবদাবেশ হইবে; নতুবা মলিন জলের ভিতর যেমন দৃষ্টি চলে না, সেইরূপ মলিন পঙ্কিল মনে ভগবদনুভব হয় না। অপবিত্র হৃদয় লইয়া শ্রীভগবান্‌কে ভজিতে যাওয়া একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। বর্ত্তমানে আমাদের হৃদয় নানাপ্রকার অপবিত্রতায় অর্থাৎ কাম, ক্রোধ, হিংসা দ্বেষাদি দ্বারা কলুষিত এবং বহুবিধ কামনা-বাসনা-রূপ আবর্জ্জনায় পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। তাই বলি, তাঁকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে বসানো এখন থাক্; তার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন নাই। আগে হৃদয়ের এই সমস্ত আবর্জ্জনা পরিষ্কার ক'রে ফেল; পবিত্রতার স্নিগ্ধধারায় হৃদয়টি সম্যক্ বিধৌত কর, তারপর সেই পবিত্র হৃদয়ে তোমার হৃদয়-দেবতার আসন পাতিয়া

একবার সরল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে তাঁহাকে ডাকিও; দেখিবে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আহা, তিনি বড় দয়াল, একটু ব্যাকুল হ'য়ে কাতর প্রাণে তাঁকে ডাকিলেই তিনি আসেন। তোমরা সাধনপথের পথিক, দিনরাত তাঁহার নাম করিতেছ, তাঁহাকে ডাকিতেছ, আর তিনি কি নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া আছেন? তাহা হইতে পারে না। তিনি নিশ্চয়ই আসেন, কিন্তু বসিতে স্থান না পাইয়া চলিয়া যান, বসেন না। তাই বলি, সর্ব্বদা হৃদয়-আসন পবিত্র রাখিবার চেষ্টা করিও। আর এটি ঠিক ঠিক জানিয়া রাখিও যে, মনটি কলুষ-কলঙ্কিত রাখিয়া সাধন-ভজন করিতে যাওয়া—শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতে যাওয়া—একপ্রকার ভাবের ঘরে চুরি করা মাত্র; এইটি তোমাদিগকে একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। যদি তোমরা ঠিক ঠিক সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইতে চাও এবং শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে চাও, তবে মনে রাখিও,—এই পবিত্রতার ভিতর দিয়া পূতস্নান করিয়া তোমাদিগকে যাইতে হইবে, নচেৎ কলুষিত দেহ মন লইয়া শ্রীভগবানের আরাধনা করা চলে না। হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে এঁকে রেখো,—'**পবিত্রতা**'।

আরও দেখ, নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক জীবন পৃথিবীর ভূষণ-স্বরূপ। কায়মনোবাক্যে যিনি পবিত্রভাবে জীবনযাপন করিতে পারেন, তিনি কত বড় ভাগ্যবান্! তাঁর প্রাণে স্বতঃই একপ্রকার সাত্ত্বিক তেজ লক্ষিত হয় এবং সর্ব্বক্ষণ একপ্রকার বিমল স্বর্গীয় আনন্দে তাঁর প্রাণ ভরপূর হইয়া থাকে।

প্রশ্ন। সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে যে, মনকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিতে হইবে একথা বুঝিলাম। কিন্তু এই পৃথিবীতে চারিদিকে এত পাপ-প্রলোভন র'য়েছে যে, সাধারণ মানুষ আমরা,—আমাদের মনে সর্ব্বদাই নানাপ্রকার দুর্দ্দমনীয় কুপ্রবৃত্তির ঢেউ উঠে, সেইগুলির হাত হইতে বাঁচাইয়া মনকে পবিত্র রাখিবার উপায় কি?

উত্তর। দেখ, অনেকে নানাপ্রকার ক্রিয়া-প্রক্রিয়া দ্বারা মনকে সংযত ও পবিত্র রাখিতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তদ্রূপ চেষ্টা দ্বারা সকল সময় কৃতকার্য্য হওয়া যায় না। আমার মনে হয়, মনকে পবিত্র রাখিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায় এই যে, সর্ব্বদা একটা না একটা উন্নত ও পবিত্র আদর্শের চিন্তা করা, অর্থাৎ যে সমস্ত সাধু ভক্ত বা মহাপুরুষ নিজেদের উন্নত ও মহৎ চরিত্রের দ্বারা জগতের ভূষণ-স্বরূপ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সর্ব্বদা তাঁহাদের সেই মধুময় চরিত্রের সমুন্নত আদর্শগুলি চিন্তা করা এবং ধারণা করা। তোমরা সর্ব্বদা সেই সকল আদর্শচরিত্র মহাপুরুষগণের জীবনী সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা এবং চিন্তা করিবে, তাহা হইলে কোনপ্রকার নিকৃষ্ট অথবা কলুষিত চিন্তা তোমাদের মনে উদিত হইবার অবসর পাইবে না। দেখ, আমাদের মনের ধারণার দুইটি স্থান আছে। একটি শরীরের নিম্নাংশে এবং আর একটি শরীরের উর্দ্ধাংশে; নিম্নাংশে মনের ধারণা করিলে মন ক্রমেই নিম্নগামী ও কলুষিত হয়। তাহার প্রমাণ তোমরা দেখিতে পাও,—পেটুক ও কামুক ব্যক্তিরা সর্ব্বদা শরীরের নিম্নাংশে অর্থাৎ উদরে ও উপস্থে মন ধারণা ক'রে থাকে; ফলে তাহাদের মন সকল সময়েই কেবল লোভের এবং কামের চেষ্টায় চিন্তিত থাকা বশতঃ সর্ব্বক্ষণই চঞ্চল ও অপবিত্র থাকে। তাহাদের মন কোন কালে পবিত্র ও সংযত হইতে দেখা যায় না। অন্যপক্ষে যাঁহাদের মন সর্ব্বদা শরীরের উর্দ্ধাংশে অর্থাৎ মস্তিষ্কে ক্রিয়া করে, যাঁহারা সর্ব্বদা উন্নত চিন্তাশীল অর্থাৎ যাঁহারা উন্নত জ্ঞানরাজ্যের মধুময় তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে সতত সুগভীর গবেষণা-পরায়ণ তাঁহারা অতি সহজেই মনকে সুসংযত ও পবিত্র রাখিতে পারেন; যেহেতু উন্নত বিষয়ে মন নিবিষ্ট থাকা বশতঃ কোন প্রকার নিকৃষ্ট চিন্তা তাঁহাদের মনে উদয় হয় না। অতএব মনের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য, তোমরা পেটুক কিম্বা কামুক ব্যক্তির মত শরীরের নিম্নাংশে মনের ধারণা না করিয়া, আদর্শ ভক্ত ও মহাপুরুষগণের উন্নত চরিত্র পর্য্যালোচনা

দ্বারা মনকে সর্ব্বদা মস্তিষ্কে ক্রিয়াশীল রাখিতে চেষ্টা করিবে ; তাহা হইলে তোমাদের মানসিক পবিত্রতা অপেক্ষাকৃত সহজেই রক্ষিত হইবে আশা করা যায়। এ বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র কি বলিয়াছেন জান ?

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদর-পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥" শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

'পবিত্রতা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। অতঃপর এস আমরা ভক্তজনোচিত 'উদারতা' সম্বন্ধে আলোচনা করি।

উদারতা।

'উদারতা' বা প্রসারতাই আধ্যাত্মিকতার প্রাণ এবং সঙ্কীর্ণতাই উহার নাশ বা মৃত্যু। যাঁহার হৃদয় যতটা পরিমাণে প্রশস্ত এবং উদার তিনি ততটা পরিমাণে আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইয়াছেন বলা যায়। অতএব আধ্যাত্মিক পথে অর্থাৎ ধর্ম্মপথে কে কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন এই হৃদয়ের উদারতাই তাহার একটি কষ্টিপাথর অর্থাৎ পরীক্ষা-স্থল। দেখ, শ্রীভগবান্ কত মহান্ এবং অনন্ত উদার! তাঁহাকে লাভ করিতে হইলে অবশ্য আমাদিগকেও উদার অর্থাৎ উন্নতমনা হইতে হইবে। হৃদয় হইতে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া দিয়া এক উদার সাম্য মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেমের পথে চলিতে হইবে। সৌভাগ্য-ক্রমে যে হৃদয় একবার শ্রীভগবানের পথে ছুটিয়াছে, তাহা যে কত উদার হইয়া গিয়াছে তা' বলিয়া বুঝাইবার নয় ; উহা অনন্ত আকাশের মত উদার হইয়া গিয়াছে ; কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা সেখানে স্থান পাইতে পারে না। উদারহৃদয় মহাত্মাগণ জগদ্বাসী সমস্ত মানবকেই এক মধুময় প্রীতি-ভালবাসার বন্ধনে বাঁধিতে সক্ষম। 'পর' বলিয়া তাঁহাদের আর কেহই থাকে না : সকলেই তাঁহাদের নিকট 'নিজ জন'—পরম প্রীতির পাত্র।

সাধকজীবনের লক্ষ্য,—বিশ্বপ্রেম-লাভ। সেই বিশ্বপ্রেমের সহিত মানব-হৃদয়ের এই উদারতার অতি নিকট সম্বন্ধ। যে উদার হৃদয় লাভ করিয়া সেই বিশ্বপ্রেম বুঝিতে হইবে, বিন্দুমাত্র সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ে পোষণ করিলে কোন দিনই তাহা বুঝিতে পারা যাইবে না। বলিতে কি, এই সঙ্কীর্ণতাই বিশ্বপ্রেম-লাভের পথে প্রথম ও প্রধান অন্তরায়। তাই বলি, যদি তোমরা সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের পথে অগ্রসর হইতে চাও—বিশ্বপ্রেম বুঝিতে চাও—তবে সর্ব্বাগ্রে নিজ নিজ হৃদয় হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের অর্থাৎ কুল, শীল, ধন, মান, আভিজাত্য, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির অহঙ্কার ও অভিমান-রূপ সমস্ত সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কাটিয়া বিশ্ববাসী সমস্ত নরনারীকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর। তাহাদের হৃদয়ে হৃদয় মিশাইয়া তাহাদের সুখে দুঃখে সহানুভূতি করিতে শিখ। বিশ্ববাসী সকলেই সেই পরমপিতার সন্তান; অতএব তাঁহার সম্পর্কে সম্পর্কিত জানিয়া সকলকেই 'আপনার জন' মনে করিয়া ভালবেসে প্রেমের পথে টেনে নিয়ে এস। তা'তে তা'রা ধন্য হবে, তোমরা ধন্য হবে, জগৎ ধন্য হবে, আর তোমাদেরও প্রভুর কাজ করা হবে।

আরও দেখ, সঙ্কীর্ণচেতা ব্যক্তির দ্বারা জগৎ কোন সমুন্নত আদর্শ পায় না। এই সঙ্কীর্ণতা হইতেই জগতে যত প্রকার ঘৃণা ও বিদ্বেষবুদ্ধির সৃষ্টি হইয়া থাকে। কাজেই উহা দ্বারা জগতের কোন কল্যাণ হওয়া দূরে থাকুক বরং উহার অনাদর্শে জগতের সমূহ ক্ষতিই হইয়া থাকে। তাই বলি, সঙ্কীর্ণ চিত্ত ব্যক্তির জীবন বাস্তবিকই বড় দরিদ্র ও কৃপার্হ। অতএব যে কোন কার্য্যে যে কোন অবস্থায় যদি তোমাকে তোমার স্বভাবসিদ্ধ সরলতা সত্য ও উদারতাকে বিসর্জ্জন দিয়া কপটতা মিথ্যা ও সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিতে হয়, তবে জানিও সেইখানেই তুমি সাধনপথ-ভ্রষ্ট হইয়া অনেকটা অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছ। বরং মৃত্যু শ্রেয়ঃ, তথাপি তোমরা কোনরূপ সঙ্কীর্ণতাকে প্রশ্রয় দিয়া জগতের ক্ষতিকারক হইয়া জীবনধারণ করিও না। আমার এই

কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিও যে, যেখানেই সঙ্কীর্ণতা সেখানেই আধ্যাত্মিকতার নাশ, আর যেখানেই উদারতা সেখানেই আধ্যাত্মিকতার জীবন। নদী যতই সমুদ্রের অভিমুখে প্রবাহিত হয়, ততই তার প্রসারতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়; তেমনি জীবহৃদয়রূপা নদী যতই সেই অনন্ত সাগররূপী শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হয়, ততই প্রসারিত হইয়া সেই অনন্তের উদারভাবে ভাবিত হইয়া যায়। এই দেখ না, এখানকার গঙ্গা যত চওড়া, উলুবেড়ের গঙ্গা তাহা অপেক্ষা বেশী চওড়া, গেঁওখালির গঙ্গা আরও বেশী চওড়া; আবার সাগরসঙ্গমে—যেখানে গিয়া গঙ্গা সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—সেখানে আর কূল কিনারা পাওয়া যায় না, সেখানে গঙ্গা এত বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে যে সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে; সেখানে গঙ্গা আর সমুদ্র পৃথক্ করিয়া বুঝিবার উপায় নাই।

প্রশ্ন। আপনার কথায় বুঝিলাম, যাঁহার হৃদয় যত উদার, তিনি ততটা পরিমাণে সাধনপথে অগ্রসর হইবার যোগ্য। এখন আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, চরিত্রের এই উদারতা বজায় রাখিতে গিয়া আমাদিগকে কি সাধু অসাধু সজ্জন দুর্জ্জন সকলেরই সঙ্গে সমান ভাবে মিশিতে হইবে?

উত্তর। কে বলিল? এমন কথা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি না। চরিত্রে এই উদার ভাব দেখাইতে গিয়া তোমাদের যেন বুদ্ধিভেদ না জন্মে। প্রথম প্রথম তোমাদিগকে অনুকূল সঙ্গ গ্রহণ ও প্রতিকূল সঙ্গ বর্জ্জন করিতে হইবে। কিন্তু যতই সৎসঙ্গে সৎবিষয় চর্চ্চা ও অনুশীলন করিতে থাকিবে, ততই দেখিতে পাইবে যে, ক্রমে ক্রমে এই অনুকূল-প্রতিকূল-বোধ তোমাদের হৃদয় হইতে সরিয়া গিয়াছে; হৃদয় অপেক্ষাকৃত অনেক উন্নত হইয়া গিয়াছে; ক্রমে আরও উন্নত অবস্থায় পৌছিলে সবই তোমাদের অনুকূল ব'লেই বোধ হইবে; যেহেতু তখন তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, সবই 'তিনি'-ময়: সবের ভিতরেই তিনি অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিরাজমান আছেন।

প্রশ্ন। বুঝিলাম ; কিন্তু আমাদের মনে যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতার সংস্কার বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, সেগুলি কি উপায়ে দূর করা যাইতে পারে ?

উত্তর। দেখ, কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ বিভিন্ন ভাবেতে অর্থাৎ বড় ছোট, উচ্চ নীচ, বিদ্বান্ মূর্খ, ধনী দরিদ্র, আপন পর প্রভৃতি পরস্পর বিরোধী ও অনুদার ভাবেতে আমাদের সংস্কারাবদ্ধ মনের স্থিতি হইতেই এইরূপ সঙ্কীর্ণতার উৎপত্তি হইয়া থাকে। সাধুসঙ্গ করিতে করিতে মহতের উপদেশে ক্রমশঃ যখন আমাদের মন উন্নত হয় এবং শ্রীভগবানের অসীম ব্যাপক ভাবেতে স্থিত ও বিভাবিত হয়, তখন ঐ সমস্ত সঙ্কীর্ণতা, খুঁটিনাটি, আপনা হ'তেই চলিয়া যায় এবং চিত্ত উদারতায় ভরিয়া যায় ; তখন আর কোন প্রকার সঙ্কীর্ণতা হৃদয়ে স্থান পায় না। বলিতে কি, সে যে কি এক অপরূপ মনোরম অবস্থা, তা' যিনি উহা লাভ করিয়াছেন, তিনিই তার মধুময় ভাব আস্বাদন করিয়া থাকেন।

আরও দেখ, মানবচরিত্র যতদিন না এই উদারতা গুণে ভূষিত হয় ততদিন উহা উন্নত হইতে পারে না ; অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের—সঙ্কীর্ণতার—গণ্ডীগুলি মানবাত্মার উন্নতির পথ রুদ্ধ করিয়া রাখে। মানবমাত্রেরই উচিত, আগে ঐ গুলি ঘুচাইয়া উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া রাখা। তোমাদিগকে তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, সাধনপথে এই সঙ্কীর্ণতার মত মারাত্মক প্রতিবন্ধক আর নাই। আর, যেখানেই তোমরা এই উদারতার পরিচয় পাইবে, সেখানেই দেখিবে মন কি এক অভিনব উন্নতভাবে বিভাবিত হইয়া যাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দুই একটি প্রাকৃতিক বস্তুর উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, সমুদ্র এবং আকাশ কত মহান্ ; সমুদ্রের তীরে অথবা কোন নির্জ্জন নদীতটে বসিয়া কিছুক্ষণ তোমরা উপরে অনন্ত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিও, দেখিবে অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই তোমাদের মন হইতে সমস্ত পার্থিব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের খুঁটিনাটি—সমস্ত সঙ্কীর্ণতা—সরিয়া যাইবে ; মন কি এক অভিনব অপার্থিব

ও অনির্ব্বচনায় উদার অনন্তের ভাবে ভরিয়া যাইবে; তোমরা একেবারে আত্মহারা হইয়া সেই ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া যাইবে! তখন বুঝিতে পারিবে, জগতের জীবগুলি যে সমস্ত ধন মান কুল শীল প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী লইয়া সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি কত অকিঞ্চিৎকর! অতএব তোমরা মনে রাখিও যে, এই উদারতা মানবের ধর্ম্মজীবন গঠনের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান এবং উহা মানব চরিত্রের একটি অতি উৎকৃষ্ট ভূষণ।

প্রশ্ন। আপনার উপদেশগুলি বড়ই শ্রুতিমধুর, সারগর্ভ এবং হৃদয়গ্রাহী। আমাদের মনের মধ্যে অনেক বিষয়ে যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতার সংস্কার রহিয়াছে, আপনার এই সমস্ত সুমধুর কথাগুলি শুনিয়া ক্রমে ক্রমে সেইগুলি আমাদের মন হইতে চলিয়া যাইতেছে। তবে কেমন যে আমাদের একটা বদ্ধমূল ধারণা, ধর্ম্মবিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমেই আমাদের মনে হয়, এইবার বুঝি একটা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। বিশেষতঃ 'বৈষ্ণব-ধর্ম্ম'কে অতি সঙ্কীর্ণ 'গোঁড়ার ধর্ম্ম' বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। এ বিষয়ে যথাবথ বলিয়া আমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দিন।

উত্তর। দেখ, তোমরা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছ যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম, শাক্ত-ধর্ম্ম, খৃষ্টান-ধর্ম্ম বা মুসলমান-ধর্ম্ম বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম নাই; 'ধর্ম্ম' বলিতে এক সনাতন '**মূলধর্ম্ম বা মানবধর্ম্ম**'ই আছেন।* 'ধর্ম্ম' একই, কেবল ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং তাহাদের রীতি-নীতি, দেশ কাল ও পাত্র ভেদে পৃথক্ হয়। সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই ঐ মূলধর্ম্মের এক একটি শাখা মাত্র। সমস্ত ধর্ম্ম-সম্প্রদায়েরই লক্ষ্য বস্তু যখন এক শ্রীভগবান্, তখন সকলেরই শিক্ষা, রীতিনীতি,

* শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত ১ম খণ্ডে "মূলধর্ম্ম বা মানবধর্ম্ম" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য

অবশ্য উন্নত ও উদার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। যাঁহারা ধর্ম্মকে—বিশেষতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে সঙ্কীর্ণ 'গোঁড়ার ধর্ম্ম' বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন নাই বলিয়াই মনে হয়; যেহেতু এরূপ উক্তি তাঁহাদের নিতান্ত অজ্ঞানতা-প্রসূত। ফলতঃ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের শিক্ষা যে কত উদারতা-মূলক তাহার দুই একটি উদাহরণ দিতেছি, শুনিলে তোমাদের এই ভ্রান্ত ধারণা দূর হইবে। শ্রীভগবানের ভজন সম্বন্ধে বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রগ্রন্থ বলিতেছেন,—"শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে নাহি জাতি কুলাদি বিচার"; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥" তোমরা একটু ধীর চিত্তে ভাবিয়া দেখ দেখি, এই সমস্ত কথা কত বড় উদারতার কথা! ইহার ভিতর কোথাও কি বিন্দুমাত্র সঙ্কীর্ণতার নামগন্ধ আছে? বৈষ্ণব-ধর্ম্ম ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি কোন বিশিষ্ট শ্রেণীর বা বর্ণের অবলম্বনীয় নয়; পরন্তু এই ধর্ম্ম আচরণ করিবার পক্ষে সকলেরই সমান অধিকার আছে। ইহাতে কোন বিশিষ্ট জাতি কুলাদির বিচার করিতে হয় না। বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ দেন নাই, সকলেই ইহা গ্রহণ ও আচরণ করিতে পারেন। যিনি যেমন ভাবেই শ্রীভগবানকে ভজনা অর্থাৎ আরাধনা করুন না কেন, শ্রীভগবান্ কাহাকেও ত্যাগ করিবেন না, সকলকেই গ্রহণ করিবেন, অর্থাৎ তাঁর শ্রীচরণ পূজা ও সেবার অধিকার দিবেন। এখন তোমরা বল দেখি, যে পরম উদার বৈষ্ণব-ধর্ম্ম কাহাকেও বাদ না দিয়া সকলকেই আশ্রয় দিতে প্রস্তুত, উহাকে অদূরদর্শিতাবশতঃ সঙ্কীর্ণ 'গোঁড়ার ধর্ম্ম' বলিয়া উল্লেখ করা কি অজ্ঞানতার পরিচায়ক নয়? তোমরা যতই এই বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা ও অনুসন্ধান করিবে ততই দেখিতে পাইবে যে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম অতীব উদারতার ধর্ম্ম; সঙ্কীর্ণ তো নয়ই, পরন্তু বড়ই মহান্ এবং উহার অন্তর্নিহিত প্রাণস্পর্শী আদর্শ ধর্ম্মভাবগুলি অতীব হৃদয়গ্রাহী। আমার

মনে হয়,—ধর্ম্মতত্ত্বের মধুময় ও মনোরম ভাবগুলি এই বৈষ্ণব-ধর্ম্মের ভিতর দিয়া যতটা বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, ততটা অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের শিক্ষার ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয় নাই। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিলে একথা বলা বোধ হয় কোনমতেই অযৌক্তিক বা অত্যুক্তি হয় না যে, ধর্ম্মতত্ত্বের সার সত্য সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইলে এবং উহার অন্তর্গত অতি স্নিগ্ধ মাধুর্য্যের উপলব্ধি করিতে হইলে, সমস্ত মানবকেই একদিন না একদিন এই বৈষ্ণবধর্ম্মের সমুন্নত আদর্শ ধর্ম্মভাবগুলি গ্রহণ করিতে হইবে। যিনি যে ধর্ম্মাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহাকে মনে রাখিতে হইবে যে, বাহিরের কতকগুলি ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-নিয়ম-আচার-পালনই প্রকৃত ধর্ম্ম নয়,—অন্তরের অতি স্নিগ্ধ মধুময় দিব্য অনুভূতিই প্রকৃত ধর্ম্ম-পদবাচ্য।

প্রশ্ন। বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রগ্রন্থের উল্লিখিত উক্তিগুলি যে যথেষ্ট উদারতার পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; কিন্তু বৈষ্ণব মহাজনদিগের কোন কোন কীর্ত্তনের পদ বা পদাংশে অতিশয় সঙ্কীর্ণতাসূচক উক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এরূপ উদার ধর্ম্মাচরণ-পদ্ধতির মধ্যে সেইগুলি কিরূপে স্থান পাইল তাহা আমরা বুঝিতে পারি না; এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য ও অভিমত কি?

উত্তর। দেখ, যে সমস্ত কীর্ত্তনের পদে ঐ প্রকার সঙ্কীর্ণতাসূচক পদাংশের উল্লেখ আছে দেখিতে পাওয়া যায়, আমার মনে হয়, সেগুলি হয় আধুনিক অথবা অংশ-বিশেষের পাঠান্তর কালক্রমে চলিয়া আসিয়া কোন-না-কোন সূত্রে বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর মধ্যে স্থান পাইয়াছে। সঙ্কীর্ত্তনের পদগুলি অবশ্যই সমুন্নত ধর্ম্মভাবের দ্যোতক। এখন, এই 'ধর্ম্ম' জিনিষটির ভিতর যখন কোনপ্রকার সঙ্কীর্ণতার স্থান থাকিতেই পারে না, তখন যে সকল কীর্ত্তনের পদে একটু আধটু আপত্তিজনক সঙ্কীর্ণতা রহিয়াছে বলিয়া মনে হইবে, সেগুলি বাদ দিয়ে ফেলাই দরকার। প্রাচীন পদাবলীর মধ্যে এমন দু'একটি পদাংশ গীত হইতে শুনা যায়, যেগুলি আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট

সঙ্কীর্ণতার পরিচায়ক। কীর্ত্তন গাহিবার সময় সেগুলি না বলাই যুক্তিযুক্ত। যে সমস্ত বৈষ্ণবাচার্য্য মহাপুরুষ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের স্তম্ভ-স্বরূপ হইয়া এখনও জগতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন,—তাঁহাদের প্রাণে কি অদম্য শক্তি—কি সাত্ত্বিক তেজ—কি উদারতা রহিয়াছে! তাঁহাদের সেই মহৎপ্রাণতার ভিতর দিয়া শ্রীভগবান্ যেন জোর করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে,—ঐ সমস্ত কীর্ত্তনের পদের সঙ্কীর্ণতা-সূচক অংশগুলি সমস্ত বাদ দাও। তোমরা সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়া ভক্তি-ধর্ম্ম আচরণ করিতে চাও,—অতএব এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের একটি কথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও;—

"প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণ নাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার॥
অতএব যার মুখে এক কৃষ্ণ নাম।
সেই বৈষ্ণব করি তার পরম সম্মান॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থের এইরূপ আরও কএকটি উক্তি এই প্রসঙ্গে তোমাদের অবশ্য জ্ঞাতব্য, আলোচ্য এবং স্মরণীয়,—

"ব্রাহ্মণাদি কুক্কুর চণ্ডাল অন্ত করি।
দণ্ডবৎ করিবেক বহুমান্য করি॥
এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম—সবারে প্রণতি।
সেই ধর্ম্মধ্বজী যার ইথে নাহি রতি॥"

শ্রীচৈতন্য ভাগবত।

"জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

বল দেখি, উল্লিখিত শাস্ত্রোপদেশগুলি যদি বৈষ্ণব ভক্তের অবশ্য পালনীয়

কর্ত্তব্য হয়,—তবে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের আদর্শ উদারতাকে থর্ব্ব করিয়া কেমন করিয়া নিম্নলিখিত বিসদৃশ এবং রুচি ও ভাব-বিরুদ্ধ পদাংশগুলি, কীর্ত্তনের সময় বলা চলে? যথা :—

(ক) 'সে ভড়ুয়া গ্রাম্য শূকর'

(খ) 'তবে লাথি মার তার শিরে'

(গ) 'সেই পশু বড় দুরাচার'

(ঘ) 'অনল ভেজায়ে দিই তার মাঝ মুখ খানে'

(ঙ) 'সো নর হউত পাষণ্ড', ইত্যাদি।

যদিও প্রকারান্তরে ঐ সমস্ত পদাংশের অন্তরূপ অর্থ ক'রে নিয়ে বৈষ্ণব-ধর্ম্মের উদারতা বজায় রাখা যায়, তথাপি ঐ গুলি একেবারে বর্জ্জন করাই ভাল অর্থাৎ কীর্ত্তন গাহিবার সময় ওগুলি না গাওয়াই ভাল; যেহেতু ঐ গুলি অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বী জনসাধারণের নিকট মহান্ বৈষ্ণব-ধর্ম্মকে অতি সঙ্কীর্ণ ও অনুদার ব'লে প্রতিপন্ন করায়।

প্রশ্ন। সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে মানুষের মনের যাবতীয় সঙ্কীর্ণতা দূর ক'রে দিয়ে হৃদয়টিকে যে খুব উদারভাবাপন্ন করিতে হইবে, আপনার উপদেশে তাহা বুঝিলাম। অতঃপর ভক্তির অন্য কোন অনুশীলনী বৃত্তি সম্বন্ধে আমাদিগকে সদুপদেশ দিন।

উত্তর। এইবার তোমাদিগকে 'দীনতা' অর্থাৎ সাধক-জনোচিত দৈন্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি, মনোযোগ দিয়া শুন এবং বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা কর।

দীনতা।

দেখ, ভক্ত-চরিত্রে 'দীনতা' অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে বিনয় অবলম্বন অবশ্য কর্ত্তব্য। দীনতা ভক্তির একটি শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। ভক্ত-চিত্ত নানাবিধ

সদ্‌গুণের আধার বশতঃ স্বভাবতঃই অতি স্নিগ্ধ ও কোমল ; কাজেই কোনরূপ অহঙ্কার বা উদ্ধত প্রকৃতি সেথায় স্থান পায় না। মানুষের চিত্ত যখন অহঙ্কারশূন্য হয়, তখন তিনি এই দীনতারূপ ভূষণে ভূষিত হইয়া থাকেন। যেখানে অহঙ্কার, সেখানে এই বিনয় বা দৈন্যাত্মিকা বুদ্ধির স্থান নাই, থাকিতেও পারে না। দম্ভ, অভিমান, অহঙ্কার,—এগুলি ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার তমগুণের বৃত্তি। শ্রীভগবানের কৃপায় জীবের এই অহঙ্কার-রূপা মায়ার বৃত্তি স'রে গেলে পর, ভক্তির স্বাভাবিক বৃত্তি যে দীনতা, তাহা তখন আপনিই প্রকাশ পায়। মোটামুটি এই কথাটি তোমরা জেনে রেখো যে, অহঙ্কার-শূন্য চিত্তের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থার অন্য নামই দীনতা। ভক্তচিত্ত স্বভাবতঃই বিনীত হয় ; কেন জান ? কাহার কাছে তিনি অহঙ্কার করিবেন ? তিনি জানেন, চরাচর এই বিশ্ব সমস্তই সেই বিশ্বপতি শ্রীভগবানের শরীর। তিনি সর্ব্বভূতের ভিতর সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেন, কাজেই জগতের একটি তৃণের কাছেও তিনি বিনয়াবনত হইয়া পড়েন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—চরাচর সমস্ত বিশ্বই সেই বিশ্বেশ্বরের শরীর,—"হরেঃ শরীরম্" ; এই বোধই ভক্তের দীনতার জনক।

যদিও বৈষ্ণব-শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ভক্তি নিত্যসিদ্ধ বস্তু, এবং শ্রীভগবানের গুণলীলা প্রসঙ্গ শ্রবণ কীর্ত্তনাদির দ্বারা চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই উহাতে ভক্তির মধুময় ভাব স্বতঃই উদিত হয় ; তথাপি সাধক-জীবনে অন্যান্য সদ্‌গুণগুলি অপেক্ষা এই 'দীনতা'ই বিশেষ ভাবে ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের ক্ষেত্র বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপায় সাধক যখন নিজের অন্তরের সমস্ত অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ করিয়া ঠিক ঠিক দীনাতিদীন কাঙ্গাল হইয়া পড়েন, তখন তাঁর চিত্ত ভক্তির অতি সরস স্নিগ্ধতায় সিক্ত হইয়া যায় এবং সর্ব্বক্ষণ একটি দিব্য মধুময় ভগবদ্ভাবে গর গর থাকে। এই দৈন্য-বোধ সাধকের ভক্তি-বর্দ্ধনের পক্ষে এত বেশী সহায়তা করে যে, উহার

সহিত ভক্তির আধার আধেয় সম্বন্ধ আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ বিষয়ে ভক্তি-শাস্ত্র বলিতেছেন,—

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন পণ্ডিত ধনীর বড় অভিমান॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

পরম ভক্ত-শিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীভগবান্‌কে "অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে!" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন; আর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীর শ্রীমুখোচ্চারিত "অয়ি দীনদয়াদ্র নাথ!" শ্লোকটি শুনিয়া প্রেমাবেশে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এবং বার বার 'অয়ি দীন' 'অয়ি দীন' বলিতে বলিতে প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিয়াছিলেন।

আরও দেখ, ভক্তিশাস্ত্র বলিতেছেন,—ভক্তির মধুময় ভাব আস্বাদন করিতে হইলে সাধককে অবশ্যই 'তৃণাদপি সুনীচ' হইতে হইবে; কিন্তু অহঙ্কার না কমিলে তো আর 'তৃণাদপি সুনীচ' হওয়া যায় না; অতএব এই অহঙ্কারটিকে দূর করিতেই হইবে, নতুবা সাধন ভজন সকলই বৃথা।

প্রকৃত সাধক-জনোচিত দীনতা কাহার ভিতর কতটা পরিমাণে আসিয়াছে তাহার একটি পরীক্ষা আছে। দেখ, যখন আমরা কোন মহৎ ব্যক্তির নিকট যাই, তখন একটা ব্যবহারিক সৌজন্য রক্ষার্থে আমরা প্রায় সকলেই নিজ নিজ দৈন্য জ্ঞাপন ক'রে ব'লে থাকি যে,—'আমি বড় অধম', 'আমি বড় পতিত', 'আমার মত পাষণ্ড আর দ্বিতীয় নাই' ইত্যাদি। কিন্তু যদি কেহ আমারই নিজ-স্বীকৃত ঐ কথাগুলি অন্যত্র আমাকে লক্ষ্য ক'রে বলেন,—'এই লোকটি অতি পাষণ্ড' অথবা 'অতি অধম'; অমনি তৎক্ষণাৎ আমি হয়তো ক্রোধে অন্ধ হ'য়ে যাই—একেবারে তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠি; কি আশ্চর্য্য! আমি নিজমুখে সাধু মহতের কাছে নিজের অন্তরের যে সত্য পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হই নাই, অপরে আমাকে সেই কথা বলিবামাত্র আমার ক্রোধের পরিসীমা

থাকে না ; আমাদের সকলেরই মনের অবস্থা প্রায় এইরূপ। তবেই দেখ, সাধক-জনোচিত দীনতা আজিও আমরা ঠিক ঠিক লাভ করিতে পারি নাই। ছুদিন সাধন-ভজন না করিতেই আমরা লোকের কাছে যে দৈন্য দেখাইয়া থাকি, প্রকৃতপক্ষে তার বিন্দুমাত্র আমাদের ভিতর আজিও আসে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না ; লোকের নিকট দৈন্যের নামে একটা কপটতার অভিনয় ক'রে থাকি মাত্র। যে দিন অপরের মুখে ঐ প্রকার উক্তি অর্থাৎ 'পতিত', 'অধম' ও 'পাষণ্ড' প্রভৃতি কথাগুলি শুনিয়াও আমাদের চিত্ত অবিকৃত থাকিবে এবং মাথা নত ক'রে স্বীকার করিতে পারিব যে,—'হ্যাঁ ভাই! তুমি ঠিকই ব'লেছ ; সত্যই আমি অতি মন্দ—অতি হীন-মতি, অধম ও পাষণ্ড', সেই দিন আমরা ঠিক ঠিক 'দীন' হইতে পারিব।

দেখ, ধন, মান, পাণ্ডিত্য, জ্ঞান, বুদ্ধি প্রভৃতির অহঙ্কারই দীনতার অন্তরায়। এই অহঙ্কার কাহার কখন কমিতে আরম্ভ হইয়াছে তাহা বুঝিবার উপায় কি জান? যিনি যাহা, তাঁহাকে তাহা অপেক্ষা ছোট ক'রে বলিলে বা ডাকিলে যদি তাঁহার কোন অসন্তুষ্টির লক্ষণ দেখা না যায়, অর্থাৎ যদি তাঁহার সাম্য-ভাবের কোনরূপ ব্যতিক্রম না হয় তাহা হইলে জানিবে যে, তাঁহার অহঙ্কার কমিতে আরম্ভ হইয়াছে। আরও দেখ, জীবের পক্ষে কোন বিষয়েই অহঙ্কার করা সাজে না ; জীব কি জানে, কি বোঝে যে, তার অহঙ্কার করিবে? শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপা ব্যতীত পারমার্থিক ভক্তিপথে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করা যায় না। অতএব এই ভক্তি ও ভগবৎ-তত্ত্ব-বিষয়ে যিনি বলেন—'বুঝেছি', তিনি হয়তো কিছুই বোঝেন নি ; আর যিনি বলেন —'কিছুই বুঝি নাই', তিনি তাঁর কৃপায় কিছু কিছু বুঝেছেন বলিয়া মনে হয়। বহুদিন ধরিয়া জ্ঞানানুশীলন করিবার পর মানব যখন জ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হন তখন তিনি এইটি বুঝিতে পারেন যে,—'মানবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা সেই অসীম ও অনন্তের তত্ত্ব সম্যক্ জানিতে ও বুঝিতে যাওয়া এবং

চাওয়া নিতান্ত বাতুলতা মাত্র। তখন তিনি বলেন,—'ওঃ! শ্রীভগবানের এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের সুগম্ভীর রহস্য পরিপূর্ণ জটীল তত্ত্ব সমুদয়ের কিছুই জানিতে ও বুঝিতে পারিলাম না।' তখনই তিনি শ্রীভগবানের নিকট প্রপন্ন হইয়া ব'লে থাকেন,—

"আমি দেখি নাই কিছু বুঝি নাই কিছু
দাও গো দেখায়ে বুঝায়ে।"

তখন তাঁর সমস্ত অহঙ্কার—সমস্ত জ্ঞানের গর্ব্ব—চূর্ণ হ'য়ে যায়। তখনই তিনি স্বতঃই 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে পড়েন। ঐ অহঙ্কারের গ্রন্থিটা পর্য্যন্ত মায়ার রাজ্য; শ্রীভগবানের চরণে প্রপন্ন হইয়া এই মায়াদেবীর রাজ্য অতিক্রম করিয়া যাইবার পর অর্থাৎ এই জ্ঞানের অহঙ্কার চূর্ণ হইবার পর, শ্রীভগবানের 'ভাবের' অর্থাৎ অনুভবের রাজ্য। যে দীনতার সহিত ভক্তির আধার আধেয় সম্বন্ধ, তখনই সেই দীনতা প্রকাশ পায়।

যে অহঙ্কার নাশের কথা উপরে বলা হইল, সেগুলি জীবের অস্বরূপের অহঙ্কার; অর্থাৎ জীব স্বরূপতঃ যাহা নয় তাহারই অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই দীনতার সমূহ প্রতিবন্ধক। কিন্তু অন্য পক্ষে বিচার করিয়া দেখিলে ইহা সহজেই অনুমিত হয় যে, জীবের অহঙ্কারের একেবারে নাশ হয় না; অহঙ্কার অর্থাৎ জীবের আমিত্ব থাকিবেই থাকিবে; যেহেতু এই আমিত্বের নাশ হইলে জীবের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। দেখ, জীবের স্বরূপ-ভূত একটি খুব বড় অহঙ্কার আছে—খুব বড় রকমের একটি গৌরব আছে—যেটি জাগিলে ঐ সমস্ত অস্বরূপের অহঙ্কার আপনা হ'তেই চ'লে যায়। সেটি কি রকম জান? সেটি এই যে,—'আমি প্রভুর নিত্য দাস।' আমাদের সব গর্ব্ব—সব অহঙ্কার জাগে; ধনী, মানী, কুলীন, পণ্ডিত প্রভৃতি অহঙ্কারগুলি সর্ব্বদা জেগেই র'য়েছে, কিন্তু 'আমি তাঁর দাস' এই অভিমানটি—এই স্বভাবটি জাগে না; কি মায়ার ভ্রম! আমরা কতকগুলি অস্বরূপের অহঙ্কার জাগিয়ে কেবল

অপরের উপর নিজেদের প্রাধান্ত বিস্তার করিতেই ব্যস্ত। এদিকে স্বরূপতঃ আমরা যাহা—অর্থাৎ স্বভাবতঃ যেটি 'আমাদের গর্ব্ব করিবার আছে—সেই 'শ্রীভগবানের নিত্যদাস' অভিমানটি আমরা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। এই স্বরূপের অহঙ্কার জাগিলে মানুষ অভিমানে উন্নত-মস্তক হইতে পারে না, বরং ইহা সকলের চরণ-তলে মানুষের মাথা নত ক'রে দেয়—মানুষকে সত্যসত্যই 'মাটির মানুষে' পরিণত করে। সাধু মহতের কৃপায় এবং তাঁহাদের সংসর্গ-গুণে যে দিন মানবের এই 'নিত্য-ভগবদ্দাস'-রূপ স্বভাবটি জাগে, সেই দিন তিনি দীনাতিদীন হ'য়ে পড়েন,—সেই দিন তিনি ধন্য হন। বন্যা এলে দেশ ভেসে যায় সত্য, কিন্তু উঁচু জায়গায় জল থাকে না, নীচু জায়গাতেই জল জ'মে থাকে ; সেইরূপ ভক্তি প্রেম লাভ করিতে হইলে সমস্ত অভিমান অহঙ্কার বিসর্জ্জন দিয়া দীনাতিদীন কাঙ্গাল সাজিতে হইবে।

আরও দেখ, ভক্ত-চরিত্রে দীনতা অমৃত-স্বরূপ ; এই অমৃত-সিঞ্চনের দ্বারা সিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত জীব হৃদয়ের অন্তর্নিহিত ভক্তির অতি কমনীয় বৃত্তিগুলি অঙ্কুরিত হইতে পারে না ; কাজেই ভক্তির মাধুর্য্য উপলব্ধির জন্য সাধকের চিত্তে যে স্নিগ্ধতার—যে সরসতার—প্রয়োজন তাহাও ততক্ষণ আসিতে পারে না। বাস্তবিক, যে দিন ভগবৎকৃপায় সাধকের চিত্তে এই দীনতা আসে, সেই দিনই সাধক জীবনের সুপ্রভাত। প্রকৃত ভক্তের প্রাণে কোনরূপ আত্মাভিমানের স্থান নাই, তাই তিনি স্বতঃই সকলের নিকট সর্ব্বদা নত-মস্তক। প্রকৃত ভক্তের দৈন্য দেখিলে মনে হয়, যেন তিনি বিশ্ববাসী সকলের নিকট প্রণতি-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রশ্ন। 'দীনতা' ভক্ত চরিত্রের একটি অবশ্য অবলম্বনীয় বিশিষ্ট সদ্‌গুণ সত্য, কিন্তু এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা ব'লে থাকেন,—যার তার কাছে যখন তখন নিজের অপকর্ষতা জ্ঞাপন ক'রে দৈন্য প্রকাশ করা অথবা প্রণত হওয়া—ওটা একপ্রকার হীনতারই পরিচায়ক : এ বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

উত্তর। দেখ, এরূপ কথা যাঁহারা ব'লেন, সেটি তাঁহাদের অজ্ঞানতা ছাড়া আর কিছুই নয়। সকলের কাছেই বিনয়াবনত হওয়া যে ভক্তির একটি শ্রেষ্ঠ অনুশীলন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। এর দ্বারা কত উপকার হয় জান? এর দ্বারা সাধকের চিত্ত হ'তে দম্ভ, অহঙ্কার এগুলি সব ক'মে যায়; ক্রমশঃ সাধকোচিত দৈন্যাত্মিকা বুদ্ধি বর্দ্ধিত হইতে থাকে। ভাল, প্রণাম করাটা যদি অন্যের নিকট নিজের অপকর্ষতা জ্ঞাপন করাই হয়, তাহ'লেও তো উহার একটা উপকারিতা আছে; যেহেতু যতক্ষণ আমরা অপরকে আমাদের অপেক্ষা উন্নত ব'লে মনে করিতে না পারিব ততক্ষণ আমরা কাহারও নিকট হইতে কোন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইব না। আর এক কথা,—ভক্ত কি যাকে তাকে প্রণাম করে, না সম্মান দেয়? ইতঃপূর্ব্বেই তো তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিলে তোমরা দেখিতে পাইবে, ভক্ত জীবমাত্রকেই শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান-ক্ষেত্র জানিয়া নতশিরে সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—"যৎকিঞ্চভূতং প্রণমেদনন্যঃ", "প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডাল-গো-খরং"; শ্রীভগবান্ সর্ব্বভূতেই আছেন এই বোধে সাধক ভক্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া, এমনকি কুক্কুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সমুদায় জীবকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে। অতএব দেখ, প্রণাম করাটাকে ভক্তিশাস্ত্র কত বড় ক'রে বুঝাইয়াছেন। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, দীনতা হীনতার পরিচায়ক নয়, উহা ভক্তির একটি অত্যুৎকৃষ্ট অনুশীলন। নিরন্তর ভগবৎ-স্মৃতিই দীনতার জনক।

আরও দেখ, কেবল যে সাধক-জীবনে অর্থাৎ পারমার্থিক ভক্তিলাভের পথে দীনতা অবলম্বনের প্রয়োজন, তাহা নহে; ব্যবহারিক জীবনেও অর্থাৎ লোক-ব্যবহারেও এই বিনয় অবলম্বনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। বিনীত ব্যবহার সর্ব্বত্রই মানবকে বড় বই ছোট করে না। এবিষয়ে একটি ছোট গল্প কথিত আছে, শুনিলে বোধ হয় বিষয়টি তোমরা ভাল করিয়া বুঝিতে

পারিবে। গল্পটি এই,—কোন সময়ে একজন প্রতাপশালী রাজা পাত্র মিত্র সমভিব্যাহারে নগর পরিদর্শন করিবার জন্য রাজপথে বাহির হইয়াছিলেন. রাজোচিত গীতবাদ্য-সমন্বিত শোভাযাত্রা তাঁহার অগ্রে অগ্রে চলিতেছিল; রাজপথের দুই পার্শ্বে বহু লোক দণ্ডায়মান হইয়া রাজ-সম্মান দান করিতেছিল এবং সমস্বরে রাজার জয়গান করিতেছিল। এমন সময়ে এক স্থানে রাজা দেখিতে পাইলেন, সমবেত প্রজামণ্ডলীর মধ্যে একজন অতি দীনহীন সামান্য লোক নতজানু হইয়া অবনতমস্তকে তাঁহাকে রাজ-সম্মান দান করিতেছে। ইহা দেখিবামাত্র রাজা তাঁহার যান হইতে অবতরণ করিয়া পদব্রজে সেই দীন-দরিদ্র লোকটির নিকটে আসিলেন এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর বিনয় প্রকাশ করিয়া করযোড়ে সেই সামান্য লোকটির নিকট প্রণত হইলেন। এইরূপ একটি বিসদৃশ ব্যাপার দর্শন করিয়া পাত্র-মিত্র প্রভৃতি রাজ-পারিষদগণ শশব্যস্ত হইয়া রাজাকে বলিলেন,—'মহারাজ! এ কি করিলেন? আপনি রাজাধিরাজ মহারাজ, শত শত রাজার রাজমুকুট আপনার পাদপীঠ স্পর্শ ক'রে থাকে; আপনি এত বড়—এত মহান্ হ'য়ে আজ কিনা এই সামান্য দীন-দরিদ্র লোকটিকে অবনতমস্তকে প্রণাম করিলেন! এরূপ ব্যবহার আপনার পক্ষে নিতান্তই অশোভনীয়; ইহাতে আমাদের মনে হয়, আপনার মস্তিষ্ক-বিকৃতির লক্ষণই প্রকাশ পাইতেছে।' রাজা উত্তর করিলেন,—'তোমরা কি এই লোকটি অপেক্ষা আমাকে সর্ব্ববিষয়ে বড় বলিয়া স্বীকার কর?' তখন সকলে বলিলেন,—'আপনি মহারাজ—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—আপনি যে সর্ব্ববিষয়েই সকলের চেয়ে বড়, একথা বলাই বাহুল্য।' তখন রাজা হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—'আমি যদি সব বিষয়ে এই লোকটির অপেক্ষা বড়ই হই, তবে দীনতায় অর্থাৎ বিনয় প্রকাশ বিষয়ে আমি ইঁহার অপেক্ষা ছোট হইব কেন? তাই আমি অধিকতর বিনীত হইয়া ইঁহার নিকট প্রণত হইলাম।' তখন সমবেত সমস্ত লোক রাজার এই কথা শুনিয়া তাঁহার মহত্ত্বের প্রশংসা করিতে

লাগিলেন। এখন তোমরা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিলে যে, বিনয় বা দীনতা প্রকাশ করা হীনতা নহে, উহা লোককে বড় বই ছোট করে না; একেই বলে,—'বড় হবি তো ছোট হ।'

আরও দেখ, নীতিকথা-প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই তোমরা শুনিয়াছ যে, 'বিদ্যা বিনয়ং দদাতি'—বিদ্যা বিনয় দান করে অর্থাৎ বিদ্যালাভের ফলে শিক্ষিত ব্যক্তি সকলের নিকট বিনয়ী হইয়া থাকেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির চরিত্রে যদি বিনয়ের পরিচয় না পাওয়া যায় তবে তাঁহার বিদ্যালাভ করাই বৃথা; তাঁহার বিদ্যা, অবিদ্যা অর্থাৎ অভিমানের দ্বারা আচ্ছন্ন থাকায় জনসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে না।

বস্তুতঃ দীনতা মানব-চরিত্রের একটি অতি মহৎগুণ; উহা মানবের অন্তরের সৌন্দর্য্য ও চরিত্রের মাধুর্য্য বর্দ্ধন করিয়া থাকে। ভক্তের দীনতা সর্ব্বথা আন্তরিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়; ভক্তের আন্তরিক দৈন্য ভক্তিরাজ্যের অমূল্য সম্পত্তি। সাধন-পথে এই দৈন্য-প্রণতি কত যে মধুময়, তাহা একমাত্র নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণেরই আস্বাদ্য। পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, সাধকের চিত্তে এই দীনতার বোধ আসা শ্রীভগবানের বিশেষ-কৃপা-সাপেক্ষ; এই ভগবৎকৃপার স্নিগ্ধধারা আবার সাধু গুরু ও মহৎকে দ্বার করিয়াই সাধকের উপর বর্ষিত হয় অর্থাৎ সাধু গুরু ও মহতের কৃপা ভিন্ন সাধক এই ভগবৎ-কৃপা অনুভব করিতে সমর্থ হন না।

আরও দেখ, শ্রীভগবানের জগন্মঙ্গল অনন্ত নামের মধ্যে তাঁহার 'দীনবন্ধু', 'দীনশরণ', 'দীনদয়াল', 'দীননাথ', 'কাঙ্গালের ঠাকুর' প্রভৃতি দীনতার মহত্ত্ব-জ্ঞাপক বিশেষ বিশেষ নামগুলি বড়ই শোভনীয় এবং প্রপন্ন সাধক ভক্তের নিকট অতীব আশাপ্রদ, লোভনীয় এবং সাদরে গ্রহণীয়।

এই প্রসঙ্গে আর একটি গূঢ় রহস্যের কথা তোমাদিগকে বলিতেছি,—দেখ, শ্রীধাম বৃন্দাবন চিন্ময় প্রেমভূমি—লীলাময় শ্রীগোবিন্দের নিত্য-লীলা-

স্থলী। ব্রজবাসী ভজনশীল নিষ্কিঞ্চন সাধক ভক্তগণ সকলেই যেন দীনতার প্রকট মূর্ত্তি; এমনকি, শ্রীবৃন্দাবনের তরু-গুল্ম-লতাগুলি পর্য্যন্তও শ্রীধামের কি এক অনির্ব্বচনীয় মাহাত্ম্যে প্রাকৃতিক নিয়মেই নিম্নাভিমুখী হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহাদিগের শাখা প্রশাখাগুলির গতি অন্যান্য স্থানের তরু-গুল্ম-লতাদির মত উর্দ্ধাভিমুখী না হইয়া নিম্নদিকেই প্রসারিত হয়; দেখিলে মনে হয় যেন তাহারা ভক্তিভরে শ্রীভগবানের চরণে প্রণত হইয়া নতশিরে অবস্থান করিতেছে। শ্রীবৃন্দাবনস্থ তরু-গুল্ম-লতাগুলির গতির স্বাভাবিক নিয়মের এই ব্যতিক্রম যেন জগতের সমক্ষে এই সত্য বিঘোষিত করিতেছে যে, জীব-হৃদয়ে ভক্তি-প্রেমের উদয় হইলে জীব স্বতঃই এইরূপ নত হইয়া পড়ে। যাঁহারা শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়াছেন, তাঁহারা এই অভিনব ব্যাপার অবশ্যই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, তোমরা শ্রীচৈতন্যভাগবত, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, ভক্তমাল প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ-বর্ণিত আদর্শ ভক্ত-চরিত্রগুলি আলোচনা করিলে 'ভক্তের দৈন্য' দেখিয়া মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া যাইবে। পতিতপাবন প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিকরবর্গের মধ্যে সকলেই এই দীনতার খনি। শ্রীল রূপ-সনাতন, হরিদাস ঠাকুর, রঘুনাথ দাস, শ্রীধর প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় আদর্শ ভক্তের দৈন্যের কথা শুনিলে মনে হয়, এই সকল জগত-পাবন মহাপুরুষ দীনতার মূর্ত্তিমন্ত জীবন্ত-বিগ্রহ-রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহাদের দৈন্যের সমুজ্জ্বল আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া অর্থাৎ সর্ব্বদা স্মৃতিপথে জাগরূক রাখিয়া এবং তাঁহাদের চরণে নিত্য ভক্তিভরে প্রণত হইয়া সাধক-জীবনলাভেচ্ছু ভক্ত মাত্রেরই সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গে তোমরা এ কথাটিও জানিয়া রাখিও যে,—**শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্ম মাত্র এইরূপ কএকটি দীনাতিদীন কাঙ্গালের দ্বারাই জগতে প্রচারিত হইয়াছিল।**

ভক্ত-জনোচিত দীনতা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইল ঐ গুলি তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও। অতঃপর, এস আমরা সাধকোচিত 'সহিষ্ণুতা' এবং 'ক্ষমাশীলতা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা।

সাধকের পক্ষে **'সহিষ্ণুতা'** অর্থাৎ সহ্যগুণ অবলম্বন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যিনি ভক্তি-পথের পথিক, শ্রীভগবানে অকপট প্রেমভক্তি লাভ যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহাকে অবশ্যই বৃক্ষের মত সহ্যগুণ আয়ত্ত করিতে হইবে। তোমরা ভক্তি-শাস্ত্রে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে দেখিতে পাইবে যে, তিনি সাধককে 'তরোরিব সহিষ্ণু' হইবার উপদেশ দিয়াছেন। বৃক্ষকে কাটিলেও বৃক্ষ যেমন ছেদনকারীর প্রতি রুষ্ট হয় না, বরং অন্যপক্ষে তাহাকেই ছায়া এবং ফল দানে তৃপ্ত করিয়া থাকে, ভক্ত সাধককেও ঠিক ঐ প্রকার সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তিনি আধ্যাত্মিক পথের পথিক, তাঁহার লক্ষ্য অনেক উপরে,—জাগতিক লাভ পূজা প্রতিষ্ঠার দিকে নয়, শ্রীভগবানের দিকে। সেই উপরের দিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তাঁহাকে জাগতিক যাবতীয় ঘাত-প্রতিঘাত অর্থাৎ যে কোন প্রকার দুঃখ, যন্ত্রণা, অত্যাচার, উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করিতেই হইবে; অধিকন্তু উৎপীড়নকারীর প্রতি ক্রোধ বা বিদ্বেষভাবের পরিবর্ত্তে করুণা ও ক্ষমার ভাব পোষণ করিতে হইবে। কাজেই অপর কর্ত্তৃক অন্যায়-রূপে নির্য্যাতিত এমনকি ক্ষতিগ্রস্ত হইলেও প্রতিকারের প্রত্যাশায় সাধক কখন কাহারও নিকট অভিযোগ করিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিবেন না; কারণ সৌভাগ্যক্রমে যে মুখ তিনি একবার উপরের দিকে অর্থাৎ শ্রীভগবানের অভিমুখে ফিরাইতে সক্ষম হইয়াছেন, প্রতিকারের আশায়

মানুষের মুখাপেক্ষা করিতে গিয়া তাহা আবার নীচের দিকে ফিরাইবেন কেন? এরূপ ক্ষেত্রে যদি প্রশ্ন উঠে যে,—সহ্য করা ভাল, না প্রতিকারের চেষ্টা করা ভাল? তবে সাধারণ ভাবে এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের মনে হয়,—প্রতিকারের চেষ্টা করাই ভাল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের জীবনে এমন অনেক সামান্য সামান্য প্রতিকূল অবস্থা বা ঘটনা ঘটে, যে গুলি সহ্যের দ্বারা আপনা হ'তেই প্রতিকার হ'য়ে যায়, সে গুলি অবশ্য স'য়ে যাওয়াই ভাল; তবে যে গুলি অবাধে সহ্য করিতে গেলে ব্যবহারিক হিসাবে তার পরবর্ত্তী ফল খারাপ দাঁড়ায়, সাধারণ লোকে সেইগুলি অন্য কোন উপায়ে প্রতিকারের চেষ্টা ক'রে থাকে। কিন্তু যাঁহারা সাধন-পথের পথিক তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, মোটের উপর এই সংসারটা কোলাহলেরই স্থান; এখানকার গোলমাল—এখানকার অত্যাচার, উৎপীড়ন কোন দিনই মিটিবে না এবং রোগ, শোক, মনস্তাপ প্রভৃতি কোন দিনই কমিবে না। কাজেই অপ্রতিবিধেয় প্রতিকূল ঘটনা বা অবস্থা গুলি সহ্য ক'রে যাওয়া ছাড়া মানুষের গত্যন্তর নাই। এই সংসারটা এক হিসাবে সাধকোচিত সহিষ্ণুতার শিক্ষাক্ষেত্র।

আরও দেখ, মানবজীবনের পূর্ণতা আসে সংযমে, অর্থাৎ সহিষ্ণুতায়, ত্যাগে এবং ভালবাসায়। যিনি যত সংযমী অর্থাৎ যিনি যত সহ্য করিতে পারেন, তিনি তত শীঘ্র আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে সক্ষম। প্রকৃত ধর্ম্মজীবন কখন সুখ্যাতি, লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার ভিতর দিয়া পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয় না; ইহার পূর্ণতা, দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, নিন্দা, অপমান, নির্য্যাতন, উৎপীড়ন প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থাগুলি অম্লান বদনে সহ্য করার ভিতর দিয়া লাভ হয়। ভক্ত সাধককে উপরের দিকে চে'য়ে,—অর্থাৎ সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবানের করুণায় সুদৃঢ় বিশ্বাস ক'রে সমস্তই নীরবে সহ্য করিতে হইবে। এই সহিষ্ণুতার চরম পর্য্যবসানেই মানবের পূর্ণতা। মানব-চরিত্রে

যদি এই সহিষ্ণুতার উৎকর্ষের কোন পরিচয় না পাওয়া যায়, তবে সেখানে আর মনুষ্যত্বই বা কোথায় থাকে আর ধর্ম্মই বা কোথায় থাকে ? জাগতিক যাবতীয় দুঃখ কষ্টের বোঝা যুগপৎ স্কন্ধে আসিয়া পড়িবে, তবুও তাঁর অর্থাৎ শ্রীভগবানের করুণায় সন্দিহান না হইয়া অচল অটল ভাবে সে সকল সহ্য করিতে হইবে ; এইটিই সাধকোচিত সহিষ্ণুতার অগ্নি-পরীক্ষা।

ভক্তের সহিষ্ণুতার সমভূমীত্ব অর্থাৎ সীমা কত উর্দ্ধে তাহা শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে। তোমরা হরিদাস ঠাকুর, যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি জগতপাবন প্রাতস্মরণীয় মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে তাহা জানিতে পারিবে। ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস ঠাকুর বাইশ বাজারে যবনগণ-কর্ত্তৃক নিদারুণ বেত্রাঘাত নীরবে সহ্য করিয়াও আঘাতকারীগণের জন্য শ্রীভগবানের কাছে করযোড়ে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"এসব অজ্ঞেরে প্রভূ করিহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে এ সবার নহ অপরাধ ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত

মহাত্মা যীশুখৃষ্ট বিধর্ম্মীগণ কর্ত্তৃক লৌহশলাকা দ্বারা ক্রুশকাষ্ঠে বিদ্ধ হইয়া এবং কণ্টকের মুকুট পরিধান করিয়া রক্তাক্ত কলেবরে সুতীব্র শারীরিক যন্ত্রণা অম্লান বদনে সহ্য করিয়াও সেই পরমপিতা ঈশ্বরের নিকট অত্যাচারী-গণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অতএব আদর্শ ভক্ত মহাপুরুষগণের সহিষ্ণুতার সীমা কত উর্দ্ধে তাহা তোমরা একবার ধারণা করিবার চেষ্টা কর দেখি। বাস্তবিক কি মহান্ প্রেমের এবং করুণার প্রাণ এই সমস্ত অলৌকিক সহিষ্ণুতার জনক,—সাধারণ জীব আমরা, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ক্ষুদ্র ধারণাশক্তির সম্পূর্ণ অতীত। মনে হয়, ঐ সমস্ত জগতপাবন অবতারকল্প মহাপুরুষ সহিষ্ণুতার চরম ও সমুজ্জ্বল আদর্শ লইয়া কোন্ সমুন্নত পুণ্যধাম হইতে আমাদের এই মর-জগৎ পবিত্র করিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন।

সহিষ্ণুতার সহিত '**ক্ষমাশীলতা**'র একটি ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ আছে; যিনি সহিষ্ণু, তিনি অবশ্যই ক্ষমাশীল হইবেন; এই ক্ষমাশীলতার একটা প্রবল শক্তি আছে, সেটি কিরূপ জান? যদি কোন ব্যক্তি আমাদের প্রতি অযথা অত্যাচার বা উৎপীড়ন করেন, আর আমরা যদি সেই অন্যায় অত্যাচার নীরবে সহ্য ক'রে ক্ষমার জলে ধুয়ে ফেলে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াতে পারি, তবে সেই অন্যায়ের জন্য অবশ্যই তাঁহাকে অনুতপ্ত হইতে হইবে এবং 'ক্ষমা'র উন্নত আদর্শে তাঁহার অত্যাচার-পরায়ণ চরিত্র পরিবর্ত্তিত ও পরিশোধিত হইয়া যাইবে। দুর্ব্বৃত্ত জগাই মাধাই কর্ত্তৃক কলসীর কানার প্রচণ্ড আঘাতে রক্তাক্ত-কলেবর হইয়াও করুণামাখা-প্রাণ শ্রীমন্নিত্যানন্দের অসীম ক্ষমার এবং মারখেয়েও তাহাদিগকে 'ভাই' ব'লে ডাকার আদর্শে মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহাদের পাষণ্ড প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছিল একথা সকলেই জানেন। ইহাই সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার অন্তর্নিহিত একটি সুগূঢ় রহস্য। অন্যপক্ষে সহ্যগুণ অবলম্বন করায় আমাদের নিজেরও একটা মহৎ উপকার সাধিত হয়। অপর কর্ত্তৃক অত্যাচার উৎপীড়ন অথবা নিজেরই শারীরিক বা মানসিক কোনপ্রকার দুঃখ-যন্ত্রণা এ গুলিকে আপাতঃদৃষ্টিতে আমরা বড় কষ্টদায়ক ব'লে মনে করি বটে, কিন্তু এগুলিরও একটা উপকারীতা আছে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায় যে, প্রতিকূল ঘটনাদির দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না। দেখ, একপ্রকার সামুদ্রিক মৎস্য আছে, প্রথমে তাহাদের চক্ষু ফোটে না; স্বাভাবিক নিয়মে তাহারা ক্রমাগত জলের ভিতর দিয়া অতি বেগে ছুটাছুটি করিতে আরম্ভ করে; এইরূপে জলের ভিতরে ছুটিবার সময় সমুদ্র-গর্ভ-নিহিত পর্ব্বত-গাত্রে তাহাদের মস্তক সজোরে আঘাত প্রাপ্ত হয়, তখন তাহাদের একটা দেখিবার প্রবৃত্তি জাগে, তারপর ক্রমে তাহাদের চক্ষু ফোটে: একেই বলে,—'ঠেকে শেখা'। তাই বলি, তোমরা দুঃখ কষ্ট প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থাগুলিকে কখন মন্দ মনে ক'রে

।র ও অভিভূত হইও না। এইটি স্থির জানিও যে, **প্রত্যেক দুঃখই মানবাত্মার বিকাশোপযোগী কোন না কোন অভিজ্ঞতার সৃষ্টি ক'রে দিয়ে থাকে।**

সাধারণ লোকের ভিতর অভিমান অহঙ্কার এত বেশী থাকে যে, অপর কর্তৃক সামান্য একটা কটূক্তি বা অপমান-সূচক কথা তাহারা মোটেই সহ্য করিতে পারে না। কিন্তু সাধু মহাত্মাগণ এরূপ সামান্য কারণে অধীর হইয়া তাঁহাদের স্বাভাবিক শান্তি নষ্ট করেন না। দেখ, শ্রীভগবান্ একজনকে কটূক্তি বা অপমান-সূচক কথা বলিতে দেন, আর একজনকে সেগুলি শুনিতে এবং সহ্য করিতে দেন; যাহার সহ্যগুণ নাই, যে ব্যক্তি সহসা অপরকে দুর্ব্বাক্য বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহাকে তিনি নীচে নামিয়ে দেন অর্থাৎ সে কখন চরিত্রে উন্নত হইতে পারে না; বরং উত্তরোত্তর অবনতির পথেই চালিত হয়। আর যে ধীর ব্যক্তি অপরের অযথা কটূক্তি নীরবে সহ্য করিতে সক্ষম, তাঁহাকে তিনি বাড়িয়ে উপরে তুলে দেন অর্থাৎ তাঁহার চরিত্রের মহত্ত্ব উত্তরোত্তর আরও বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে। যে ব্যক্তি অসহিষ্ণু অর্থাৎ যে অতি সহজেই অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়, সে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার নিজের শান্তিকে হারাইয়া ফেলে; বল দেখি, তাহার মত মূর্খ কে? এরূপ অসহিষ্ণু ব্যক্তি কি করিয়া ভক্তি-পথে অগ্রসর হইতে পারিবে? এই সংসারটা সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্বক্ষেত্র; এখানে প্রত্যেক মানবকেই নানাপ্রকার ঘাত প্রতিঘাতের অর্থাৎ প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনা পরম্পরার ভিতর দিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ক্রমে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে। তাই বলি, সর্ব্বাগ্রে সহিষ্ণু হইতে চেষ্টা কর; দেখ, ধৈর্য্য ধরিবার অশেষ গুণ; একটি চলিত কথায় লোকে বলিয়া থাকে,—'যে সয়, সে মহাশয়; যে না সয়, সে নাশ হয়'; কথাটি খুব দামী কথা। প্রত্যেক মানবেরই সহিষ্ণুতা শিক্ষা করা উচিত; বিশেষতঃ যাঁহারা সাধন-পথের পথিক, তাঁহাদিগের পক্ষে সকল

বিষয়েই সহিষ্ণুতা বা ধৈর্য্যাবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন, যেহেতু এইটি তাঁহাদের সাধনের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ ; 'তরোরিব সহিষ্ণু' কথাটি যেন সর্ব্বদা তাঁহাদের স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকে।

আর এক কথা, যাঁহারা সাধক-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁহারা আর জগতের সাধারণ জীবগুলির মত আধিভৌতিক নন ; তাঁহারা এখন আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী। তাঁহাদের চাল চলন, আচার ব্যবহারে সাধারণ লোকের চাল চলন, আচার ব্যবহার অপেক্ষা একটু অসাধারণত্ব থাকিবেই থাকিবে। সে অসাধারণত্ব কিরূপ জান ? শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখে ভক্তের যে সমস্ত লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদিগকে সেই লক্ষণগুলি সর্ব্বদা মনে রাখিয়া চলিতে হইবে, 'তুল্যনিন্দা-স্তুতির্ম্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' এইরূপ হইতে হইবে ; নিন্দা ও সুখ্যাতি উভয় ক্ষেত্রেই তুষ্ণিভাব অবলম্বন করিতে হইবে। যিনি লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ তিনি কখন লোকের নিন্দাবাদে অসন্তুষ্ট হইয়া চঞ্চল হন না এবং লোকের সুখ্যাতিতেও আনন্দে আত্মহারা হন না ; যেহেতু তিনি জানেন যে, আজ যে ব্যক্তি শতমুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিতেছে, কাল হয়ত সেই ব্যক্তিই নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁহার অযথা নিন্দাবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইবে না ; কাজেই মানুষের নিন্দাস্তুতির কোন মূল্য নাই। তোমরা যদি লোকের নিন্দাবাদ বা প্রশংসাবাদের বেগ সহ্য করিতে না শিখে থাক, তবে কি ক'রে প্রকৃত ভক্ত-জীবন লাভ করিতে পারিবে ?

এই গেল বহির্জ্জগতের বস্তু, বিষয় বা ব্যক্তি সম্বন্ধীয় নিন্দা, অপমান বা নির্য্যাতন এবং রোগ, শোক, দুঃখ, যন্ত্রণা ইত্যাদি অবশ্যম্ভাবী প্রতিকূল অবস্থাগুলি সহ্য করার কথা ; এ গুলি ছাড়া অন্তর্জগতে অর্থাৎ মানুষের নিজের মনের মধ্যে বহু জন্ম-সঞ্চিত অনন্ত সংস্কারের ফলে কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি নানা প্রকার দুর্ব্বার কুপ্রবৃত্তির বেগ উদয় হইয়া মানবকে

সময়ে সময়ে এরূপ ব্যতিব্যস্ত ও অভিভূত করিয়া ফেলে যে, খুব ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন ব্যতিরেকে মানুষ কিছুতেই তাহার স্বাভাবিক শান্ত ও অচঞ্চল সাম্যাবস্থা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। সাধকের পক্ষে অভ্যাসের দ্বারা ঐ গুলির বেগ সহ্য করিতে শিক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। মহতের চরণাশ্রয় পূর্ব্বক অনবরত জ্ঞানালোচনা দ্বারা উন্নত সংস্কারের আবির্ভাব এবং অভ্যাস-যোগ দ্বারা ক্রমশঃ সংযম অর্থাৎ নিরোধশক্তি আয়ত্ত করা ভিন্ন ঐ সমস্ত দুর্দ্দমনীয় মানসিক কুপ্রবৃত্তির বেগ সহ্য করিবার উপায়ান্তর নাই।

এইবার ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে আর দুই একটি কথা তোমাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি, মনোযোগ দিয়া শুন। দেখ, ক্ষমা করা মানব-চরিত্রের একটি অতি মহৎ গুণ; বাস্তবিক, ক্ষমা মানব-হৃদয়ের একটি শ্রেষ্ঠ বৃত্তি; ক্ষমা গুণটি এতই বড় এবং এতই মধুময় যে, ক্ষমাশীল মহৎ ব্যক্তিগণ দোষী ব্যক্তিকে প্রথমেই ক্ষমা করিয়া কোলে তুলিয়া লন অর্থাৎ অপরাধী ব্যক্তি,—'আমার অপরাধ হইয়াছে আমায় ক্ষমা করুন' একথা বলিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ক্ষমার্হ দোষী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকেন; তবেই দেখ, ক্ষমাশীল ব্যক্তির হৃদয় স্বভাবতঃই কত উদার এবং কত উন্নত। ক্ষমা অপরাধী ব্যক্তির অনুতপ্ত হৃদয়কে স্নিগ্ধ শান্ত ও তৃপ্ত করিয়া থাকে।

প্রশ্ন। অনেকে ক্ষমা করাকে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা অথবা কাপুরুষতা ব'লে থাকেন; এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর। দেখ, পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি ক্ষমা মানব-চরিত্রের একটি মহৎ গুণ; কাজেই ক্ষমা করাকে কাপুরুষতা বা দুর্ব্বলতা বলা নিতান্ত অযৌক্তিক। এরূপ কথা যাঁহারা বলেন, সেটি তাঁহাদের অজ্ঞানতারই পরিচায়ক। ক্ষমা দুর্ব্বলের গুণ এবং বলবানের ভূষণ-স্বরূপ; ক্ষমা উভয় পক্ষকেই সুখী ক'রে থাকে। এই ক্ষমাশীলতা মানবোচিত সহিষ্ণুতারই পরিচায়ক; সেই সহিষ্ণুতাকে কিরূপে কাপুরুষতা বলা যাইতে পারে?

যেহেতু সমর্থ বলবান ব্যক্তি অসমর্থ দুর্ব্বল ব্যক্তিকে তাহার কোন দোষের জন্য কটুক্তি অথবা প্রহার করিয়া যে প্রতিশোধ লইতে চান, তাহাকে ক্ষমা করিয়া তিনি তদপেক্ষা বেশী আনন্দ লাভ করিতে পারেন; অন্য পক্ষে ক্ষমাই দোষী ব্যক্তিও ক্ষমা প্রাপ্ত হইয়া ক্ষমাশীল ব্যক্তির নিকট হইতে একটি উন্নত আদর্শ লাভ করিয়া সুখী ও ধন্য হন। আরও দেখ, আমরা দৈবাৎ অপরের নিকট কৃতাপরাধী হইলে যখন স্বতঃই ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকি, তখন কেহ আমাদের নিকট কৃতাপরাধী হইলে তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করা আমাদের উচিত নয় কি? ক্ষমাশীলতা হৃদয়ের সমূহ উন্নতির পরিচায়ক এবং এই ক্ষমাশীলতার উন্নত আদর্শই জগতে শত শত অপরাধী ব্যক্তির অনুতপ্ত প্রাণকে স্নিগ্ধ ক'রে দিয়ে থাকে; এইরূপ উন্নত হৃদয়ই আধ্যাত্মিক পথে অর্থাৎ ভক্তিলাভের পথে অগ্রসর হইবার যোগ্য। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে,—ক্ষমাশীলতা, দুর্ব্বলতা বা কপুরুষতা নহে।

প্রশ্ন। এমন অনেক ব্যক্তিকে দেখা যায় যাঁহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা ক'রে থাকেন, সাধন-ভজনও করেন, কিন্তু অপরের সামান্য একটি ত্রুটি সহ্য করিতে পারেন না। সাধক ভক্তের পক্ষে এই প্রকাব অসহিষ্ণুতা কেমন যেন একপ্রকার বিসদৃশ বলিয়া বোধ হয়; এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তর। তোমরা সত্যই বলিয়াছ; এইরূপ স্বভাব-সম্পন্ন ব্যক্তি প্রকৃত-পক্ষে ভক্ত নামের অযোগ্য। আজকালকার অনেক ভক্ত-অভিমানী ব্যক্তি কোন কৃতাপরাধী ব্যক্তিকে ক্ষমা করিতে তো জানেনই না, বরং তাহার উপর একটা বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়া থাকেন। যিনি কাহারও কোন অপরাধ ক্ষমা করিতে শিখেন নাই, ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে যাওয়া তাহার পক্ষে একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। এই প্রসঙ্গে একটি প্রত্যক্ষ ঘটনার কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইবে;—একদিন

একজন ব্রাহ্মণ স্নানান্তে গঙ্গার তীরে বসিয়া আহ্নিক করিতেছিলেন। তাঁহার নিকটেই অপর একজন ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন; ভদ্রলোকটি অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থুতু ফেলিতে যাওয়ায় দৈবাৎ একটা থুতুর কণা হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া সেই আহ্নিক-রত ব্রাহ্মণের গাত্রে পড়িয়াছিল। ইহাতে ভদ্রলোকটি নিজের অসাবধানতার জন্য নিতান্ত ক্ষুণ্ণ ও লজ্জিত হইয়া ঐ ব্রাহ্মণের নিকট করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। সময়ে সময়ে একটু অসাবধানতাবশতঃ দৈবাৎ এইরূপ ঘটনা যে না ঘটে, তা নয়। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেই ব্রাহ্মণটি ভদ্রলোকটির উপর ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন; একেবারে চ'টে লাল;—এই মারে তো এই মারে; ক্রোধে আগুন হ'য়ে ব্রাহ্মণ সেই ভদ্রলোকটিকে যা-নয়-তাই ব'লে যৎপরোনাস্তি কটূক্তি করিলেন। এই ব্যাপারটি দেখিয়া কি মনে হ'য়েছিল জান? বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণোচিত আভিজাত্য-গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিলেও তিনি প্রকৃত পক্ষে আজিও 'ব্রাহ্মণ' হইতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণ অবশ্য সত্ত্বগুণী এবং সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইবেন; ব্রাহ্মণের গলদেশে ঐ যে কএকগাছি যজ্ঞসূত্র থাকে, ওগুলি কি জান? ঐগুলি ক্ষমাগুণের নিদর্শন। প্রকৃত ব্রাহ্মণ মূর্ত্তিমন্ত ক্ষমার সমুজ্জ্বল আদর্শ; যাঁহার ক্ষমাগুণ নাই তিনি কি ক'রে নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া পরিচয় দিতে পারেন? বিশ্বামিত্র ক্ষমার আদর্শ নন, ক্ষমার সমুজ্জ্বল এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ বশিষ্ঠদেব। ওঃ! কত বড় মনের জোর, শত পুত্র নাশ হ'য়ে গেল তবুও ক্ষমা! যজ্ঞোপবীতের যথার্থ মর্য্যাদা মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠদেবই অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের ক্ষমাগুণ এইরূপ হওয়া চাই। অতএব ঐ অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণের ক্রুদ্ধ আচরণ দেখিয়া বলা যাইতে পারে যে,—"ওহে ব্রাহ্মণ! আপনি না সেই ক্ষমাগুণের

আদর্শ বশিষ্ঠদেবেরই উত্তর পুরুষ? দৈবাৎ একটা থুতুর কণা বাতাসে উড়িয়া গিয়া না হয় আপনার গায়ে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহাতে কি আপনি একেবারে অপবিত্র হ'য়ে গেলেন? এ শুচিবাই কেন? আপনি তো জানেন যে দৈববশতঃ ঈশ্বর-ইচ্ছায় এমন অনেক ঘটনা ঘটে যাহার উপর মানুষের কোন হাত নাই; তবে এই ব্যাপারটির ভিতর দিয়াও 'তাঁর ইচ্ছা' বুঝিতে শিখেন নাই কেন? আপনি শ্রীভগবানের নামজপ ও ধ্যান-ধারণা করিতে চান, কিন্তু তৎপূর্ব্বে ক্ষমাশীল হইতে অভ্যাস করুন, লোকের প্রতি ক্রোধ ও বিদ্বেষ-বোধ ত্যাগ করুন, তারপর জপ আহ্নিক করিবেন।"

দেখ, কতকগুলি অবনত সংস্কারে মানুষ এমন আবদ্ধ হইয়া থাকে যে, সেগুলি সে কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারে না। এই দেখ না, এক শুচিবাইএর গণ্ডীতেই শত শত লোক আবদ্ধ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; ঐগুলি ধর্ম্মপথে মানুষকে অনেক পশ্চাতে ফেলিয়া রাখে, কিছুতেই অগ্রসর হইতে দেয় না। সাধককে প্রথমে ঐ সমস্ত অবনত সংস্কারের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইবে; কৃতাপরাধী ব্যক্তির সমস্ত দোষ সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা করিতে শিখিতে হইবে; তাহা না হইলে কোন দিনই এ পথে অর্থাৎ ভক্তিলাভের পথে এগুনো যাবে না। তাই বলি, তোমরা কৃতাপরাধী ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ক্ষমা করিবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিও। আর তোমরা একথাটি অবশ্যই বুঝিতে পার যে, যাহাতে শক্তি বেশী থাকে সেই সহ্য করিতে পারে; যিনি সহ্য করিতে পারেন না তাঁহার আবার মহত্ত্ব কোথায়? অপরাধী ব্যক্তির অপরাধ ক্ষমা করিয়া জগতের ইতিহাসে কোন মানব কখনও নিন্দনীয় হন নাই, বরং প্রশংসাভাজনই হইয়াছেন।

পরিশেষে সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতা সম্বন্ধে তোমরা আমার এই

কথাটি মনে রাখিও যে শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি-লাভই যখন সাধক-জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং তাঁহার শ্রীচরণে রতি মতি লাভই যখন জীবের সর্ব্বোত্তমা গতি, তখন ভক্তিলাভেচ্ছু সাধককে অবশ্যই সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল এবং একমাত্র ভগবন্মুখাপেক্ষী হইয়া যাবতীয় প্রতিকূল ঘটনা ও অবস্থাগুলি স্থির এবং ধীর ভাবে সহ্য করিতে হইবে এবং সর্ব্বদা ক্ষমাশীল হইতে হইবে। আদর্শ ভক্ত ও মহাপুরুষগণের চরিত্রে আমরা যে অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার পরিচয় পাই, একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে তাহার মূলে দুইটি জিনিষ বিদ্যমান থাকে; সেই দুইটি কি তা জান? সুদৃঢ় ঈশ্বর-বিশ্বাস এবং একমাত্র ভগবন্নির্ভরতা। বলিতে কি, এই দুটিকেই সাধক জনোচিত সহিষ্ণুতা ও ক্ষমাশীলতার জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

আরও দেখ, আমরা অনেক সময় দৈববশতঃ কত নিষিদ্ধ এবং নিন্দনীয় আচরণ ক'রে ফেলি, কিন্তু সেই অপার করুণাময় শ্রীভগবান্ আমাদের সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। অতএব সেই পরম কারুণিক ক্ষমাময় শ্রীভগবান্কে লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে যে সর্ব্বদা সহিষ্ণু ও ক্ষমাশীল হইতে হইবে একথা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন। আপনার শ্রীমুখের উপদেশগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও আনন্দ-প্রদ; অতঃপর আমাদিগকে কোন্ বিষয়ে উপদেশ দিতে ইচ্ছা করেন?

উত্তর। এইবার তোমাদিগকে সাধকের 'আনুগত্য' ও 'কৃতজ্ঞতা' সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি মন দিয়া শুন।

আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতা।

দেখ, সাধু ও মহতের **আনুগত্য** সাধক জীবনের আর একটি শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। মহৎ ব্যক্তিগণের চরণাশ্রয়ে থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের অনুগত হইয়া চলা এবং তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা সাধক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইতঃপূর্ব্বে যে সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে তাহাতে আমি তোমাদিগকে কোন নূতন কথা বলি নাই; ঐ সমস্ত কথা পূর্ব্বতন সাধু মহাপুরুষগণেরই কথা। তোমরা যেরূপ ধৈর্য্য-সহকারে সেইগুলি শুনিতেছ এবং উত্তরোত্তর শুনিবার জন্য যেরূপ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ তাহাতে মনে হয় শ্রীভগবানের কৃপায় তোমরা শীঘ্রই সাধক-জীবন লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

এই পৃথিবীতে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি কত জীব বাস করে; তাহারা সর্ব্বদা নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালনায় কেবলমাত্র নিকৃষ্ট ভোগসুখে রত থাকিয়া জীবন যাপন করে; কোন উন্নত চিন্তা করিবার অবসর বা সামর্থ্য তাহাদের নাই। কিন্তু তোমরা মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ; এই মানব জীবন কত সমুন্নত বিষয় চিন্তা করিবার অর্থাৎ শ্রীভগবানের প্রতি ভক্তি প্রেম প্রভৃতি ভগবৎ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় কত সমুন্নত বিষয় চিন্তা, গবেষণা ও ধারণা করিবার উপযোগী; সে বিষয়ে যত্নবান না হইয়া যদি তোমরাও কেবল নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালনায় নিকৃষ্ট ভোগ-সুখে রত থাকিয়া পশুর ন্যায় জীবন যাপন করিতে থাক, তবে তাহার তুল্য দুর্ভাগ্য তোমাদের আর কি হইতে পারে? তোমাদিগকে তো বলিয়াছি যে, একটা সাধক-জীবন নিয়মিত-রূপে যাপন করাই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং সার্থকতা। অতএব

সেই সাধক-জীবন লাভ করাই যেন তোমাদের সমুদায় যত্ন ও চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং উহা লাভ করিবার পক্ষে তোমাদের প্রথম কর্ত্তব্য এই যে, সর্ব্বদা সাধু, মহৎ এবং আচার্য্যগণের আনুগত্যে থাকিয়া তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হওয়া।

দেখ যাঁহারা মহৎ—যাঁহারা আচার্য্য শ্রেণীর লোক,—তাঁহারা লোক-শিক্ষক; মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভেচ্ছায় এবং তাঁহার প্রেরণায় তাঁহারা জগতে কেবল 'সত্য' প্রকাশ করিতে আসেন। জগতের এই সমস্ত ভগবৎবহির্ম্মুখ জীবগুলির দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের করুণামাখা প্রাণ স্বতঃই কাঁদিয়া উঠে; তাই তাঁহারা জীবের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তির জন্য স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সদুপদেশাদি দ্বারা তাহাদিগকে শ্রীভগবানের অভিমুখে উন্মুখ করিয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন। যিনি তাঁহাদের এই করুণার—এই জীবদুঃখ-কাতরতার—কথা স্মরণ করিয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং অনুগত থাকেন, তিনি বাস্তবিকই অতি ভাগ্যবান জীব। যাঁহাদের কৃপায় আমাদের বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত ও পরিশোধিত হয়, যাঁহারা আমাদিগকে 'মানুষ' গঠন করিয়া দিবার জন্য দিবারাত্র কত প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, কত সমুন্নত মধুময় জ্ঞান ও ভক্তির ভাব আমাদের প্রাণে সঞ্চারিত করিয়া দিতেছেন, এমন যে করুণাময় ও শুভানুধ্যায়ী আচার্য্যগণ, বল দেখি, তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞ ও অনুগত হওয়া আমাদের উচিত নয় কি? তাঁহাদের অতি স্নিগ্ধ ও প্রিয়দর্শন মূর্ত্তিগুলি চিন্তা করিলে, তাঁহাদের মধুমাখা উপদেশের কথাগুলি স্মরণ করিলে, কাহার প্রাণ না ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত হইয়া আপনা হ'তেই তাঁহাদের চরণের উদ্দেশে প্রণত হ'য়ে পড়ে? যার হয় না, সে নিতান্ত অকৃতজ্ঞ। আর যে অকৃতজ্ঞ, সে তো কৃতঘ্ন; তার জীবনে

শত ধিক্! এরূপ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি কি করিয়া সাধক-জীবন লাভ করিতে পারিবে? আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ অর্থাৎ পারমার্থিক জ্ঞান ও ভক্তি লাভের পথ তাহার পক্ষে চিররুদ্ধ; সেরূপ কৃতঘ্নের জীবন পৃথিবীর দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ। বাস্তবিক অকৃতজ্ঞের জীবন বড়ই করুণার্হ,—দণ্ডার্হ নহে। তোমরা সর্ব্বদা আচার্য্য, গুরু ও মহতের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিবে এবং সর্ব্বদা তাঁহাদের আনুগত্যে থাকিয়া জীবন যাপন করিবে; তাহা হইলে তোমরা জীবনে বিমল আনন্দ ও শান্তি লাভ করিতে পারিবে।

আরও দেখ, তত্ত্বজ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—"নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে"; "শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং"; অর্থাৎ ইহ জগতে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই; আবার সাধু মহতের প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই সেই জ্ঞান লাভ করিবার একমাত্র অধিকারী। এমন যে জ্ঞান, উহা লাভ করিবার আশায় সাধু মহাত্মাগণের নিকট যাইতে হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই খুব শান্ত ও শিষ্ট ভাবে তাঁহাদের নিকট যাইতে হইবে এবং জিজ্ঞাসু ও শুশ্রূষু হইয়া খুব বিনীত ভাবে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণা করিতে হইবে। যাহাতে তাঁহাদের কোন প্রকার শান্তিভঙ্গ না হয় এবং তোমাদেরও কোনরূপ ঔদ্ধত্য প্রকাশ না পায় সে বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে; যেহেতু মহাপুরুষগণ নিজেদের স্বভাবসিদ্ধ শান্তি নষ্ট করিতে ইচ্ছা করেন না। আর, এই কথাটি তোমরা মনে রেখো যে, যারা বৃথা তর্কাভিমানী তারা কখনও আলোচ্য বিষয়ের ভাবধারা গ্রহণ করিতে পারে না; তারা কেবল কথার খোসা (ইংরাজীতে যাকে বলে Formality) লইয়া কামড়াকামড়ি করে

মাত্র। কাজেই তাহারা মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক অনুভূত ধর্ম্মতত্ত্বের মধুময় ভাবগুলি গ্রহণে ও আস্বাদনে বঞ্চিত হয়। তাই বলি, তোমরা তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া বিনীত ভাবে মহৎ ব্যক্তি অথবা আচার্য্যগণের সন্নিধানে উপবেশন করতঃ সৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে এবং একান্ত অনুগত হইয়া বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারে তাঁহাদের সদুপদেশগুলি শ্রবণ ও গ্রহণ করিবে। মহানুভব সাধু মহাত্মাগণ অবশ্যই আমাদের চেয়ে ঢের বেশী বোঝেন; কাজেই একটু বিশ্বাসের এবং ভক্তির প্রাণ নিয়ে তাঁহাদের উপদেশের তাৎপর্য্য অর্থাৎ ভাবধারা গ্রহণ করিতে হয় এবং ধৈর্য্য সহকারে সেগুলি পুনঃপুনঃ আলোচনা করিলে ক্রমশঃ সেই সমস্ত উন্নত তত্ত্বজ্ঞান অবশ্যই তোমরা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তখন দেখিবে স্বতঃই তোমাদের প্রাণ তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইয়া যাইবে।

পরিশেষে আমার ব্যক্তব্য এই যে, কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য দৈবী প্রকৃতির লক্ষণ এবং এই কৃতজ্ঞতা ও আনুগত্য ভিন্ন প্রকৃত সাধক-জীবন লাভ করা যায় না। অতএব তোমরা সর্ব্বদা সাধু, গুরু ও মহতের অনুগত হইয়া চলিও এবং চিরদিন তোমাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আচার্য্যগণের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকিও।

প্রশ্ন। অতঃপর ভক্তিলাভেচ্ছু সাধকের অবলম্বনীয় অন্যান্য সদ্গুণ-গুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন।

উত্তর। এইবার ভক্তের 'ব্যবহারের স্নিগ্ধতা' সম্বন্ধে তোমাদিগকে দুই একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি মন দিয়া শুন।

ব্যবহারের স্নিগ্ধতা

মানব-চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে মানুষের ব্যবহারের দুইটি দিক আছে; একটি রুক্ষতার দিক আর একটি স্নিগ্ধতার দিক। রুক্ষ অর্থাৎ কর্কশ ব্যবহার তমগুণের বৃত্তি; উহা মানুষের হৃদয়ে তমগুণের বিকাশ করিয়ে দিয়ে জগতে অশান্তির মাত্রা বৃদ্ধি ক'রে থাকে আর স্নিগ্ধ ব্যবহার সত্ত্বগুণের বিকাশের দ্বারা জীবের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে। প্রত্যেক মানবই চান শান্তি; কিন্তু অপরের সহিত ব্যবহারে যখনই তিনি রুক্ষ ব্যবহার করেন, তখনই তিনি ব্যতিব্যস্ত ও মায়াগ্রস্ত হ'য়ে নিজেরও শান্তিটুকু হারিয়ে ফেলেন এবং অপরেরও অপ্রীতির কারণ হন; আর যখন তিনি ব্যবহারের স্নিগ্ধতাটুকু বজায় রাখিতে পারেন, তখন তিনি নিজের ও অপরের স্বাভাবিক শান্তি অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হন। লোকের সহিত ব্যবহারে আমাদিগকে এই স্নিগ্ধতার দিকে—এই শান্তির দিকে—অগ্রসর হ'তে হবে। ব্যবহারের এই রুক্ষতার দিকটা ত্যাগ ক'রে স্নিগ্ধতার দিকে অগ্রসর হওয়া অর্থাৎ সর্ব্বদা লোকের সহিত স্নিগ্ধ ব্যবহার করা সাধক ভক্তের অবলম্বনীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। এই ব্যবহারের স্নিগ্ধতা ভক্ত চরিত্রের একটি মূল্যবান সম্পত্তি। সাধু ও মহতের কৃপায় যিনি চরিত্রের এই স্নিগ্ধতা-রূপ সম্পত্তির অধিকারী হইতে পারিয়াছেন, তাঁহার জীবন মধুময় হইয়া গিয়াছে; তিনি এই অশান্তির জগতে যথার্থই শান্তির সন্ধান পাইয়াছেন; তাই তিনি যে কোন কারণেই হউক্ না কেন একটা অস্বাভাবিক ব্যতিব্যস্ত অবস্থা আনয়ন করিয়া নিজের স্বাভাবিক শান্ত ও অচঞ্চল সাম্যাবস্থা নষ্ট করিতে চান না।

সাধক ভক্ত সকলের সহিত অবশ্যই অতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করিবেন। তিনি এমন কোন ব্যবহার করিবেন না বা এমন একটি কথাও বলিবেন না যাহাতে কাহারও মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট হয়। যদি কোন ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে একটি কথা ক'য়ে অসন্তুষ্ট চিত্তে তাঁর কাছ থেকে চ'লে যান, তবে তিনি নিজেকে তজ্জন্য দোষী মনে করিবেন এবং যতক্ষণ না সেই লোকটিকে আবার সন্তুষ্ট করিতে পারিবেন ততক্ষণ অত্যন্ত ক্ষোভিত থাকিবেন। অপরের প্রতি আমাদের ব্যবহার যদি অতি স্নিগ্ধ হয় এবং যদি উহাতে কোন প্রকার কপটতা না থাকে, তবে অবশ্যই অপরে আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইবে; যেহেতু এই স্নিগ্ধ ব্যবহারই আপামর সর্ব্বসাধারণের চিত্ত আকর্ষণ করিতে সক্ষম। যাহার স্নিগ্ধ এবং মধুর ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট, তিনি 'অজাত-শত্রু'; যিনি অজাত-শত্রু, তাঁহার মধুময় জীবন ধন্য; যেহেতু তিনি কখন কাহারও উদ্বেগের কারণ হন না এবং অন্যপক্ষে তিনিও কাহারও কর্ত্তৃক উদ্বিগ্ন বা উৎপীড়িত হন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই ব্যবহারের স্নিগ্ধতা সত্ত্বগুণের লক্ষণ। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিনটি গুণ মানবমাত্রেরই চরিত্রে লক্ষিত হয়; তবে কাহারও চরিত্রে কোন গুণ বেশী মাত্রায় দেখা যায়, কাহারও বা কম মাত্রায় দেখা যায়। অপরের সহিত ব্যবহারেই এই গুণগুলি আমাদের চরিত্রে প্রকাশ পায়। এখন, এই গুণগুলির স্বাভাবিক ধর্ম্ম এই যে, অপরের সহিত ব্যবহারে আমাদের চরিত্রে যখন যে গুণ প্রকাশ পাইবে অর্থাৎ যে গুণের ক্রিয়া হইবে, আমরা যাহার সহিত ব্যবহার করিব তাহার চরিত্রেও সেই গুণের একটা স্পন্দন জাগিয়া যাইবে। অতএব যদি আমরা কাহারও প্রতি কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করি, তবে আমাদের সেই দুর্ব্ব্যবহারের দ্বারা আমরাই তাহার

হৃদয়ের সুপ্ত তমোগুণের স্পন্দন জাগাইয়া দিলাম। কাজেই এই তমোগুণের স্পন্দন জাগানোর ফলে যদি কোন প্রকার অনর্থপাত হয়—যদি কোন প্রকার বিষময় ফল ফলে—তবে তাহার জন্য আমরাই কি প্রকৃতপক্ষে দায়ী হইব না? দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতির লোক সকল স্বভাবতঃই তমোগুণপ্রধান; তমোগুণের পরিচালনায় সর্ব্বদাই তাহারা চৌর্য্য, হিংসা, প্রাণীবধ প্রভৃতি নানা প্রকার নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ ক'রে থাকে এবং তাহার ফলে তাহাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত লোক সর্ব্বদা উৎপীড়িত, ব্যতিব্যস্ত এবং সশঙ্কিত থাকে। সর্ব্বদাই তাহাদের চরিত্রে তমোগুণের ক্রিয়া হ'তে থাকা বশতঃ তাহাদের হৃদয়ের কোণে লুকান যে সামান্য একটু সত্ত্বগুণ থাকে তাহার উদ্বোধনের অবসর তাহাদের মোটেই হয় না। সত্য, সরলতা, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা প্রভৃতি মানব হৃদয়ের মনোরম বৃত্তিগুলি যে তাহাদের হৃদয়ে একেবারে নাই এমন নয়, কেবল কার্য্যক্ষেত্রে লোকের সহিত সাধু ব্যবহারের অভাবে সেগুলি তাহাদের হৃদয়ে চিরদিনই সুপ্ত হইয়া থাকে, জাগরিত এবং বিকশিত হইবার সুযোগ পায় না। এই সমস্ত দুর্দ্দমনীয় ভীষণ-প্রকৃতি লোককে কি উপায়ে আকৃষ্ট এবং বশীভূত করিতে পারা যায় জান? উহার একমাত্র উপায় তাহাদের হৃদয়ে যে কোন প্রকারে সত্ত্বগুণের একটা স্পন্দন জাগিয়ে দেওয়া। তোমাদের নিজেদের ব্যবহারের স্নিগ্ধতার দ্বারা তাহাদের হৃদয়-নিহিত ঐ সমস্ত সুপ্ত সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলি জাগিয়ে দিতে পারিলে তাহাদের অন্তরের জঘন্য প্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ সংযত এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িবে। তোমরা মনে রাখিও, মানব চরিত্রের একটি গুঢ় রহস্য এই যে, যত বড় দুর্বৃত্ত পাষণ্ডপ্রকৃতি লোক হউক না কেন, সদ্ব্যবহারের স্নিগ্ধতার নিকট সে অবশ্যই সসম্ভ্রমে নত, সংযত এবং প্রশমিত হইবেই হইবে।

প্রশ্ন। তবে কি আপনি বলেন নিতান্ত অসাধুপ্রকৃতি দুর্ব্বৃত্ত লোকদিগের সহিতও আমাদের সদ্ভাব রাখিতে হইবে এবং সর্ব্বদা তাহাদের সহিত মেলা মেশা করিতে হইবে ?

উত্তর। না, আমি এমন কথা বলিতেছিনা যে তোমরা দুরন্তপ্রকৃতি অসাধু লোকদিগের সহিত সর্ব্বদা অবাধে মেলা মেশা করিবে। একটু নিবিষ্টচিত্তে আমার ব্যক্তব্য বিষয়ের ভাবধারা গ্রহণ করিতে চেষ্টা কর। দেখ, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবান্ করুণাময়, তাঁর সৃষ্ট সমস্ত মানবই তাঁর করুণার পাত্র ; সব মানুষই তাঁর নিকট সমান। ভাল বা মন্দ বলিয়া তিনি দুই প্রকারের বিভিন্ন আদর্শের মানব সৃজন করেন নাই ; মানবের ভালত্ব বা মন্দত্ব তাহাদের অন্তর্নিহিত কতকগুলি উন্নত বা অবনত মনোবৃত্তির বিকাশের উপর নির্ভর করে মাত্র। যিনি সজ্জন, তিনি যে কখন মন্দ হইতে পারেন না বা যে ব্যক্তি অসজ্জন, সে যে কখন ভাল হইতে পারিবে না, তার কোন মানে নাই। শ্রীভগবানের সৃষ্টি-বৈচিত্রের নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন মানব দেশ কাল পাত্রানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন গুণময়ী বৃত্তির অধীন হ'য়ে পড়ে। স্থূল রক্ত মাংসের এই শরীরটা প্রায় সকল মানবের একই প্রকার। কেবল যিনি যখন যে সৎ বা অসৎ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত হন, তিনি তখন তদনুযায়ী সাধু বা অসাধু প্রকৃতির লোক বলিয়া বিবেচিত হন। তবেই দেখ, ভাললোক বা মন্দলোক ব'লে মানুষের গায়ে কিছু লেখা থাকে না, সমস্তই মানুষের সৎ বা অসৎ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। তোমাদিগকে যদি কখন কোন সূত্রে কোন অসাধু-প্রকৃতি দুর্ব্বৃত্ত লোকের সহিত মিশিতে হয় অর্থাৎ যদি কোন কারণবশতঃ তাহার সংস্রবে আসিতে হয়, তখন তাহার সহিত ব্যবহারে তোমাদের যেন কোন প্রকার ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব না থাকে এবং তাহাকে হীন বা অস্পৃশ্যজ্ঞানে কোন প্রকার কটূক্তি বা রূঢ় ব্যবহার না করা হয়। সেরূপ স্থলেও যদি

তোমরা তোমাদের ভক্ত-জনোচিত ব্যবহারের এই স্নিগ্ধতাটুকু বজায় রেখে চলিতে পার অর্থাৎ তার সঙ্গে মিষ্ট কথা বল এবং শিষ্ট ব্যবহার কর, তবে দেখিবে তার অমৃতময় ফল ফলিবে। তোমাদের সাধু ও স্নিগ্ধ-ব্যবহারের ফলে সেই অসাধু ব্যক্তির অন্তর্নিহিত পশুপ্রবৃত্তিগুলি ক্রমশঃ প্রশমিত হ'য়ে গিয়ে তাকে প্রকৃত 'মানুষ' গ'ড়ে তুলবে।

এই ব্যবহারের স্নিগ্ধতাই মহাপুরুষগণের চরিত্রের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ; বলিতে কি, এইটিই তাঁহাদের ব্যক্তিত্ব এবং মহত্ত্ব। মানুষকে প্রকৃত 'মানুষ' গড়িয়া তুলিবার যদি কোন উপায় থাকে তবে এই ব্যবহারের স্নিগ্ধতাই তার প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপায়। এক এক জন মহাপুরুষের একদিনের একটি মাত্র স্নিগ্ধ ব্যবহার—একটি মাত্র সুমিষ্ট কথা এমন কি একবার মাত্র সকরুণ চাহনি—কত শত ভীষণ-প্রকৃতি দুর্ব্বৃত্ত মানবের অধোগামী জীবন-স্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত ক'রে দিয়ে তাহাদিগকে উন্নতির পথে—মানবতার এবং মুক্তির পথে—পরিচালিত ক'রে দিয়েছে। জগতের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বেশী দূর যাইতে হইবে না, তোমরা কি নদীয়ার জগাই মাধাইএর কথা শুন নাই? তাহাদের তুল্য পাষণ্ডপ্রকৃতি সুরাসক্ত অত্যাচারী দুর্দ্দান্ত লোক তৎকালে নবদ্বীপে আর কেহ ছিল না; এমন কোন নিন্দিত কর্ম্ম অর্থাৎ নিষিদ্ধ পাপাচরণ নাই যাহা তাহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই; তাহাদের নামোল্লেখ মাত্র তৎকালীন সাধু সজ্জনের হৃদয়ে একটা বিভীষিকা উৎপাদন করিত। এমন যে দুর্দ্দান্ত জগাই মাধাই, পরম দয়াল পতিত-পাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর একদিনের একটিমাত্র স্নিগ্ধ ব্যবহারে ও সকরুণ চাহনিতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহাদেরও কলুষ-কলঙ্কিত জীবনের মোড় ফিরে গিয়েছিল; পরবর্ত্তী জীবনে সেই ভীষণপ্রকৃতি ভ্রাতৃদ্বয় সাধু ও পরম ভক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। বালকোচিত সরলতায়, সুমধুর কথায়

এবং স্নিগ্ধ ব্যবহারে নরঘাতী জল্লাদেরও মন যে করুণায় সিক্ত হইয়া পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, চির-প্রচলিত অনেক গল্পে এরূপ কথা তোমরা অবশ্য শুনিয়া থাকিবে। এই ব্যবহারের স্নিগ্ধতাই মোহান্ধ মানবগণের চোক্ ফুটিয়ে দিয়ে তাহাদিগকে একটা উন্নত মধুময় ও শান্তিময় জীবনের পথ দেখিয়ে দেয়। জগতে সময়ে সময়ে যে সমস্ত অবাঞ্ছিত অশান্তির সৃষ্টি হইয়া জীব জগতকে উৎপীড়িত ও ব্যতিব্যস্ত করে, লোকব্যবহারে এই স্নিগ্ধতার অভাবই তার অন্যতম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। একমাত্র স্নিগ্ধ ও মধুর ব্যবহার দ্বারা জগতের অশান্তির মাত্রা যে কত অধিক পরিমাণে প্রশমিত হইতে পারে এবং জগতের শান্তিবিধানের জন্য উহার যে কত প্রয়োজন, তাহা আমরা অনেক সময় ভাবিয়া দেখিনা। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলীর একটি কীর্ত্তনের পদে আছে,—

"মধুর মধুর কয় গো কথা শ্রবণ মনের ঘুচায় ব্যথা
চাঁদে যেন উগারয়ে সুধা।"

যথার্থই একটি মধুর কথায় মানুষের জ্বালাপোড়াময় প্রাণের ব্যথা জুড়াইয়া দেয়। স্নিগ্ধ-ব্যবহার-প্রাপ্ত ব্যক্তি সদ্ব্যবহারকারী ব্যক্তিকে দেখে মনে করে—আহা, লোকটির কি মিষ্ট কথা! মানুষ এমন হয় গা? মানুষ তো নয়, মানবাকারে দেবতা। সত্যই, এই স্নিগ্ধব্যবহারই মানুষকে দেবতার আসনে বসিয়ে থাকে। শান্ত শিষ্ট ও স্নিগ্ধ আচরণের দ্বারা এমনকি একটি মিষ্ট কথার দ্বারা অপরের প্রাণে কত আনন্দ দেওয়া যায়; কিন্তু এমনি মায়ার ভ্রম! আমরা অপরের সহিত কর্কশ ব্যবহার করিয়া লোকের প্রাণে কত ব্যথা দিয়ে থাকি, এমন কি একটা মিষ্ট কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হই। তাই বলি, তোমরা সাধন পথের পথিক, তোমাদের চলন, বলন, দৃষ্টি, মোটকথা তোমাদের প্রত্যেক আচরণ স্নিগ্ধতা দিয়ে ভিজিয়ে এমন সরস ও কোমল ক'রে রাখিবে যেন তাহা আপামর সর্ব্বসাধারণের

হৃদয়গ্রাহী ও প্রীতিপ্রদ হয় এবং যেন লোকে তোমাদের হ'তে একটা উন্নত আদর্শ পায়। যাক্, এ বিষয়ে আর বেশী বলিবার আবশ্যক নাই; আশা করি তোমরা সর্ব্বদা সকলের সহিত অতি স্নিগ্ধ ব্যবহার করিতে অভ্যাস করিবে এবং উহাকে তোমাদের ভক্তজনোচিত চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট বলিয়া জানিবে।

প্রশ্ন। আপনি যেরূপ সুন্দরভাবে বিষয়টি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন তাহাতে বুঝিলাম—ব্যবহারের স্নিগ্ধতা মানবের পক্ষে, বিশেষতঃ সাধক-জীবনে, অবশ্য অবলম্বনীয়। আশীর্ব্বাদ করুন, লোকের সহিত ব্যবহারের সময় আপনার এই অমূল্য নীতি-কথাগুলি যেন আমাদের মনে থাকে এবং আমরা যেন লোকব্যবহারে একটা সৌজন্য ও স্নিগ্ধতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারি। অতঃপর, সংযমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা আপনার নিকট শুনিতে ইচ্ছা করি, অনুগ্রহপূর্ব্বক তদ্বিষয়ে আমাদিগকে কিছু উপদেশ দিন।

সংযম-নিরোধশক্তি।

দেখ, জীবমাত্রেরই হৃদয়ে স্বাভাবিক নিয়মে কাম ক্রোধাদি এমন কতকগুলি প্রবৃত্তি বর্ত্তমান থাকে, যেগুলির চরিতার্থতা লালসা জীবের পক্ষে বড়ই আপাতঃমনোরম বলিয়া বোধ হয়। ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি অযথা ব্যবহৃত হইলে অর্থাৎ অত্যধিক মাত্রায় সেগুলির প্রশ্রয় দিলে তাহারা ক্রমশঃ এত দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে যে, তাহাদের প্রলোভনে পড়িয়া মানব অতি সহজেই সাধুজন-বিগর্হিত নিষিদ্ধ আচরণ করিয়া ফেলে; তাহার ফলে নানারূপ জাগতিক বিশৃঙ্খলা ও অনিষ্ট সংঘটিত হয়; একারণ ঐ প্রবৃত্তি-গুলিকে মানবের 'রিপু' অর্থাৎ শত্রু বলা হয়; কিন্তু স্বরূপতঃ উহারা

মানবের রিপু বা শত্রু নয়। উহাদের একটা যথাযথ ব্যবহার নির্দ্দিষ্ট আছে; নিয়মিতরূপে ব্যবহৃত হইলে তাহাদের দ্বারা স্বাভাবিক নিয়মের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, জীবের নিজের বা জগতের কোন প্রকার অনিষ্ট হয় না; কেবল অযথা প্রযুক্ত হইলেই তাহারা রিপুর কাজ ক'রে থাকে মাত্র। অতএব যাহাতে ঐ প্রবৃত্তিগুলি যথাযথ ব্যবহারের সীমা অতিক্রম না করে তাহার জন্য মানবমাত্রেরই একটা সংযম বা নিরোধশক্তি অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। বিবেকবুদ্ধির অভাবে পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর-জীবে এই নিরোধশক্তি নাই বলিলেই হয়; তাহারা নিজ নিজ ইচ্ছা-শক্তিকে সংযত করিতে পারে না; কাজেই প্রকৃতির প্রেরণায় তাহাদের মনে যখনই যাহা ইচ্ছা হয়, বিবেচনাশক্তির অভাবে তৎক্ষণাৎ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে যাহারা নিজেদের ইচ্ছাশক্তিকে সঙ্কোচ বা নিরোধ করিতে অসমর্থ, তাহাদিগকে পশুতুল্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা সাধক শ্রেণীভুক্ত তাঁহাদের একটা সংযম বা নিরোধশক্তি থাকা অবশ্যই প্রয়োজন অর্থাৎ ইচ্ছামাত্র যে কোন প্রবৃত্তিকে সংযত করিবার সামর্থ্য থাকা চাই।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের দ্বারা এই নিরোধশক্তি বর্দ্ধিত হয়। অতএব যাঁহারা সাধক শ্রেণীভুক্ত তাঁহাদের পক্ষে নিয়মিতরূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। সংযমী ব্যক্তি সুস্থ শরীরে দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারেন; তাঁহার শরীর, মন এবং ইন্দ্রিয়নিচয় বহুদিন পর্য্যন্ত সুদৃঢ় ও অটুট থাকায় একদিকে যেমন তাঁহার শারীরিক সামর্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে, অন্যদিকে তেমনি সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল গবেষণা করিবার প্রভূত শক্তি জন্মে। ধর্ম্মতত্ত্ব, ভগবৎতত্ত্ব প্রভৃতি সাধক ভক্তের আলোচ্য আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি যে এই স্থূল জগতের বৈষয়িক তত্ত্বগুলি অপেক্ষা অতি

সূক্ষ্ম তত্ত্ব তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সংযম অর্থাৎ যথোপযুক্ত ব্রহ্মচর্য্য পালন ভিন্ন ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে চিন্তা ও গবেষণা করিবার ক্ষমতা জন্মে না; কাজেই সংযমের অভাবে সে সকলের মধুময় ভাব ধারণা ও উপলব্ধি করা যায় না। সাধক-জীবন কত উন্নত চিন্তাশীলতার জীবন, উহার লাভ যে অনেকটা সংযমের উপর নির্ভর করে একথা সহজেই অনুমেয়।

আরও দেখ, সংযমের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপকারিতা এই যে, কিছুদিন ধরিয়া সংযম অভ্যস্ত ও আয়ত্ত হইলে পর, সংযমী ব্যক্তির অন্যায়কে প্রতিরোধ করিবার এমন একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি (ইংরাজীতে যাকে বলে Will force 'উইল ফোর্স্') জন্মে, যাহার প্রভাবে তিনি অনায়াসে দুর্দ্দমনীয় কুপ্রবৃত্তি গুলির প্রলোভন হইতে আপনাকে বাঁচিয়ে চলিতে সক্ষম হন অধিকন্তু নিজের সংযত চরিত্রের সমুজ্জ্বল আদর্শে অপরকেও সৎপথে চালিত করিতে সমর্থ হন। এস্থলে এই কথাটি তোমরা বিশেষ করিয়া মনে রাখিও যে, 'সংযম' বলিতে কেবল ব্রহ্মচর্য্য রক্ষাদি শারীরিক সংযম বুঝায় না, কায়, মন ও বাক্য এ তিনেরই সংযম বুঝিতে হইবে। সাধক ভক্ত সংযম অভ্যাস করিতে গিয়া কায় অর্থাৎ শরীর দ্বারা যেমন কোন নিষিদ্ধ আচরণ করিবেন না, তেমনি মনে মনেও কোন প্রকার মন্দ বিষয়ের চিন্তা বা কুৎসিত কল্পনা করিবেন না এবং এমন একটি বাক্যও প্রয়োগ করিবেন না যাহার দ্বারা কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে; সর্ব্বদা তাঁহাকে এরূপ সতর্কতার সহিত বাক্-সংযত হইতে হইবে।

প্রশ্ন। আপনি সংযমের উপকারিতা সম্বন্ধে যেরূপ সুন্দর ভাবে উপদেশ দিলেন তাহাতে আমরা বুঝিলাম যে, সাধক জীবন লাভ করিতে হইলে সংযম অভ্যাস ও আয়ত্ত করা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের মনে হয় এই সংযম আয়ত্ব করা অতীব দুষ্কর; উহা অভ্যাস করিবার

পক্ষে যদি কোন সহজ উপায় থাকে অনুগ্রহ করিয়া তাহা আমাদিগকে বলুন।

উত্তর। দেখ, সংযমী হওয়া অর্থাৎ সাধকোচিত সংযম বা নিরোধ-শক্তি আয়ত্ত করা যে খুব কঠিন, একথা আমি স্বীকার করি। শাস্ত্রাদিতে নানারূপ শারীরিক ক্রিয়া প্রক্রিয়া দ্বারা সংযম অভ্যাস করিবার উপায় বর্ণিত আছে; কিন্তু সেগুলি অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং বর্ত্তমান কালের দুর্ব্বল জীবের পক্ষে মোটেই অবলম্বনীয় নয়; এই জন্য আমি সেগুলির তত পক্ষপাতী নহি। আমার মনে হয়, সংযম শিক্ষা করিবার অপেক্ষা-কৃত সহজ উপায় এই যে, প্রথমে সহজসাধ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের সংযম অভ্যাস করা অর্থাৎ ছোট ছোট বিষয়ে ইচ্ছাশক্তির নিরোধ দ্বারা প্রবৃত্তির বেগ সহ্য করিতে শেখা; কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে ক্রমে আপনা হইতেই অপেক্ষাকৃত বড় বড় লোভনীয় বিষয়েও সংযম অভ্যাস ও আয়ত্ত হইয়া যাইবে। সে কিরূপ জান? মনে কর, কোন একটি সুস্বাদু খাদ্য দ্রব্য—যেমন সুমিষ্ট আম বা সন্দেশ—খাইবার জন্য তোমার মনে একটা প্রবল ইচ্ছা হইতেছে, তুমি কিছুতেই সেই আম বা সন্দেশ খাইবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতেছ না; তখনই মনে করিতে হইবে যে, এ জিনিষটি আজ খাবনা; যেমন মনে করা অমনি দৃঢ় সঙ্কল্প করা—খাবনা তো খাবই না; ঐরূপ অমুক কাজটা ক'রবনা তো কিছুতেই ক'রব না, অমুক স্থানে যাবনা তো যাবই না—এইরূপ একটা প্রবল জেদ আনা চাই। এইরূপ অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা সাধু গুরু ও আচার্য্য-গণের সদুপদেশগুলি এবং তাঁহাদের নিষেধবাক্যগুলি মনে রাখিয়া উচ্ছৃঙ্খল ও অসংযমী ব্যক্তির দারুণ পরিণাম ফলের কথা চিন্তা করাও আবশ্যক। এইরূপে ছোট ছোট বিষয়ে সংযম আয়ত্ত হ'লে পর ক্রমশঃ এরূপ অভ্যাস হ'য়ে যাবে যে তোমাদের সঙ্কল্প কিছুতেই টলিবে না এবং

প্রলোভন যত বড়ই হউক্ না কেন, এবং তাহার আকর্ষণ যতই প্রবল হউক্ না, তোমরা অনায়াসে তাহাকে প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে। পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি সংযমের দ্বারা ক্রমশঃ এইরূপ একটা প্রবল ইচ্ছাশক্তি বা নিরোধশক্তির প্রবণতা জন্মে অর্থাৎ মনের জোর এত বাড়ে যে সহজে একটা কুপ্রবৃত্তির বশীভূত হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

এই যে নিরোধশক্তি অর্থাৎ মনের জোরের কথা বলিলাম, জেনে রেখো, এ শক্তি আমাদের আগন্তুক নয়; স্বাভাবিক নিয়মে এ শক্তি আমাদিগকে দেওয়াই আছে; তবে অবনত প্রবৃত্তিগুলির অবাধ প্রশ্রয় দিলে আমাদের সেই শক্তি অপব্যয়িত হয়, ফলে আমরা দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ি মাত্র। সংযম অভ্যাস দ্বারা সেই নিরোধশক্তি লাভ করা আমাদের সেই হারান জিনিষটির পুনঃপ্রাপ্তি মাত্র।

পরিশেষে আমার ব্যক্তব্য এই যে, কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তিগুলি অবশ্য জীবের দেহধর্ম্ম; যতদিন দেহ আছে ততদিন ঐ গুলির সংস্কার একেবারে যায় না, থাকিবেই থাকিবে; তবে অনবরত চেষ্টা ও অভ্যাসের দ্বারা এবং সাধু মহতের সঙ্গগুণে ও তাঁহাদের সদুপদেশে ক্রমশঃ পরমার্থ-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় উন্নত সংস্কারের আবির্ভাবে ঐ গুলি অনেক পরিমাণে সংযত হইয়া যায় এবং ঐ প্রবৃত্তিগুলির:মারাত্মকতা নষ্ট হওয়ায় সহসা উহারা আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না। তাই বলি কায়মনোবাক্যে সংযম অভ্যাস সাধন পথে অগ্রসর হইবার পক্ষে সমূহ সহায়তা করে। অসংযমী ব্যক্তি কোন দিনই সাধন পথে অগ্রসর হইতে পারে না। অতএব তোমরা নিজ নিজ চরিত্রে এই সংযম অর্থাৎ নিরোধশক্তি যথাসাধ্য অভ্যাস ও আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিবে। আর এ কথাটিও তোমরা মনে রাখিও যে ঐ সমস্ত প্রবৃত্তি মায়ার আবরিকা শক্তির বৃত্তি, উহারা সর্ব্বদাই মানবের মনের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারিতেছে; স্থান ও কালের সুযোগ

সুবিধা পাইলেই উহারা মানবের জ্ঞানাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে। অতএব যে সময়ে যে স্থানে যাহাদের সঙ্গে থাকিলে অসৎ প্রলোভনের আকর্ষণে তোমাদের পদস্খলনের সম্ভাবনা, তৎক্ষণাৎ সে স্থান ও সে সঙ্গ ত্যাগ করিয়া যত শিঘ্র পার সৎসঙ্গের গণ্ডীর মধ্যে আসিয়া সৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করিবে এবং শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে যেন তিনি তোমাদিগকে অসৎ প্রলোভনের হাত হইতে রক্ষা করেন।

বৈরাগ্য।

প্রশ্ন। **বৈরাগ্য** বলিতে সাধারণ লোকের ধারণা এই যে, সংসার অর্থাৎ গৃহ, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি ছাড়িয়া বনে গিয়া তপস্যা করাকেই বৈরাগ্য বলে। সত্যই কি সংসার ছেড়ে বনে গিয়ে শ্রীভগবানের সাধন-ভজন করাকেই বৈরাগ্য বলে? এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর। দেখ, তোমরা যথার্থই বলিয়াছ; 'বৈরাগ্য' বলিতে সাধারণ লোকে ঐ প্রকারই বুঝিয়া থাকে; তাহাদের ধারণা শ্রীভগবান্‌কে সাধনা করিতে হইলে গৃহে থাকিয়া হয় না, সংসার ছাড়িয়া বনে গিয়া সাধনা করিতে হয়। দেখ, গৃহই বল, আর বনই বল, সবই মনকে লইয়া, অবস্থা বিশেষে গৃহও 'বন' হইতে পারে, আবার বনও 'গৃহ' হইতে পারে। জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ 'বৈরাগ্য' বলিতে গৃহ সংসার ছাড়িয়া যে বনে যাইতে হইবে এরূপ কথা বলেন না। বৈরাগ্য অর্থে তাঁহারা যেমন বুঝেন তাহাই তোমাদিগকে বলিতেছি শুন।

যাঁহারা সাধক শ্রেণী ভুক্ত হইতে চান, যথাসাধ্য বৈরাগ্য অবলম্বন তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজন; যেহেতু বৈষয়িক ভোগবাসনা ও সঞ্চয়-বাসনা যতটা পরিমাণে কমিয়া যাইবে, ততটা পরিমাণে সাধক আধ্যাত্মিক পথে—ভক্তিপথে—অগ্রসর হইতে পারিবেন। মনে যদি সঞ্চয় বাসনা এবং

ভোগবাসনা বলবতী থাকে তবে বৈরাগ্য অবলম্বনের চেষ্টা ব্যর্থপ্রয়াস মাত্র। দেখ, এই সংসারে মায়ার মোহে পড়িয়া আমরা কতকগুলি অস্বাভাবিক অভাবের সৃষ্টি ক'রে থাকি ; সেগুলি না পাইলেও আমাদের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের পক্ষে কোন প্রকার অসুবিধা হয় না। সেই অস্বাভাবিক অভাব গুলি সরিয়ে দিয়ে, যে সমস্ত সাদাসিদে দান শ্রীভগবান্ আমাদিগকে দিয়াছেন, সেইগুলি লইয়াই সন্তুষ্ট থাকা যায় ; কাজেই প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু বিষয় লাভ করিবার কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা রাখা উচিত নয় ; সেরূপ আকাঙ্ক্ষা যখনই মনে উদয় হইবে, তখনই তাহা নিবারণের জন্য সংযম অভ্যাস করা বিশেষ প্রয়োজন। কিরূপে সংযম অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ইতঃপূর্ব্বেই তোমাদিগকে তো বলিয়াছি যে, এ কাজটি করিব না তো কিছুতেই করিব না, অমুক জিনিষটি খাইব না তো কিছুতেই খাইব না, কোন অসৎ প্রসঙ্গ শুনিব না তো কিছুতেই শুনিব না, এইরূপ। মোট কথা, সাদাসিদে চাল চলন এবং সকলের সহিত সহজ সরল ও অকপট ব্যবহার অর্থাৎ সাদা মন—সরল প্রাণের সহজ কথা—আর তার সঙ্গে একটু সংযম অভ্যাস, এই হ'লেই হ'ল ; তা হ'লেই তুমি গৃহী হ'য়েও সন্ন্যাসীর পুজ্য ; সংসারে বিরক্ত হ'য়ে বনে যাইবারও দরকার নাই, আর জটা, বাকল, গেরুয়া, চিম্‌টেরও প্রয়োজন নাই; এই হ'লেই তোমাদের বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য সফল হইবে। এ বিষয়ে এই কথাটি তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিও যে, প্রকৃতির অনুমোদিত সাদাসিদে চাল চলন, অশন বসন, যাহা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে দিয়াছেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা, প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তু বিষয় লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা না রাখা এবং প্রবৃত্তির দ্বারা যথেচ্ছ পরিচালিত না হইয়া যথারীতি সংযমী হওয়া—এই গুলির নামান্তরই 'বৈরাগ্য' অবলম্বন।

আরও দেখ, এই সংসারই সাধনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র ; এখানে থেকেই

অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি বিষয়ের মধ্যে থেকেই ঐ প্রবৃত্তিগুলিকে জয় করিতে হইবে; সংসার-রূপ কলেজ থেকে পাশ ক'রে 'সার্টিফিকেট্' লইতে হইবে; নচেৎ ক্ষণিক উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে বনে যাওয়ায় কোন ফল হয় না। যাঁহারা কোনরূপ উত্তেজনার বশে হটাৎ সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসী সেজে চ'লে যান, কালে তাঁহারা বৈরাগ্য-ধর্ম্ম বজায় রাখিতে পারেন না; শেষে হয়তো একটা 'ভ্যাগাবণ্ড' সেজে বসেন; ফলে তাঁহাদের এদিক ওদিক দুদিকই নষ্ট হইয়া যায়। একজন ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণব মহাজন বলিয়া গিয়াছেন—"কৃষ্ণ ভজিবার তরে 'সংসারে' আইনু"। বাস্তবিক, বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মহাত্মাগণ বলেন—এই সংসারই মানবের প্রশস্ত সাধন-ক্ষেত্র; নতুবা ঐরূপ কথা অর্থাৎ 'সংসারে আইনু'—বলিবার প্রয়োজন ছিল না।

সাধকের আচরণ প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—"যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু"; কাজেই দেখ, সাধন পথে তীব্র বৈরাগ্য এক প্রকার নিষেধই করা হইয়াছে। অতএব সমর্থ ত্যাগকেই বৈরাগ্য ব'লে বুঝিতে হইবে। যাঁরা সংসারে থেকে কাম ক্রোধাদির সহিত দ্বন্দ্ব ক'রে জয়ী হ'তে না পেরে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেন এবং একটা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে সংসার ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী সেজে বসেন, তাঁহাদের বৈরাগ্য প্রশংসনীয় নয়। আরও এক কথা, সংসার ছেড়ে মানুষ যাবেই বা কোথায়? সংসার ছেড়ে মানুষের কোথায়ও তো যাইবার উপায় নাই; অথচ কেন যে লোকে 'সংসার ত্যাগ ক'রে চলে যাব' বলে, তা বুঝিতে পারি না। বরং সংসারে থেকে একটু সংযমী হ'য়ে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ করিলে সাধকের সাধন পথে কোন বিঘ্ন আসে না এবং সাধনও নষ্ট হয় না। দেহ রক্ষার জন্য মানুষকে অবশ্যই দুমুঠো উদরান্নের সংস্থান করিতেই হইবে; সংসারী ব্যক্তির পক্ষে কোন কোন বিষয়ে সাধনের প্রতিকূলতা থাকিলেও

এ বিষয়ে সংসার অনেকটা অনুকূল বলা যেতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে এরূপ দেখা যায়, গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী বা বৈরাগীগণনিজেদের উদরান্ন সংগ্রহের চেষ্টায় দৈনন্দিন জীবনের অনেকটা সময় বৃথা অতিবাহিত ক'রে' থাকেন; কাজেই তাহাতে যে তাঁদের সাধন ভজনের অনেক ব্যাঘাত জন্মে একথা সহজেই অনুমেয়।

ভক্তি গ্রন্থে ভক্তের প্রার্থনা সূচক কীর্ত্তনের পদে আমরা দেখিতে পাই যে, ভক্ত সাধক নিজের মনোভিলাষ জ্ঞাপন করিয়া বলিতেছেন,—

"করঙ্গ কৌপীন লঞা ছেঁড়া কাঁথা গায়ে দিয়া
তেয়াগিয়া সকল বিষয়।
কৃষ্ণে অনুরাগ হবে ব্রজের নিকুঞ্জে কবে
যাইয়া করিব নিজালয়॥"

এই যে বিষয় সংসার ত্যাগের কথা—এ অনেক উপরের কথা; সে উচ্চ অবস্থা আসিলে আপনিই সংসার ত্যাগ হ'য়ে যায়। কিন্তু অনেকের সে উচ্চ অবস্থা এল না—নিজ চরিত্রের ভিতরে অনেক গলদ রহিল—অথচ সেই অবস্থাতেই সামান্য উত্তেজনার বশে গৃহ-সংসার ত্যাগ ক'রে সংসারীরই ভার স্বরূপ হ'য়ে একটা 'ভ্যাগাবণ্ড' সেজে বসিল। তাই বলি, তোমরা সংসারে জন্মেছ, সংসারী সেজেছ; অত্যধিক ভোগাসক্তি না রাখিয়া নির্লিপ্ত ভাবে যথাযোগ্য বিষয় ভোগ কর এবং সংসারে থাকিয়াই সংসারকে জয় করিতে শেখ অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়গুলি এমন নির্লিপ্ত ভাবে ভোগ করিতে অভ্যাস কর যে, প্রয়োজন হইলে যে কোন সময় বা অবস্থায় সংসারের ভোগসুখ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। এ বিষয়ে বৈরাগ্যের সমুজ্জ্বল আদর্শ ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল রঘুনাথ দাসের প্রথম জীবনে তাঁহার প্রতি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখের

আদেশই তোমাদের পক্ষে সর্ব্বদা স্মরণীয় এবং তদনুরূপ আচরণই তোমাদের সর্ব্বথা অবলম্বনীয় ; যথা,—

"মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া।
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

'বৈরাগ্য' বলিতে এর বেশী আর কিছু তোমাদের জানিবার বা বুঝিবার প্রয়োজন নাই।

বৈরাগ্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এইবার সাধকের সত্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি মনোযোগ দিয়া শুন।

সত্যনিষ্ঠা।

'সত্য' সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে যে সমস্ত কথা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে* সেগুলি অবশ্য তোমাদের খুব স্থিরচিত্তে ভাবিয়া দেখিবার বিষয়। প্রসঙ্গ ক্রমে এস আমরা সাধকোচিত সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে আরও কিছু আলোচনা করি। দেখ, শ্রীভগবান্ সত্যস্বরূপ এবং সত্যসঙ্কল্প ; সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকেও সর্ব্বতোভাবে সত্যনিষ্ঠ হইতে হইবে অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে সর্ব্বদা সত্যাচরণ করিতে হইবে। যাহা সত্য তাহা অবশ্য নিত্য ; সত্য বস্তুর নিয়ত-বর্ত্তমানতা স্বতঃসিদ্ধ অর্থাৎ সত্য বস্তুর অস্তিত্বের কখন অভাব হয় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই যে,—যাহা আছে, তাহা চিরকালই আছে এবং থাকিবে এবং যাহা নাই, তাহা কোন দিনই ছিল না এবং পরেও থাকিবে না। এখন দেখ,

* শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত ১ম খণ্ডে দ্রষ্টব্য।

'শ্রীভগবান্ আছেন'—একথা সর্ব্ববাদীসম্মত সত্য এবং এই সত্য শাস্ত্র ও মহদনুভব দ্বারা স্বীকৃত এবং জগতের প্রায় সমস্ত মানবই এই সত্যে সুদৃঢ় আস্থাবান ; যেহেতু এই জগতের সৃষ্টি-বৈচিত্র দেখিয়া প্রত্যেক মানবেরই অন্তরাত্মা একথা বলিতে বাধ্য হয় যে, এই সৃষ্টি-রহস্যের অন্তরালে অবশ্যই এমন একজন নিয়ামক সৃষ্টিকর্ত্তা বর্ত্তমান আছেন যাঁহার ইচ্ছায় এই জীব-জগৎ নিয়মিত ভাবে পরিচালিত হইতেছে। ইহা আপাততঃ আনুমানিক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও ইহার মূলে যে একটা অভ্রান্ত সত্য বিদ্যমান, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাহাই যদি হইল, তবে সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্‌কে আমরা উপলব্ধি করিতে পারি না কেন? এর কারণ কি? মনস্তত্ত্ববিদ্ মনীষী মহাপুরুষগণ —যাঁহারা এই সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়টি লইয়া ক্রমাগত চর্চ্চা ও অনুশীলন করিয়াছেন—তাঁহারা তাঁহাদের সুগভীর চিন্তা ও গবেষণা দ্বারা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে সমভূমিত্ব-প্রাপ্তি ব্যতিরেকে আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ববস্তু উপলব্ধি করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব 'সত্য' বস্তুটিকে ধারণার বিষয়ীভূত করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই সত্যানুষ্ঠানের ভিত্তিভূমিতে দাঁড়াইতে হইবে। যেমন মনে কর, 'প্রেম' একটি সত্য বস্তু ; এখন, এই প্রেম বস্তুটি যে কি, তাহা উপলব্ধি করিতে হইলে আমাদিগকে অবশ্যই 'প্রেমিক' হইতে হইবে ; ঐরূপ, 'করুণা' একটি সত্য বস্তু : এই করুণা জিনিষটি যে কি, তাহা অনুভব করিতে হইলে আমাদিগকে 'করুণ-হৃদয়' অর্থাৎ পরদুঃখকাতর হইতে হইবে ; নতুবা মিথ্যাচরণের দ্বারা কদাচ সত্য বস্তুর, স্বার্থপরতা অর্থাৎ আত্মতৃপ্তিপরায়ণতার দ্বারা প্রেমের এবং সহানুভূতিবিহীন নিষ্ঠুরতার দ্বারা কদাচ করুণার উপলব্ধি করা যাইবে না। সত্য, প্রেম, করুণা এইগুলি যে কি বস্তু, তাহা কোন

কালে বুঝিতে পারা যাইবে না যতদিন না এইগুলির একটা অনুষ্ঠানের ভিত্তিভূমিতে (ইংরাজীতে যাকে বলে Practical field) দাঁড়াইতে পারা যাইবে। কেবল পুঁথিগত বিদ্যার মত এই সত্য বস্তুগুলি কানে শুনে জেনে রাখা এক, আর কার্য্যতঃ নিজ অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি দ্বারা এগুলির যথার্থ স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আর এক ; এ দুয়ের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ।

ভক্তি শাস্ত্র বলিয়াছেন,—'আদৌ শ্রদ্ধা' ; কিন্তু দেখ, যাহা সত্য তাহাই শ্রদ্ধার বিষয় ; যেহেতু মিথ্যাতে স্বভাবতঃই কোন শ্রদ্ধা আসিতে পারে না। অতএব সর্ব্বাগ্রে এই 'সত্য'কেই শ্রদ্ধার বিষয়ীভূত-রূপে অবলম্বন করিতে হইবে। আর 'সত্য' বস্তুটি যে আধ্যাত্মিকতার প্রথম ভিত্তি, সেটা আমার কথা নয়—সর্ব্বোত্তম ভক্তিশাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতেরই কথা ; শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব প্রথমেই বলিয়াছেন—"সত্যং পরং ধীমহি।" অর্থাৎ 'সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি'।

এখন, এই সত্যের প্রকাশস্থল বাক্য ; অর্থাৎ সত্য প্রথমতঃ বাক্য দ্বারাই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন। কাজেই সত্যাচরণের প্রথম সোপানে সাধককে বাক্-সংযত হইতে হইবে। কথায় এবং কাজে সমতা রক্ষা করা সত্যাচরণের প্রকৃষ্ট উপায় ; এবং সেই সমতা রক্ষা করিতে হইলে বাক্য-কথনের একটা সংযম থাকা চাই। যাঁহারা সাধক শ্রেণীভুক্ত, তাঁহারা কতকগুলি অযথা ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলিবেন না। যেহেতু বেশী কথা বলিতে গেলেই অনেক নিরর্থক ও অবান্তর কথা এসে পড়ে। যাঁহাদের বাক্যের একটা সংযম নাই, বেশী বাজে কথা বলা যাঁহাদের অভ্যাস তাঁহারা যে অনেক সময় তাঁহাদের কথানুযায়ী কার্য্যের সামঞ্জস্য বজায় রাখিতে পারেন না একথা সহজেই অনুমেয়। অতএব সত্যনিষ্ঠ সাধক যে অবশ্যই বাক্-সংযমী হইবেন এবং খুব

ভাবিয়া চিন্তিয়া কথা বলিবেন একথা বলাই বাহুল্য। কথা বলিবার সময় তাঁহাকে আরও একটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে যে, তাঁর কথা যেন সত্য, প্রিয় এবং হৃদয়গ্রাহী হয়। অপ্রিয় সত্য কথা দ্বারা মানুষের প্রাণে ব্যথা দেওয়া হয় বলিয়া সেরূপ কথা না বলিবার রীতি আছে,—"মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্"; বিশেষ ক্ষতি না হইলে অপ্রিয় সত্যকথা না বলিয়া সেরূপক্ষেত্রে মৌনাবলম্বনই শ্রেয়ঃ।

সত্য কথনের আর এক আশ্চর্য্য প্রভাব এই যে, ইহাতে মানুষের মনের বল খুব বাড়ে। বলিতে কি, যদি তোমরা অন্ততঃ এক সপ্তাহ কাল নিখুঁত অর্থাৎ খাঁটি খাঁটি সত্য কথা (ইংরাজীতে যাকে বলে Spotless truth) বলিতে সক্ষম হও, তবে পর সপ্তাহে সত্যকথা বলিবার জন্য যে তোমাদের দ্বিগুণ উৎসাহ বাড়িবে, একথা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি; আর এটি তোমরা নিজে নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। তাই বলি, যদি তোমরা সুদৃঢ় ভাবে সত্যকে অবলম্বন কর অর্থাৎ দৃঢ় সঙ্কল্পের সহিত সত্যপথে চলিতে অভ্যাস কর, তবে তাহাতে ভয়ের কোন কারণ নাই; যেহেতু তোমরা যাহা অবলম্বন করিবে সেই 'সত্য'ই যে শ্রীভগবানের স্বরূপ। সত্যস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবানকে অবলম্বন করিতে যাইয়া যদি অন্য কাহারও বা কিছুরও ভয় কর, তবে সেটা কি তোমাদের ভ্রান্তি বা অজ্ঞানতা নয়? 'সত্য'ই ঈশ্বরের স্বরূপ—এ দৃঢ় বিশ্বাস যাঁর আছে তিনি তো বিশ্বজয়ী; যত বড় বিরোধী শক্তিই আসুক না কেন, সত্যাশ্রয়ীর নিকট তাহাকে অবনত মস্তকে বশীভূত হইতেই হইবে।

আবার দেখ, সত্যের সহিত ত্যাগের একটা খুব ঘনিষ্ট সম্বন্ধ র'য়েছে। সত্যের পথে চলিতে পারে কে? না, ত্যাগের রাস্তা ধ'রে ফেলেছে যে।

আমরা মিথ্যা বলি তখনই যখনই আমাদের স্বার্থে ব্যাঘাত জন্মে ; নতুবা আমাদের আত্মা স্বভাবতঃ সত্যকেই ভালবাসে এবং সত্যই বলিতে চায়। এই যে ত্যাগের কথা বলা হইল, এই ত্যাগ আবার দুই রকমের হ'য়ে থাকে ; দানাদি সংকার্য্য অবশ্য পরার্থে ত্যাগমূলক বটে, তবে সেগুলি ত্যাগের একাংশ মাত্র। ত্যাগের আরও একটা দিক আছে ; যেমন, একটা মিথ্যা কথা বলিলে কিছু অর্থাগম হয়, কিন্তু বলিব না; এই যে অন্যায় উপায় দ্বারা অর্থ প্রাপ্তির লালসা পরিত্যাগ, এটাও একরূপ ত্যাগ। মিথ্যাবাদীর অন্যায়োপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা পরোপকারাদি সংকার্য্য করিতে যাওয়া প্রশংসনীয় নয়। যদি বল, সত্যের পথে চলিতে গেলে প্রথম প্রথম বড় কষ্ট পেতে হবে, কেন না এ পথে অনেক ক্ষতি স্বীকার কর'তেই হবে। কিন্তু এই ক্ষতি সম্বন্ধে বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, সত্য পথে থেকে—ন্যায় পথে থেকে—যে টুকু অর্থাগম হয়, সেই টুকুই জীবের ন্যায্য প্রাপ্য, তাতেই তাহার জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে লাভ হইতে পারে। মিথ্যা প্রবঞ্চনাদি অন্যায় উপায় দ্বারা তদতিরিক্ত অর্থাগম লালসার পরিত্যাগকে ঠিক ঠিক ক্ষতি বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু সেটাতো মানবের ন্যায্য প্রাপ্য নয়। আরও দেখ, যারা মিথ্যা কথা বলে, চুরি বাটপাড়ী করে, তারাই কি খুব সুখে শান্তিতে কাল কাটাচ্ছে? তারাও তো কত কষ্ট পাচ্ছে। তবে ক্ষতি স্বীকার ক'রতে হবে ব'লে, কষ্ট পেতে হবে ব'লে সত্যের পথ ছাড়িতে চাও কেন? আর এটাও তো একটা ভাবিয়া দেখিবার বিষয় যে, মানুষকে একদিন না একদিন যখন এই ত্যাগের রাস্তা ধরিতেই হইবে, তবে সত্যের পথে—ধর্ম্মের পথে—চলিতে এত ইতস্ততা করিবার দরকার কি? আরও দেখ, জগতে ত্যাগস্বীকার দ্বারা কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হয় নাই? যে সমস্ত আদর্শ মহদনুষ্ঠান মানবকে উন্নতির পথে অগ্রগামী

ক'রে দেয়, একমাত্র সত্যই তাহার প্রথম অবলম্বন। আবহমানকাল হইতে জগতের ইতিহাসে যে সমস্ত সমুন্নত আদর্শের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই সত্যের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। পরম কারুণিক ঈশ্বরই যখন নিরুপায় এবং অসহায় জীবের একমাত্র অবলম্বন, আর সত্যই যখন সেই ঈশ্বরের স্বরূপ, তখন সত্যপথে চলা ভিন্ন জীবের আর অন্য উপায় নাই; বলিতে কি, তাঁকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে পাইতে হইলে, তাঁহাকে অনুভব করিতে হইলে, জীবকে অবশ্যই একদিন এই সত্যের পথে—এই ন্যায়ের পথে—চলিতে হইবে।

প্রশ্ন। সত্যাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আপনি আমাদিগকে যেরূপ বিশদ ভাবে বুঝাইয়া দিলেন তাহাতে আমাদের মনে হয়, কেবল 'ত্যাগ' কেন, মানবের অন্যান্য সদ্‌গুণগুলিও এই সত্যের সঙ্গে জড়িত রহিয়াছে; এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উত্তর। তোমরা যথার্থই বলিয়াছ; সত্যের সহিত ত্যাগের যেমন অতি নিকট সম্বন্ধ, সেইরূপ সরলতা, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবোচিত সমস্ত সদ্‌গুণগুলিরও সত্যের সহিত ওতপ্রোত সম্বন্ধ রহিয়াছে মনে করিয়া দেখ, সত্যের পথে না চলিলে মানব কোনদিনই সরলান্তঃকরণ হইতে পারে না; মিথ্যাচারীর সরলতাপ্রদর্শন এক প্রকার ভান মাত্র। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, মহাত্মা যিশুখৃষ্ট প্রভৃতি জগত-পাবন মহাপুরুষগণের যে অপরিমেয় ও অলৌকিক সহিষ্ণুতা ও ক্ষমার কথা ইতঃপূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ, তাহারও মূলে একমাত্র এই সত্যেরই সুদৃঢ় অবলম্বন ছিল। এই সত্যেরই অজেয় শক্তি এই নশ্বর জগতে তাঁহাদিগকে অমর এবং অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়াছে।

সত্যকথনের আর এক মহৎ উপকার এই যে, ইহার দ্বারা মানব-চরিত্রের যাবতীয় দোষেরই নিবৃত্তি হইতে পারে; বলিতেকি, এই

সত্যকেই মানবচরিত্রের দোষ-সংশোধক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মনে কর, যে ব্যক্তি চোর, সে কিছুতেই চুরি করিতে পারিবে না, যদি সে মনে করে যে তাহাকে সত্য কথা বলিতে হইবে। এইরূপে মানব-হৃদয়-নিহিত যাবতীয় নিষিদ্ধ আচরণের প্রবৃত্তি আপনা হইতেই প্রশমিত হইয়া যাইতে পারে যদি মানব একমাত্র সত্যকথা বলিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হয়। তবেই দেখ, যে সমস্ত জটিলতা, কুটিলতা ও স্বার্থপরতা হইতে মানবচরিত্রের হীনতা সূচক এই মিথ্যার উৎপত্তি হয়, সত্যপথ আশ্রয় করিলে সেগুলি মানুষের হৃদয় হইতে আপনা হ'তেই চ'লে যেতে বাধ্য হয়; তখন আর তাহাদিগকে হৃদয় হ'তে সরিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় না। বলিতেকি, 'সত্য' সমুজ্জ্বল আলোকের মত স্বপ্রকাশশীল নিত্য বস্তু; যদি একবার ভগবৎকৃপায় সেই সত্যের আলোক মানুষের হৃদয়ে জ্বলিয়া উঠে, তবে তাহার সুবিমল জ্যোতিঃতে মানবের সমস্থ হৃদয়টা সমকালে আলোকিত হইয়া যায়; ফলে, সব অন্ধকার—সব অজ্ঞানতা—সমস্ত অপবিত্রতা—সম্যক বিদূরিত হইয়া যায়। তখন সেই পবিত্র হৃদয়ে সরলতা, দয়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি মানবোচিত উন্নত বৃত্তিগুলি স্বতঃই প্রকাশ পায়। তবেই দেখ, একমাত্র সত্যই মানবকে দেবভাবে বিভাবিত করিয়া দিতে সক্ষম। একমাত্র সত্যেরই এতদূর প্রভাব যে যদি সমকালে সমস্ত লোক এই সত্যকে দৃঢ়রূপে অবলম্বন করে, তবে এক মুহূর্ত্তে একটা যুগ পরিবর্ত্তন হ'য়ে যেতে পারে। জগতের সমস্ত অশান্তি, দুঃখ, হাহাকার চ'লে গিয়ে আবার শান্তির ও আনন্দের যুগ ফিরে আসে; অর্থাৎ যে শান্তি—যে আনন্দ—জীবের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্যবস্তু, সত্যাশ্রয় করিলেই মানব অনায়াসে তাহা নিজের করতলগত করিতে পারে। অতএব একমাত্র সত্যই মানবকে মনুষ্যত্বের পথে—নীতি ও ধর্ম্মের পথে—এগিয়ে দিয়ে মানবের মুক্তির পথ—ভক্তি ও প্রেমের পথ—দেখিয়ে দেয়।

পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি যে শ্রীভগবান্ সত্যস্বরূপ, সত্যের উপাদানে তাঁর শরীর গড়া,—(ইংরাজীতে বলিলে বলিতে হয়—An Embodiment of Truth) ; কাজেই, যখনই তুমি একটি মিথ্যা কথা বলিবে, তখনই তোমার সেই মিথ্যাচরণের দ্বারা তুমিই তোমার উপাস্য প্রভুর শ্রীঅঙ্গে আঘাত করিবে। অতএব সাধকের পক্ষে গল্পচ্ছলে এমনকি পরিহাসচ্ছলেও মিথ্যাকথার অবতারণা করা উচিত নয় ; তাহাতেও সাধক ভক্তের নির্ম্মল চরিত্রে একটা কলঙ্কের দাগ পড়ে। তাই বলি, তোমরা প্রত্যহ প্রাতঃকালে নিদ্রাভঙ্গের পরই নিজ নিজ ইষ্ট-দেবতাকে স্মরণ ক'রে কিছুক্ষণ তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে বলিবে—"প্রভু ! তোমার কৃপায় আজ যেন আমি কায়মনোবাক্যে সত্যাচরণ করিতে পারি, যেন কোন মিথ্যাকথা ব'লে তোমার শ্রীঅঙ্গে আঘাত না করি, তোমার সেবক হ'য়ে যেন এরূপ অকৃতজ্ঞ না হই। তুমি আমাকে যে কোনরূপ মিথ্যাচরণ হইতে রক্ষা করিও।"

বর্ত্তমানে মানবের দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে যে মিথ্যার স্রোত জগতে চারিদিকে অপ্রতিহতগতিতে প্রবাহিত হইতেছে এবং যার ফলে মানবের এতদূর নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটিয়াছে, একমাত্র সত্যকে অবলম্বন করা ভিন্ন মানবের এই অধোগামী জীবনস্রোতের গতি পরিবর্ত্তিত হইবার উপায়ান্তর নাই। মায়ার মোহে পড়িয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট মানব কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছে না যে, এই মিথ্যাকথন—এই মিথ্যাচরণই—তাহার জীবনের শান্তি ও আনন্দকে নষ্ট করিয়া দিতেছে ; অতএব তোমরা যদি সেই সত্যস্বরূপ শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিলাভ করিয়া পবিত্র শান্তি ও আনন্দ-লাভ করিতে চাও তবে সর্ব্বান্তঃকরণে সত্যনিষ্ঠ হও এবং সত্যপথে চলিবার জন্য অদ্য হইতেই কৃত-সঙ্কল্প হও ; তাহা হইলে অবশ্যই তোমরা তাঁর কৃপায় তাঁর আনন্দসত্তাকে উপলব্ধি করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে

পারিবে। এই সত্যনিষ্ঠাই সাধকজীবনের অবলম্বনীয় একটি শ্রেষ্ঠ এবং অমূল্য সম্পদ্।

সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা আলোচিত হইল, আশাকরি, সেগুলি তোমরা সর্ব্বদা মনে রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিবে। অতঃপর এস আমরা সাধকের 'ইষ্টনিষ্ঠা ও ঈশ্বরাভিনিবেশ' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

ইষ্টনিষ্ঠা ও ঈশ্বরাভিনিবেশ।

সাধনপথে নিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে অনেক কথা তোমাদিগকে বলা হইয়াছে।* ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তি প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আরও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাউক্। দেখ, মানবের যাবতীয় জ্ঞানালোচনা, যাবতীয় অনুশীলন এবং অনুষ্ঠান মূলতঃ সবেরই উদ্দেশ্য শ্রীভগবান্-লাভ; তাই মহাপুরুষগণ স্বীকার করেন— 'জ্ঞানমাত্রই ঈশ্বর-পর'। মনে রাখ, জীবের একমাত্র লক্ষ্যবস্তু ঈশ্বর; সমস্ত জীবই তাদের যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ সেই লক্ষ্য-বস্তুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। তবে এটি তোমরা জানিয়া রাখিও যে জীবের নিকট তাঁর স্বরূপ প্রকাশ অবশ্যই তাঁর কৃপাসাপেক্ষ। এই ঈশ্বরতত্ত্ব যদিও স্বরূপতঃ অত্যন্ত সুগূঢ় এবং দুর্ব্বোধ্য রহস্য পরিপূর্ণ, তথাপি তাঁর রূপ গুণ লীলাদি সম্বন্ধে চিন্তাও ধারণা করিতে গেলে শাস্ত্রই আমাদের প্রথম এবং প্রধান অবলম্বন। এখন, এই শাস্ত্রও আবার নানা প্রকার; ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপ বর্ণিত আছে। ঈশ্বরতত্ত্বের এই বিভিন্ন আদর্শ হইতে সাধকদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে। এইখানে প্রবৃত্ত সাধকগণের অর্থাৎ যে সমস্ত সাধক সাধনপথে

* শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত ১ম খণ্ডে "গোঁড়ামি বনাম নিষ্ঠা" প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

প্রথম প্রবেশ করিতেছেন তাঁহাদের, একটা বিষম খট্‌কা বাধে। শ্রীভগবানের কোন্ আদর্শ বড়; কোন্ আদর্শ ছোট, কোন্ সাধক সম্প্রদায় উচ্চস্তরের, কোন্ সম্প্রদায় নিম্নস্তরের, এইরূপ একটা সন্দেহ, ইতস্তত। ও ভেদবুদ্ধি এসে পড়ে। এই ভাল মন্দ ছোট বড় বোধ প্রথম প্রথম সাধকের চিত্তকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করে, তাই সাধক কিছুতেই তাঁর উপাস্য ঈশ্বরতত্ত্বে মনস্থির করিতে পারেন না। আজ একরূপে, কাল অন্যরূপে, তুদিন পরে হয়তো আর একরূপে শ্রীভগবানের সাধন ভজন করিতে যান ; ফলে বিক্ষিপ্তচিত্ততাবশতঃ তিনি তাঁর উপাস্য ঈশ্বরের .কোন রূপেই মনোনিবেশ করিতে সক্ষম হন না।

প্রশ্ন। সাধন পথের এই জটিল সমস্যা অর্থাৎ এই মারাত্মক সন্দেহ নিরসনের উপায় কি ?

উত্তর। দেখ, ভগবৎতত্ত্বের কোন একটি বিশিষ্ট আদর্শে মনঃসংযোগ ব্যতীত এই সন্দেহ ও ব্যতিব্যস্ততার অবসান কিছুতেই হইতে পারে না। কিন্তু এই আদর্শ-নির্ব্বাচন সাধকের নিজস্ব শক্তি দ্বারা হয় না ; তাই পরম করুণ শ্রীভগবান্ জীবের প্রতি অশেষ কৃপা করিয়া স্বীয় আচার্য্য-শক্তি দ্বারা সাধকের উপাস্য সাধ্যতত্ত্ব নিরূপণ করিয়া দিয়া থাকেন। সেইজন্য ভক্তি শাস্ত্র সাধকের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের অবশ্য প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব সাধক সর্ব্বাগ্রে অবশ্যই আপন অপেক্ষা উন্নত, স্নিগ্ধপ্রকৃতি, শাস্ত্রযুক্তিতে সুনিপুণ এবং ঈশ্বরে সুদৃঢ় শ্রদ্ধাবান কোন আচার্য্যের শরণাপন্ন হইবেন ; তাঁর পক্ষে শ্রীভগবানের কোন্ শ্রীমূর্ত্তিটি এবং কোন্ ভাবটি অবলম্বনীয় তাঁর আচার্য্যদেবই তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন ; একেই বলে 'গুরুকরণ'। এই গুরুকরণ হইলে পর সাধকের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত চিত্তবিক্ষেপের নাশ হইয়া যায় ; তখন নিজ উপাস্য ইষ্টদেবের প্রতি তাঁর একটা প্রগাঢ় ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা আসে।

এই অচলা ইষ্টনিষ্ঠা সাধক জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহামূল্য সম্পত্তি; যেহেতু এই ইষ্টনিষ্ঠাই 'প্রেম' অনুভূতির প্রথম সোপান-স্বরূপ।

যাঁহারা একনিষ্ঠ ভক্ত নিজ নিজ ইষ্টদেবের প্রতি তাঁহাদের একটা সুদৃঢ় শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তি এবং প্রগাঢ় একাগ্রতা ও তন্ময়তা থাকে। তাঁহাদের উপাস্য ইষ্টদেবতার প্রতি এমন একটা অচল অটল বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে যে, কিছুতেই তাহা বিচলিত হয় না। যতদিন পর্য্যন্ত সাধকের নিজ অভীষ্ট উপাস্য তত্ত্বে এই একমুখী নিষ্ঠা এবং তন্ময়তা লাভ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত নানা প্রকার চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হয়; কিন্তু নিজের ইষ্টনিষ্ঠায় একবার ডুবিয়া যাইতে পারিলে আর কোন গণ্ডগোল থাকে না। সেটি কিরূপ জান? মনে কর, যতক্ষণ কোন ব্যক্তি নদীর তীরে বা অগভীর জলে দণ্ডায়মান থাকেন, ততক্ষণ তিনি নদীতীরস্থ বা নদী-বক্ষস্থিত যাবতীয় বস্তু বিষয় সম্বন্ধে ছোট বড়, ভাল মন্দ ইত্যাদি বিচার করিতে সক্ষম হন; কিন্তু যদি তিনি একবার নদীতে ডুবিয়া যাইতে পারেন, তখন তাঁর আর কোন ভেদ বুদ্ধি থাকে না; যেহেতু তখন আর কে বিচার করিবে? ঠিক সেইরূপ সাধক যখন নিজ ইষ্টনিষ্ঠায় ডুবিয়া তন্ময় হইয়া যান, তখন তাঁহার উপাস্য তত্ত্বে চিত্ত আপনা হ'তেই স্থির হ'য়ে যায়; তখন আর কোন প্রকার বিক্ষেপ থাকে না।

দেখ, 'শাক্ত', 'বৈষ্ণব', 'শৈব' ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের কথা তোমরা অবশ্য শুনিয়াছ; প্রত্যেক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত সাধকগণ যতক্ষণ না আপন আপন উপাস্য ইষ্টদেবের প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠা দ্বারা একটা তন্ময়তা লাভ করিতে না পারিবেন অর্থাৎ 'তাঁহাদের নিজ নিজ ইষ্টদেব বা দেবীই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব' এইরূপ বোধ তাঁহাদের না জাগিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা তৎ তৎ সম্প্রদায়ভুক্ত প্রকৃত 'ভক্ত'-

পদবাচ্য হইতে পারিবেন না। নিজ অভীষ্ট স্বরূপে তন্ময়তা লাভ হইলে অর্থাৎ 'ইষ্টই আমার সর্ব্বস্ব' এইরূপ বোধ হইলে সর্ব্ববস্তুতেই সাধকের ইষ্টস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সর্ব্ব বস্তুতে এই ইষ্টস্ফূর্ত্তি হওয়া যে সাধকজীবনের খুব উন্নত অবস্থা সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবেই দেখ, যিনি শাক্ত-সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি ততদিন ঠিক ঠিক 'শাক্ত' হইতে পারিবেন না যতদিন না তিনি সর্ব্ব বস্তু বিষয়ের মধ্যে তাঁহার উপাস্য দেবী আদ্যা-শক্তিকে অনুভব করিতে পারিবেন। সেইরূপ যিনি বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত, তিনি ততদিন ঠিক ঠিক 'বৈষ্ণব' হইতে পারিবেন না যতদিন না তিনি সবেরই ভিতর তাঁর উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান উপলব্ধি করিতে পারিবেন। অতএব নিজ নিজ উপাস্য ইষ্টদেবতার প্রতি একটা অচলা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং দৃঢ় শ্রদ্ধা রাখা যে সাধকের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই একমুখী নিষ্ঠাদ্বারা প্রেমের অনুভব হয়; বলিতে কি, ঐকান্তিক ইষ্টনিষ্ঠাই প্রেমের প্রাণ। যে প্রেমধর্ম্মলাভ সাধক-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, এই ইষ্টনিষ্ঠা ব্যতীত তাহা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। শ্রীভগবান্ আগে সাধকের এই নিষ্ঠা পরীক্ষা করেন, এই পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইলে পর তিনি ভক্তকে তাঁর প্রেমের মধুময় আস্বাদন প্রদান করেন। সাধক ভক্তের প্রেমলাভের উপযুক্ততা এই ইষ্টনিষ্ঠা দ্বারাই পরীক্ষিত হয়। এই একমুখী নিষ্ঠা কি প্রকার জান? একনিষ্ঠ ভক্ত তাঁর উপাস্য শ্রীভগবানের চরণে এই ব'লে প্রার্থনা করেন,—"প্রভু! তোমা ছাড়া কিছু জানি না, বুঝি না; তোমা ছাড়া অন্য কিছু দেখিতে শুনিতে জানিতে বা বুঝিতে চাহি না। তোমায় যে ভাবে ডেকে, যে রূপে দেখে, আমার অন্তরাত্মা পরিতৃপ্ত হয়, তোমার সেই মানসমোহন রূপটি ভিন্ন অন্য কোন রূপে আমি তোমায় চিন্তা

করিতে পারি না। সত্য বটে, ভক্তজনের মনোরঞ্জনার্থ ভিন্ন ভিন্ন রূপে তুমি তোমার স্বরূপ ব্যক্ত ক'রেছ, এবং তোমার ভিন্ন ভিন্ন রূপের আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন ভক্তের নিকট অতীব মনোরম, কিন্তু তোমার সেই বহু রূপের মধ্যে যে রূপটি চিন্তা করিবার প্রবৃত্তি ও সামর্থ্য তুমি আমায় দিয়েছ অর্থাৎ তোমার যে রূপটি আমার ভাল লাগে, আমার সমষ্টি চিন্তাশক্তি কেন্দ্রিভূত হ'য়ে তোমার যে স্বরূপের চরণে আমার মস্তক বিক্রয় ক'রে দিয়েছে, তোমার নাম ধ'রে ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে তোমার যে নয়নাভিরাম মূর্ত্তিটি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে, তোমার সেই রূপটি ছাড়িয়া তোমায় অন্য কোন রূপে দেখিবার, অন্য কোন নামে ডাকিবার এবং অন্য কোন ভাবে ভাবিবার অর্থাৎ তোমাকে আমার ধারণার বিষয়ীভূত করিবার সামর্থ্য আমার নাই ; আমি যে তা পারি না। তোমার যাবতীয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ভাবে আমার চিত্ত নিবেশিত করিবার সামর্থ্য তুমি আমায় দাও নাই। আমার এই ক্ষুদ্র আধারে বোধ হয় তার প্রয়োজন ও নাই, তাই জোর ক'রে যদি আমি সেরূপ করিতে যাই অর্থাৎ যদি আমি যুগপৎ তোমার সমস্ত রূপে ও ভাবে চিত্ত ধারণা করিতে যাই, তবে কেমন যেন এক প্রকার বিসদৃশ ব্যাপার হ'য়ে পড়ে ; তাতে আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণে বড় ব্যথা লাগে ; যেহেতু তা হ'লে আমি প্রাণভ'রে তোমায় ভাল বাসিতে পারি না। সেরূপ 'অম্বল.চাকা' ভালবাসায় আমার প্রাণের পরিতৃপ্তি হয় না ; আর তুমিও তো সেরূপ ফাঁকা ফাঁকা ভালবাসা চাও না। তোমার যে রূপের ধ্যানে আমার সমস্ত হৃদয়টা ভ'রে যায়, আমার সমস্ত চিত্তবৃত্তি আপনহারা হ'য়ে তোমার যে স্বরূপে তন্ময় হ'য়ে যায়, তোমার অন্য কোন রূপকে সেখানে বসাবার আর স্থান কোথায়? প্রভু! তুমি চিরদিনই আমার সেই প্রাণারাম অভীষ্ট স্বরূপে আমার হৃদয় আলো ক'রে বিরাজিত থাকিও।"

অতএব দেখ, এই ইষ্টনিষ্ঠা সাধক ভক্তের নিকট এরূপ মূল্যবান সম্পত্তি যে সর্ব্বস্ব বিনিময়ে প্রাণান্তেও ইষ্টনিষ্ঠ সাধক আপনার নিষ্ঠা হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত হইতে চাহেন না।

আবার দেখ, শাস্ত্র বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ বিশ্বমূর্ত্তি; চরাচর বিশ্বের সমস্ত বস্তু বিষয় তাঁহারই প্রকাশ। সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিশ্বরূপ শ্রীভগবানের সমস্ত রূপই ভক্তের নমস্য; কিন্তু তন্মধ্যে কোন একটি বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ যাঁহার নিকট যে রূপটি ভাল লাগে তাঁহার পক্ষে সেই রূপটি অবলম্বন করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়াই সাধনার পদ্ধতি। যেহেতু সমকালে দুই বা ততোধিক রূপে চিত্তের একাগ্রতা সাধন যে সাধকের পক্ষে সম্ভবপর নয়, একথা প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই অতি সহজে বুঝিতে পারিবেন। অন্যপক্ষে একাগ্রতা ও তৎ-সর্ব্বস্বতা অর্থাৎ তিনিই আমার সর্ব্বস্বধন এইরূপ বোধ ভিন্ন প্রেমের অনুভবই হইতে পারে না; কাজেই সেরূপ করিতে গেলে অর্থাৎ দুই বা ততোধিক রূপে চিত্ত নিবেশিত করিতে গেলে অবশ্যই সাধকের একনিষ্ঠতার হানি হয় এবং তাতে প্রেম উপলব্ধির পথে যথেষ্ট বাধা পড়ে। তাই সাধকের পক্ষে সেরূপ পন্থা অবলম্বন ক'রে শ্রীভগবান্‌কে ভজিতে যাওয়া যে নিতান্ত রীতিবিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক তা মনীষী ভক্তিশাস্ত্রকারগণ ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। অতএব সেই আরাধ্য ঈশ্বরতত্ত্বে যাহাতে নিজের অচলা নিষ্ঠা অব্যাহত থাকে তজ্জন্য সাধকমাত্রেরই কর্ত্তব্য এই যে আধ্যাত্মিক পথের যত কিছু জটিলতা, যত কিছু সন্দেহ ও সাম্প্রদায়িক গণ্ডগোল অর্থাৎ বাদ বিসংবাদ, সে সমস্ত থেকে আপনার ইষ্টদেবতাকে একান্তে পৃথক্ ভাবে সরিয়ে রেখে দেবেন এবং কদাচ বাহিরের কোলাহল, তর্ক যুক্তি, বিচার বুদ্ধি, এসবের সঙ্গে তাঁর প্রিয়তম অভীষ্টদেবতাকে মেশাবেন না। চীৎকার, কোলাহল, ও সব বারবাড়ীর জিনিষ, বার

বাড়ীতে হয় হ'ক, অন্দর মহলে যাবে কেন? তার পর সাধক যখন অবসর পাবেন তখন নিভৃতে নিশ্চিন্তমনে তাঁর প্রাণপ্রিয় প্রেমময় উপাস্যদেবতাকে হৃদয়াসনে বসিয়ে প্রাণভ'রে তাঁর পূজা ও সেবা করিবেন, প্রাণের ভাষায় প্রাণ খুলে তাঁর প্রাণনাথের সঙ্গে কথা কহিবেন এবং ভাববিহ্বল প্রাণে সেই ভাবনিধি ভালবাসার ধনকে ভালবেসে সুখী হইবেন। এই ইষ্টনিষ্ঠার মধুময় এবং লোভনীয় আস্বাদন আধ্যাত্মিক রাজ্যের এক অতিস্নিগ্ধ রহস্যময় গোপনীয় তথ্য। সাধু গুরু ও মহতের কৃপায় যিনি নিজ ইষ্টে অচলা নিষ্ঠা ও মতি অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপরের পক্ষে সেই মাধুর্য্যের অনুভব করিবার উপায় নাই। এখন, বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, সাধন-পথে এই ইষ্টনিষ্ঠার প্রয়োজন কত বেশী। অতএব যাহাতে তোমাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতার প্রতি একটা প্রগাঢ় নিষ্ঠা চিরদিন অব্যাহত থাকে সে বিষয়ে তোমরা বিশেষ যত্নবান থাকিও।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা তোমরা বিশেষ ক'রে মনে রেখো যে, এই ইষ্টনিষ্ঠা দৃঢ়ীভূত করিতে হইলে সাধকমাত্রেরই ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া সর্ব্বক্ষণ একটা ঈশ্বরাভিনিবেশ বজায় রাখা কর্ত্তব্য। ভক্ত-চরিত্রের একটা বিশিষ্ট লক্ষণ এই যে, সাধকভক্ত তাঁর সকল কর্ম্মের ভিতর দিয়া সর্ব্বক্ষণই শ্রীভগবানে অভিনিবিষ্ট থাকা-বশতঃ নিরন্তর একটা ভগবৎ-সান্নিধ্য অনুভব ক'রে থাকেন অর্থাৎ একটা অতি স্নিগ্ধ ও মধুর ভাবের আবেশ দ্বারা সেই ভাবনিধি শ্রীভগবান্‌কে ছুঁয়ে থাকেন; একটা ঈশ্বরাভিনিবেশের স্রোত এমন ভাবে তাঁর মনের ভিতর দিয়া অনবরতই প্রবাহিত হইতে থাকে যে, তাঁর যাবতীয় চেষ্টা ও উদ্যম কোনটাই একেবারে সম্পূর্ণরূপে ভগবৎচিন্তা-সম্পর্কশূন্য হয় না। তিনি বাহিরে যতই কেন শুষ্ক ও বিমর্ষের ন্যায় প্রতীয়মান হউন না,

তাঁর অন্তরটা কেমন যেন একটা আবিষ্ট ও গর গর ভাবাপন্ন থাকে। এই উন্নত ভাবাবেশই ভক্তের জীবনকে সর্ব্বদা অতি স্নিগ্ধ ও মধুময় ক'রে রাখে; বলিতে কি, ইহাই অর্থাৎ এই মধুরাদপি মধুর পূর্ণানন্দদায়ী ঈশ্বরাভিনিবেশই সাধক ভক্তের সঞ্জীবনী।

প্রশ্ন। আপনি যে ঈশ্বরাভিনিবেশের কথা বলিলেন, বাস্তবিকই উহা সাধক জীবনের সঞ্জীবনী সুধা। এখন, আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে কখন কোন কারণে সাধক ভক্তের এই ঈশ্বরাভিনিবেশের হ্রাস বৃদ্ধি অথবা নাশের সম্ভাবনা আছে কি?

উত্তর। দেখ, প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বরাভিনিবেশ একেবারে নাশ কখনই হয় না। তবে বাহ্য বস্তু বিষয়ে চিত্তের অত্যধিক বিক্ষেপ হ'লে পর কখন কখন ইহার সাময়িক একটু আধটু হ্রাস হ'তে দেখা যায় এবং সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় শ্রীভগবানের গুণ লীলা সূচক উন্নত ভাব গুলি স্মরণ, মনন ও ধারণা করিলে ইহার বৃদ্ধি হয়। তবে, প্রধানতঃ তুইটি কারণে এই ঈশ্বরাভিনিবেশের হ্রাস হইতে দেখা যায়। সেই তুইটি কারণ কি কি জান? এক—পরমুখাপেক্ষী হওয়া অর্থাৎ অত্যন্ত প্রতিগ্রহ করা, আর—অত্যধিক সঞ্চয়-বুদ্ধি। পরমুখাপেক্ষী হ'লে ঈশ্বর-নির্ভরতা থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় আমরা দেখিতে পাই শ্রীভগবান্ নিজমুখে ব'লেছেন—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"

সাধক যদি অত্যন্ত পরমুখাপেক্ষী হন তবে এই ভগবদ্বাক্যে তাঁর দৃঢ় প্রতীতি থাকে কই! যাঁরা সাধক জীবন লাভ করিতে চান, তাঁহাদিগকে উপরোক্ত ভগবদ্বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া পড়িতে হইবে অর্থাৎ সাধন ভজন করিতে হইবে। তোমরা ঐরূপ 'নিত্যাভিযুক্ত'

হইয়া দেখ, তোমাদের 'যোগক্ষেম'—অর্থাৎ জীবন্ ধারণোপযোগী প্রয়োজনীয় অলব্ধ বস্তুর লাভ এবং সেই লব্ধ বস্তুর রক্ষা—তিনি বহন করেন কি না। তোমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে যদি এই বিষয়টি চিন্তা কর তবে বেশ বুঝিতে পারিবে যে,—তোমরা যতই কেন মনে কর না যে অনেক পরিশ্রম ক'রে—কত যোগাড়-যন্ত্র ক'রে—তোমরা তোমাদের জীবিকা অর্জ্জন করিতেছ, কিন্তু স্বরূপতঃ সর্ব্ব অবস্থায় তিনিই তোমাদের ভরণ পোষণ করিতেছেন ; তোমাদের চেষ্টা উপলক্ষ মাত্র। প্রকৃতপক্ষে উহাই যদি সত্য হইল, তবে ভরণ পোষণের জন্য অত্যধিকমাত্রায় পরমুখাপেক্ষী হইবার এবং তজ্জনিত এত ব্যতিব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? এ সংসারে না খেতে পেয়ে না প'রতে পেয়ে কে কোথায় মারা গিয়াছে? সকলের আহার তিনিই তো যোগাচ্ছেন। আর, সঞ্চয়বুদ্ধি যাঁর আছে তিনি কখন বিপদে পড়িলে প্রথমেই ঈশ্বরের দিকে মুখ চেয়ে থাকিতে পারেন না অর্থাৎ বিপদের সময় তাঁর ঈশ্বর-নির্ভরতা আসে না; যেহেতু এটা প্রায়ই দেখা যায় যে যাঁরা খুব ধনবান ও অতিমাত্রায় সঞ্চয়ী, যাঁদের সিন্দুকে অনেক সঞ্চিত অর্থ থাকে, তাঁদের পরিজনের মধ্যে যদি কেহ কখন পীড়িত হন, তবে আগেই ডাক্তার ডাকিবার ব্যবস্থা হয় অর্থাৎ ঈশ্বরেচ্ছার উপর কোন নির্ভরতা থাকে না ; বলিতে কি, তাহাতে কোন আস্থাই থাকে না। কিন্তু অন্যপক্ষে, যাঁর অর্থ নাই এমন ভক্ত সেরূপ অবস্থায়ও সেই নিরুপায়ের একমাত্র উপায় ঈশ্বরের মুখচেয়ে প'ড়ে থাকেন। তিনি জানেন এবং বিশ্বাস করেন যে তাঁর প্রভু শ্রীভগবান্ মঙ্গলময় এবং সর্ব্বশক্তিমান্, তাঁর ইচ্ছায় নিমিষে সমস্ত রোগ-যন্ত্রণার অবসান হ'য়ে যেতে পারে ; কাজেই বিপদে প'ড়েও তাঁর ঈশ্বরাভিমুখতা নষ্ট হয় না—অকূলে প'ড়েও তিনি হাল ছাড়েন না। এখন তোমরা বোধ হয় বুঝিতে পারিলে যে, অত্যধিক

পরমুখাপেক্ষী হওয়া এবং অতিরিক্ত সঞ্চয়বুদ্ধি এই দুইটি কারণে সাধকের ঈশ্বরাভিনিবেশ হ্রাস হ'য়ে যায়। অতএব যিনি সাধক—যিনি ভক্তিপথের পথিক—তিনি অবশ্যই এই দুইটি হইতে বিশেষ সাবধান থাকিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন। শ্রীভগবানের গুণলীলাসূচক কথা প্রসঙ্গে ভক্তশ্রেণীভুক্ত অনেক ব্যক্তির অশ্রু, কম্প, পুলক প্রভৃতি শারীরিক বৈলক্ষণ্য আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু অন্য সময়ে তাঁহাদিগকে আর সেরূপ দেখা যায় না, অন্যত্র তাঁহারা ঠিক যেন সাধারণ মানুষের মতই আচরণ করে থাকেন। তাঁহাদের ঐ সমস্ত সাময়িক ভাবাবেশ যখন স্থায়ী হ'তে দেখা যায় না, তখন আপনি যে ভক্তের ঈশ্বরাভিনিবেশের কথা বলিলেন তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? ঈশ্বরাভিনিবেশ তবে কি একটা কথার কথা মাত্র?

উত্তর। না, ঈশ্বরাভিনিবেশ কখন কথার কথা হইতে পারে না, যেহেতু ভক্তিরাজ্যে ইহা একটি অমূল্য এবং অতীব মধুময় জিনিষ; সাধু গুরু এবং মহতের কৃপায় ইহার মাধুর্য্য কেবলমাত্র নিজ অনুভববেদ্য; শ্রীগুরু-কৃপায় যাঁর নিজের অভীষ্ট ঈশ্বরে একটা অভিনিবেশ হয় তিনিই তাহার মাধুর্য্য অনুভব করিতে পারেন, নতুবা অপর সাধারণকে ইহা সম্যক্ বোঝান যায় না; তবে কতকটা বোঝাবার চেষ্টা করা হয় মাত্র। ঈশ্বরাভিনিবেশ একটি অতি স্নিগ্ধ মধুময় আন্তর বৃত্তি বিশেষের অনুভূতি। সাধু মহতের কৃপায় যখন সাধকের বুদ্ধি সত্ত্বগুণাশ্রিত হয় এবং শ্রীভগবানের অপার করুণা এবং ভক্তবাৎসল্যের কথা স্মরণ করিতে করিতে সাধক যখন তন্ময় হইয়া যান, তখনই এই ঈশ্বরাভিনিবেশের মাধুর্য্য তিনি আব্ছা আব্ছা অনুভব করিতে থাকেন। তোমরা ভগবদ্ভক্ত সাধকগণের মধ্যে যে সমস্ত অশ্রু, কম্প বা পুলক প্রভৃতি দৈহিক বিকার দেখিতে পাও, সেগুলি কোন প্রকার কাল্পনিক অস্থায়ী ভাবকালী বা প্রতারণামাত্র নয়;

সেগুলি যথার্থ এবং ভক্তের অন্তরে অনুভূত মাধুর্য্যের বাহ্যিক অভিব্যক্তি মাত্র। ঐ সমস্ত লক্ষণ ভক্তের দেহে কোন কোন সময়ে লক্ষিত হয় এবং অপর সময়ে কেনই বা লক্ষিত হয় না, তাহার কারণ, বহুদর্শী মহাপুরুষগণ যেরূপ স্থির করিয়াছেন, বলিতেছি ; মনোযোগ দিয়া শুনিলে তোমরা অনায়াসে বিষয়টি বুঝিতে এবং ধারণা করিতে পারিবে এবং তা হ'লে এ সম্বন্ধে তোমদের বদ্ধমূল ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হ'য়ে যাবে।

দেখ, প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বরাভিনিবেশ একরূপ স্বাভাবিক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভক্তচিত্ত সর্ব্বদাই কোন না কোন মধুর ভগবদ্ভাবে ভাবিত থাকে এবং উহা যাবতীয় সদ্‌গুণরাশীর আধারবশতঃ স্বভাবতঃ অতি কোমল এবং তরল ; এবং এই কোমলত্ব ও তরলত্ব গুণসম্পন্ন হওয়ায় সর্ব্বক্ষণই অর্থাৎ যে কোন সময়েই তরঙ্গায়িত হইবার প্রবণতা তাহাতে থাকে ; অন্তরে অন্তরে সর্ব্বদাই একটা মধুময় তরঙ্গ খেলে। ভক্ত তাঁর প্রিয়তম প্রভুর নাম স্মরণে এবং তাঁর গুণ লীলাদি চিন্তনে স্বতঃই সর্ব্বক্ষণ এত বিভোর থাকেন যে সব সময়েই তাঁর চিত্তটি কেমন এক প্রকার গর গর ভাবাপন্ন থাকে, সদাই তাঁর চোক্ ছল্ ছল্ করে ; লোকাপেক্ষাশূন্য হ'য়ে তিনি হয়তো আপনমনে অস্ফুটস্বরে নিজ প্রিয়তম ইষ্টদেবের গুণগান করিতে থাকেন। তবে, বায়ু বহিলেই যেমন নদীরজলে তরঙ্গ উঠে এবং তখনই তাহা লোকলোচনের গোচরীভূত হয়, সেইরূপ যে সমস্ত মধুময় ভাবের স্রোত সর্ব্বদা ভক্তের অন্তরে প্রবাহিত হইতে থাকে, সেই সকল ভাবপুষ্টির অনুকূল উদ্দীপনগুলি পাইবামাত্র ভক্তের চিত্ত তরঙ্গায়িত হয় এবং অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাত্ত্বিক বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে ; তখনই ভক্তের ঐ প্রকার অবস্থাগুলি সাধারণের বাহ্যদৃষ্টির গোচরীভূত হয়। তোমরা মহতের অনুগত হইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক ভক্তিশাস্ত্রগুলি পাঠ করিলে আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের আরও অনেক সুক্ষ্ম রহস্য বোধগম্য

করিতে পারিবে। ভক্তের এই সমস্ত অশ্রু, কম্প, পুলকাদি ভাবের বাহ্য-প্রকাশ দেখিয়া অদূরদর্শীতাবশতঃ কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, ও সব কিছু নয়, কেবল লোকের নিকট 'ভক্ত' ব'লে পরিচিত হইবার জন্য ভক্ত নাম ধারী এক শ্রেণীর লোক ঐ সমস্ত ভাবকালী বা বুজরুকির অবতারণা ক'রে থাকে এবং সাধারণের কাছে একটা প্রতিষ্ঠার দাবী করে। কিন্তু তিনি যদি প্রকৃত ভক্তের সুগূঢ় চরিত্র এবং তাঁর ভাব-বিহ্বল চিত্ত সম্যক্ বিশ্লেষণ করিতে পারিতেন তবে তিনি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেন যে ঐ সমস্ত সাত্ত্বিক ভাব ভক্তিরাজ্যের অতীব মনোরম বাঞ্ছিত বস্তু; ঐ গুলি সাময়িক অস্থায়ী উত্তেজনামাত্র নয়, পরন্তু উহারা সর্ব্বক্ষণই ভক্তচিত্তে অবস্থান করে এবং স্বভাবতঃই ভক্তচরিত্রের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য বর্দ্ধন ক'রে থাকে। অতএব তোমরা এটি নিঃসন্দেহে জানিয়া রাখিও যে, অশ্রু, কম্প, পুলকাদি সাময়িক ভাবকালী নয়, উহারা ভক্তচরিত্রের অতি স্নিগ্ধ মধুময় প্রার্থয়ীতব্য বস্তু—অতুলনীয় গৌরবের জিনিষ।

আরও দেখ, ভজনশীল ভক্ত চরিত্রের সুগূঢ় রহস্য সহজেই সাধারণের বোধগম্য হইবেই বা কি করিয়া? শ্রীভগবানের কৃপায় যাঁর অন্তরের মনোরম বৃত্তিগুলির যতটা পরিমাণে উদ্বোধন অর্থাৎ জাগরণ হয়েছে, তিনি ততটা পরিমাণে ঐ সমস্ত সুমধুর ভাবগুলি হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম। মোট কথা, তোমরা জানিয়া রাখ—প্রকৃত ভক্তের ঈশ্বরাভিনিবেশ স্বাভাবিক, সাময়িক বা কাল্পনিক নহে।

প্রশ্ন। ভক্তের ইষ্টনিষ্ঠা ও ঈশ্বরাভিনিবেশ সম্বন্ধে অজ্ঞতাবশতঃ আমাদের মনে যে সমস্ত বিসদৃশ ধারণা হইত, আপনার সুমধুর ও যুক্তিপূর্ণ কথায় আমাদের সে সমস্ত ভ্রম আজ দূর হইল। আপনার কৃপায় এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সাধকের ইষ্টনিষ্ঠাকে 'গোঁড়ামী' বলিয়া উপেক্ষা করিবার বিষয় নয়; ভগবৎপ্রেম উপলব্ধির পক্ষে এই

গোঁড়ামীর অর্থাৎ ইষ্টনিষ্ঠার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এবং ভক্তের অশ্রু, কম্প পুলকাদি সাত্ত্বিক ভাবগুলি ঈশ্বরাভিনিবেশের আংশিক বাহ্যিক প্রকাশ ও ভক্তিরাজ্যের অতুলনীয় গৌরবের জিনিষ। অতঃপর ভক্ত-চরিত্রের অন্য কোন সদ্‌গুণ সম্বন্ধে আলোচনা করুন। আপনার যুক্তিপূর্ণ নীতিকথাগুলি শুনিবার জন্য আমাদের আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে।

উত্তর। সাধকজীবন গঠন এবং ভক্তির অনুশীলন করিবার জন্য মানব চরিত্রে যে সমস্ত সদ্‌গুণের পরিপুষ্টির প্রয়োজন, তন্মধ্যে কতকগুলি সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। এই সমস্ত নীতিকথা শুনিবার জন্য তোমাদের ধৈর্য্য ও আগ্রহাতিশয় অতীব প্রশংসনীয়। দেখ, যে সকল কথা আমি তোমাদিগকে বলিতেছি এসব আমার নিজের কথা নয়,—পূর্ব্ববর্ত্তী সাধু ভক্ত মহাপুরুষগণেরই কথা—আমি তোমাদের নিকট সেইগুলির পুনরুল্লেখ করিতেছি মাত্র। সাধক-জনোচিত এই সমস্ত সদ্‌গুণ অর্থাৎ নীতিজ্ঞানগুলি অগ্রে লাভ না হইলে সাধকের নৈতিক জীবন সুচারুরূপে গঠিত হয় না। নীতিই যখন ধর্ম্ম, নৈতিক চরিত্র অক্ষুণ্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত যখন প্রকৃত ধর্ম্মজীবন লাভ হইতে পারে না, তখন মানবাত্মার উন্নতিকারক নীতিমাত্রই যে ভক্তির এক একটি অনুশীলন তাহা বলাই বাহুল্য। অতঃপর এস আমরা সাধকের 'সন্তোষ বা আত্মপ্রসন্নতা' সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

সন্তোষ বা আত্মপ্রসন্নতা।

দেখ, এই সংসারে সাধারণ মানব সবই আধিভৌতিক। তারা সর্ব্বদা কেবল নিজেদের আহার বিহার ও জীবিকানির্ব্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত এবং তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় বিষয়ই তাদের আলোচ্য; তা ছাড়া অন্য কোন প্রকার উন্নত চিন্তা তাদের মনে উদয় হয় না। কিন্তু যাঁরা সাধু মহতের কৃপায় সাধকশ্রেণীভুক্ত হ'য়েছেন, তাঁরা আর সাধারণ লোকের মত আধিভৌতিক নন; তাঁরা এখন আধ্যাত্মিক পথের অর্থাৎ ধর্ম্মপথের যাত্রী; সাধারণ মানব হ'তে তাঁদের চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট অবশ্যই রাখিতে হইবে, একথা পূর্ব্বেই তোমাদিগকে বলিয়াছি। এখন এই বৈশিষ্ট কি প্রকার তাহা বলিতেছি শুন। তোমরা দেখিতে পাইবে, যাঁহারা সাধক জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, জাগতিক বস্তু বিষয় সম্বন্ধে অর্থাৎ নিজেদের আহার নিদ্রা, অর্থ সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন, জীবিকা প্রভৃতি যাবতীয় পার্থিব বিষয়ে তাঁহাদের ব্যতিব্যস্ততা অনেক কমিয়া গিয়াছে। জগতাতিরিক্ত উন্নত তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য হইয়াছে; সেই বিষয়েই তাঁহারা সর্ব্বদা চিন্তাশীল। এই ব্যবহারিক জগতের স্থূল বস্তু বিষয়ের অতিরিক্ত উন্নত তত্ত্বগুলি অর্থাৎ ভগবৎতত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গগুলিই তাঁহাদের সর্ব্বদা আলোচ্য বিষয়। তদ্ব্যতীত যে কোন প্রকার বৈষয়িক আলোচনা তাঁহাদের নিকট গৌণ হইয়া গিয়াছে অর্থাৎ বৈষয়িক আলোচনায় সময় নষ্ট করিবার অবসর তাঁহাদের আর নাই।

সাধক-শ্রেণী-ভুক্ত লোককে আপাততঃ আমরা আধ্যাত্মিক পথের পথিক বলি বটে, কিন্তু সাধক কখন ঠিক ঠিক 'আধ্যাত্মিক' হ'তে পারেন

জান? যখন সাধকোচিত সদ্‌গুণগুলি একে একে তাঁহাতে প্রকাশ পাইতে থাকে, যখন তিনি সর্ব্বদা সকল অবস্থায়, অনুকূল হউক্ আর প্রতিকূল হউক্, সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া নিজের একটা অচঞ্চল সাম্যাবস্থা অর্থাৎ নিজের শান্তি ও প্রসন্নতাকে বজায় রাখিতে পারেন, তখনই তিনি ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন। যখন সাধকের নিজের ইচ্ছার স্বাতন্ত্র নষ্ট হ'য়ে গিয়ে তাহা ভগবদিচ্ছায় পর্য্যবসিত হয় অর্থাৎ যখন সাধক ঠিক ঠিক ধারণা করেন যে **'ভগবদিচ্ছায় যাহা হইবার তাহা অবশ্যই হইবে, যাহা না হইবার তাহা কখনই হইবে না,** তাহার উপর তাঁহার নিজের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই'—তখনই তিনি আধ্যাত্মিক হইতে পারেন, তখনই তাঁর 'সন্তোষ-সাধন' সম্ভবপর হয়। জাগতিক যাবতীয় ঘটনা পরম্পরা সেই মঙ্গলময় শ্রীভগবানের শুভেচ্ছায় সংঘটিত হইতেছে, যখন সাধকের মনে এইরূপ একটা সুদৃঢ় ভগবন্নির্ভরতা আসে, তখন তাঁহার সমস্ত অস্বাভাবিক উত্তেজনা ও উদ্বেগ আপনা হ'তেই প্রশমিত হ'য়ে যায়, সব ব্যতিব্যস্ততা কমে যায় তখন তিনি কোলাহলের মধ্যে থেকেও নির্জ্জনতাকে উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ব্যতিব্যস্ততার মধ্যে থেকেও শান্তিকে লাভ করিতে সক্ষম হন। বাস্তবিক, শ্রীভগবানে সর্ব্বতোভাবে নির্ভরশীল সাধকের প্রশান্ত চিত্তই ভক্তিদেবীর আবির্ভাবের উপযুক্ত ক্ষেত্র।

আরও দেখ, আধ্যাত্মিকতার একটা প্রধান লক্ষণই হচ্ছে—'সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতা'। পূর্ব্বেই বলেছি, সাধক যখন ঠিক ঠিক আধ্যাত্মিক হন, তখন তাঁর সমস্ত উদ্বেগ—সমস্ত ভয়—চলে যায়; যেহেতু তিনি তখন নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারেন যে, তাঁর উপাস্য শ্রীভগবান্—যাঁকে তিনি তাঁর প্রিয়তম আরাধ্য হৃদয়দেবতা ব'লে মনে করেন—তিনি সর্ব্ব-শক্তিমান্; আর তাঁর সেই সর্ব্বশক্তিমান্ প্রভু সকল সময়েই তাঁর

সঙ্গে সঙ্গে আছেন। কাজেই কাহারও হ'তে বা কোন কিছু হ'তে তাঁর ভয় বা উদ্বেগের কোন কারণ নাই। অন্যপক্ষে সেই প্রাণের প্রিয়তম উপাস্য দেবতা শ্রীভগবানে সর্ব্বক্ষণ চিত্ত নিবেশিত থাকাবশতঃ সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া তাঁর মনে একটা উজ্জ্বল এবং স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতা বিরাজ করে। ভক্তি-শাস্ত্র মানব মনের এইরূপ আনন্দোৎফুল্ল অবস্থাকে 'প্রসন্ন-উজ্জ্বল-চিত্ততা' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতা ও ভয়শূন্যতা এই দুইটি সদ্‌গুণের কষ্টি পাথরে নিজেদিগকে কষিয়া দেখিলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে তোমাদের মধ্যে কে কতটা পরিমাণে প্রকৃত আধ্যাত্মিক পথের পথিক হইতে পারিয়াছ। সাধকজীবনে এইরূপ সমুন্নত সদানন্দময় অবস্থার লাভ যে সেই করুণাময় শ্রীভগবানের অসীম করুণার পরিচায়ক সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন। আপনি যে সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতার কথা বলিলেন উহা কিরূপ তাহা আমাদিগকে একটু বিশদভাবে বুঝাইয়া দিন।

উত্তর। দেখ, মানবের মনের সন্তোষকে প্রসন্নতা বলে। এখন, জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ বাস করে; কেহ সত্ত্বগুণ-প্রধান, কেহ রজোগুণ-প্রধান আবার কেহবা তমোগুণ-প্রধান। সত্ত্ব-গুণী ব্যক্তিগণ সর্ব্বদা পরোপকার, দয়া, ক্ষমা সকলের সহিত সরল ব্যবহার, সৎসঙ্গে শ্রীভগবানের-গুণলীলা প্রসঙ্গের আলোচনা ও তাঁর লীলাগুণ কীর্ত্তনাদি সদনুষ্ঠানের দ্বারা সন্তোষ লাভ করেন। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ জাগতিক ভোগ্য বিষয়গুলি নিজেরা পূর্ণমাত্রায় ভোগ করিয়া অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক অপর সকলের দুঃখ কষ্ট সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া নিজেরাই ভাল খেয়ে ভাল প'রে আনন্দলাভ করেন। আর, তমোগুণ-প্রধান ব্যক্তিরা বিবাদ বিসম্বাদ, দ্বেষ হিংসা, দৌরাত্ম্য, অযথা প্রাণীহত্যা, চৌর্য্য, লাম্পট্য, পানদোষ

প্রভৃতি শাস্ত্র-বিগর্হিত যাবতীয় নিন্দিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা দেশের এবং সমাজের সমূহ অপকার সাধন করিয়া তৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে। এই ত্রিবিধ প্রকৃতির লোকের মধ্যে প্রত্যেকেরই সন্তোষ বা আত্মতৃপ্তিকে প্রসন্নতা বলা যায় বটে, কিন্তু প্রথমোক্ত সত্ত্বগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ—যাঁদের চরিত্র নানাবিধ সদ্‌গুণের আধার, যাঁদের অতিস্নিগ্ধ ও মধুর ব্যবহারে আপামর সকলেই সুখী হন, যাঁরা সর্ব্বদা উন্নত-চিন্তাশীল এবং ভগবৎকথা প্রসঙ্গে যাদের মনে সর্ব্বদা এক অভিনব বিমল আনন্দের ভাব বিরাজ করে—তাদৃশ মহৎ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুভূত সুনির্ম্মল আনন্দকেই সাত্ত্বিক-আত্মপ্রসন্নতা বলে। সন্তোষ বা প্রসন্নতা জীবমাত্রেরই লক্ষ্য; তবে এই সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতাই—যার মূলে কোন প্রকার আবিলতা বা আবর্জ্জনা নাই, যে আনন্দ কাহারও প্রাণে কষ্ট দিয়ে লব্ধ হয় না, যে আনন্দের মূলে সেই আনন্দময় শ্রীভগবানের আনন্দসত্তার অনুভূতি বিদ্যমান—তাহাই সাধক ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। ইহা অবশ্য খুব উপরের জিনিষ—ভক্তি-রাজ্যের অতুলনীয় বৈভব। সাধু গুরু ও ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের কৃপা ভিন্ন এই সাত্ত্বিক আত্মপ্রসন্নতার মধুময় আস্বাদনলাভ কাহারও ভাগ্যে ঘটে না। আশাকরি, তোমরা সর্ব্বদা সাধু ও ভগবদ্ভক্ত মহাত্মাগণের অনুগত হইয়া চলিও, তাহা হইলে তাঁদের কৃপায় ও শুভেচ্ছায় এই ভক্তজনলভ্য দিব্য আত্মপ্রসন্নতা লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারিবে।

আরও দেখ, এই সংসারে বহুপ্রকার লোক বাস করে; সকলেই ভিন্ন ভিন্ন রুচি এবং প্রকৃতি সম্পন্ন। এই সমস্ত ভিন্নরুচিসম্পন্ন লোকদিগের মধ্যে এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা স্বল্পেই সন্তুষ্ট এবং অপর এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা বহুতেও অসন্তুষ্ট। এই উভয়

শ্রেণীর লোকের মধ্যে যাঁরা স্বল্পে সন্তুষ্ট তাঁরাই আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইবার পক্ষে অধিকতর উপযুক্ত; যেহেতু তাঁরা বলেন,—"ঠাকুর! কোন রকমে দুটি শাক অন্ন খেয়ে তোমার দত্ত এই শরীরটা বজায় রেখে, তোমার নাম গুণ গান ক'রে জীবনটা যেন কাটিয়ে যেতে পারি।" তদতিরিক্ত এই সংসারের ভোগ্য বিষয়গুলির বিশেষ কোন প্রয়োজন তাঁদের থাকে না। কাজেই জগতাতিরিক্ত আধ্যাত্মিক বিষয়সকলের অনুশীলন অর্থাৎ উন্নত তত্ত্বানুসন্ধানই সর্ব্বক্ষণ তাঁদের চিন্তার বিষয় হ'য়ে থাকে। মোট কথা, জাগতিক বিষয়-সুখ ভোগে যাঁরা যতটা পরিমাণে উদাসীন, তাঁরা ততটা পরিমাণে এ পথে অর্থাৎ ভক্তিপথে এগুতে পারেন। শাস্ত্র বলিতেছেন;—"বিষয়াবিষ্ট চিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ" অর্থাৎ পার্থিব ভোগ্য বিষয় গুলিতে অত্যধিক মাত্রায় আসক্তি থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ ও মলিনতা নষ্ট হয় না; কাজেই তাদৃশ বিক্ষিপ্ত ও মলিন চিত্তে ভগবদাবেশ অবশ্যই সুদূরপরাহত। এ বিষয়ে তোমাদিগকে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; তোমরা তোমাদের পার্থিব ভোগাসক্তি যতদূর সম্ভব কমাতে চেষ্টা করিবে এবং স্বল্পে সন্তুষ্ট থেকে যাহাতে ভক্তিপথে—শ্রীভগবানের পথে—অগ্রসর হইতে পার তজ্জন্য সর্ব্বদা যত্নবান হইও।

অতঃপর সাধক-জনোচিত স্মৃতিশক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা তোমাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি মনোযোগ দিয়া শুন।

স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ।

দেখ, একটা সাধক-জীবন বা নৈতিকজীবন গঠন করিতে হইলে সাধু মহতের নিকট হইতে মানবোচিত সদ্‌গুণগুলি সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ গ্রহণ করিতে হয়, একথা তোমরা অবশ্যই শুনিয়াছ। এখন এই সমস্ত সদুপদেশের সফলতা অর্থাৎ সার্থকতা শ্রদ্ধাশীল, জিজ্ঞাসু ও ও শিশিক্ষু শ্রোতার স্মৃতিশক্তি ও ধারণাশক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। মনে কর, কোন সাধু মহাত্মার সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যথেষ্ট সদুপদেশ গ্রহণ করা হইল; কিন্তু যদি কার্য্যকালে সেগুলি মনে না থাকে, আর যদি সেই সমস্ত সদুপদেশ অনুযায়ী আচরণ না করা হয়, তবে সে সমুদায় কি ব্যর্থ ও নিরর্থক হয় না? আরও দেখ, ধর্ম্মতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়গুলি একমাত্র মনস্তত্ত্বেরই অতি সূক্ষ্ম আলোচ্য এবং অনুভবনীয় বিষয়; কাজেই সূক্ষ্মচিন্তাশক্তি ব্যতীত ঐ সমস্ত বিষয় গবেষণা, ধারণা ও অনুসরণ করিবার উপায়ান্তর নাই। অতএব স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষলাভ যে সাধকজীবনের পক্ষে অবশ্য প্রয়োজনীয় একথা সহজেই অনুমেয়।

প্রশ্ন। আপনার কথায় বুঝিলাম স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষলাভ মানব-জীবনের উন্নতির পক্ষে—বিশেষতঃ সাধক জীবনে—অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে, স্মরণশক্তি বর্দ্ধনের উপায় কি?

উত্তর। দেখ, নিয়মিত সংযমের অভাব, উত্তেজনা বশতঃ অযথা চিত্তবিক্ষেপ, অতিমাত্রায় নিরর্থক অবান্তর প্রসঙ্গ, এই গুলিই মানবের স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। ইতঃপুর্ব্বে 'সংযম' প্রসঙ্গে তোমরা

শুনিয়াছ যে ধৃতি ও স্মৃতি এই দুইটি পরস্পরের সহিত বিশেষরূপে অন্বিত। যিনি যে পরিমাণে তাঁর নিজ চরিত্রে ধৃতি অর্থাৎ কায়, মন ও বাক্যের সংযম আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবেন তাঁর স্মৃতিশক্তিও সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে। অতএব স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধনের জন্য তোমরা নিয়মিতরূপে শারীরিক ও মানসিক সংযম রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইও। তবে স্মরণশক্তির উৎকর্ষলাভের মোটামুটি একটা উপায় বলিতেছি শুন।

দেখ, কোন বিষয় স্মরণ রাখিতে হইলে বেশ অভিনিবেশ সহকারে চার পাঁচবার সেটি পড়িয়া বা শুনিয়া লইবে। অভিনিবেশ মানে একাগ্রতা সহকারে মনোযোগ অর্থাৎ সেই সময় মনটি স্থির ক'রে মন থেকে অন্যান্য চিন্তাগুলি কএক মুহূর্ত্তের জন্য সরিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ উত্তেজনা ও বিক্ষেপশূন্য হ'য়ে দৃঢ় একাগ্রতা সহকারে কথাটির সারাংশ অন্ততঃ চার পাঁচবার চিন্তা করিয়া লইবে। তাতে হবে কি জান? ঐরূপ করিলেই বুঝিতে পারিবে যে ঐ স্মরণীয় বিষয়টি তোমার চিত্তে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে; তখন আর তাহা তুমি সহজে ভুলিয়া যাইবে না। স্মৃতিশক্তির অর্থাৎ সূক্ষ্ম ধারণাশক্তির অন্তর্গত এমন একটি বৃত্তিবিশেষ আছে যদ্দ্বারা সুদৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে কোন বিষয় কএক মুহূর্ত্তের জন্য একবার চিন্তা করিয়া লইলে আর তাহা কদাচ ভুলিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকে না; এটি মনস্তত্ত্বের অন্তর্নিহিত একটি সুগভীর রহস্য এবং অতি প্রয়োজনীয় জানিবার কথা। সুদৃঢ় অভিনিবেশ দ্বারা আমাদের স্মৃতিশক্তির ভিতর এমন একটা দাগ পড়ে যেটি কখন মুছিয়া যায় না অর্থাৎ কদাচ ভুল হয় না। মানবের চিন্তাশক্তির ভিতর অনন্ত শক্তি বর্ত্তমান আছে, এই যে মনের একাগ্র অভিনিবেশ দ্বারা অভ্রান্তি অর্থাৎ বিস্মৃতির অসম্ভাবনা এও একটা শক্তিবিশেষ। চিত্তবৃত্তির যদি এই শক্তি না থাকিত তবে

বাল্যকালের কথা আদৌ আমাদের মনে থাকিত না; কিন্তু দেখ বাল্যকালে যে যে বিষয় দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে পঠিত, শ্রুত, দৃষ্ট অথবা চিন্তিত হইয়াছে, সেই সেই বিষয়গুলি পাষাণফলকে খোদিতের ন্যায় আমাদের চিত্তফলকে স্পষ্টরূপে জাগ্রত রহিয়াছে; তাহা ভুলিবার নয়। সময়ে সময়ে সেগুলি যদিও মনে না পড়ে সেটা কেবল অন্যান্য বহুবিধ চিন্তারূপ মেঘ দ্বারা সাময়িক চিত্তবিক্ষেপের আবরণ মাত্র। যদি তোমায় বলি,—"কালীপদ! এই নামটি মনে রেখোতো? 'রামচরণ'; আমি যখন জিজ্ঞাসা ক'রব আমায় মনে করিয়ে দিও।" মনে কর, কিছু দিন পরে আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"সে দিন তোমায় কি নামটা মনে রাখতে ব'লেছিলাম?" যদি দৃঢ় অভিনিবেশের সহিত পূর্ব্বে তুমি সেই নামটি শুনিয়া ধারণা ক'রে থাক, তবে তুমি তৎক্ষণাৎ ব'লতে পারবে—'রামচরণ'; আর যদি পূর্ব্বে কথাটি মনোযোগের সহিত শুনে না থাক, তবে তুমি অবশ্য চিন্তা ক'রতে থাকবে—'এই—এই—এই, আহা! এই যে প্রভু! পেটে আস্‌ছে, মুখে আস্‌ছে না; এই—কি একটা 'চরণ' ব'লেছিলেন প্রভু'! 'দূর্গাচরণ'? উঁহু; 'কালীচরণ'? না 'হরিচরণ'? না প্রভু! তাও নয়; তবে কি 'রামচরণ'? হঁ্যা—হঁ্যা প্রভু! 'রামচরণ'। দেখ, ঠিকতো? ভুল হচ্ছে না তো? না প্রভু! আর কি ভুল হ'তে পারে? বেশ মনে প'ড়ছে—'রামচরণ'। তবেই দেখ, 'রামচরণ' এই কথাটি তোমার স্মরণে ছিল, কেবল অন্যান্য বহুবিধ চিন্তার ফলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হওয়ায় তার উপর সাময়িক একটা আবরণ প'ড়ে গিয়েছিল মাত্র। এইরূপে মনের একাগ্রতা অর্থাৎ দৃঢ় অভিনিবেশ সহকারে ভক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সাধু মহতের সদুপদেশগুলি ধারণা করিতে অভ্যাস করিলে সেগুলি সর্ব্বদাই তোমাদের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। অতএব সাধু মহতের উপদেশগুলি অভিনিবেশ পূর্ব্বক শ্রবণ করা

তোমাদের একান্ত প্রয়োজন; তা না হ'লে ভক্ত-চরিত্রের মহত্ত্ব ও সমুন্নত আদর্শগুলি কি করিয়া তোমরা মনে রাখিতে সক্ষম হইবে, আর কি করিয়াই বা সেই সেই উন্নত আদর্শে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া তদনুযায়ী নিজেদের চরিত্র সংগঠন করিতে সমর্থ হইবে?

এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা তোমাদের জানিয়া রাখা বিশেষ দরকার। যখনই তোমরা কোন মহাপুরুষের নিকট কোন সদুপদেশ গ্রহণ করিতে যাইবে, তখন তোমাদের ব্যক্তব্য অর্থাৎ জিজ্ঞাস্য বিষয়টির মোটামুটি ভাব নিজের ভাষায় ব্যক্ত ক'রে বুঝিয়ে ব'লতে চেষ্টা করিবে এবং তোমাদের জ্ঞাতব্য বিষয়টি তাঁর নিকট হ'তে শুনে নিয়ে যতক্ষণ না ঠিক ঠিক বোধগম্য হয়, ততক্ষণ বিষয়টি পুনঃ পুনঃ চিন্তা ও অনুধাবন করিবে। জিজ্ঞাস্য ছোট ছোট বিষয় নোট্‌বুক দেখে বলা এবং শ্রুত বিষয় ভালরূপ বোধগম্য না ক'রে নোট্‌বুকে টুকে রাখা, এ দুটিই বড় বদ অভ্যাস; যেহেতু পুঁথিগত বিদ্যা কার্য্যকালে বিশেষ ফলদায়ক হয় না। বিশেষ প্রয়োজনীয় কথাগুলি অর্থাৎ যে কথাগুলি ভুলিয়া গেলে কোন ক্ষতি হওয়া সম্ভব অথবা খুব জটীল কথা না হয় মোটামুটি লিখে রাখা যেতে পারে, কিন্তু তাই ব'লে সামান্য সামান্য ব্যক্তব্য বিষয়গুলি মনে না রেখে যদি খাতা বা নোট্‌বুক দেখে ব'লতে হয়, তবে তাহা অবশ্যই মনের যথেষ্ট দূর্ব্বলতারই পরিচায়ক। যাঁরা সাধক-জীবন লাভ করিতে ইচ্ছুক, এরূপ মানসিক দুর্ব্বলতা তাঁদের পক্ষে বড়ই অশোভনীয়; আমি এটা মোটেই পছন্দ করি না।

তোমরা ইতঃপূর্ব্বে শুনিয়াছ যে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যগুলির যথাযথ পালনই প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ পদবাচ্য। যদি সমস্ত মানব সেইগুলি পালন করেন তবে জগতের বার আনা রকম অশান্তি আপনা হ'তেই ক'মে যায়। যথাযথ কর্ত্তব্য কার্য্যগুলির অপালনই যত অশান্তির সৃষ্টি ক'রে

থাকে। তাহাই যদি ঠিক হইল, তবে এখন এই মনুষ্যত্বের বিকাশ ও বর্দ্ধন কি উপায়ে করা যায় দেখা যাউক্। এই বিষয়টি আমি চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি এবং আমার মনে হয়, সত্য, সরলতা, ক্ষমা, দয়া, সহিষ্ণুতা, সহানুভূতি, ভক্তি, প্রেম, ভালবাসা প্রভৃতি যে সদ্বৃত্তিগুলিকে সাধারণতঃ আমরা 'মনুষ্যত্ব' অর্থাৎ মানবোচিত সদ্‌গুণ ব'লে থাকি, সেইগুলির একটা তালিকা অর্থাৎ 'লিষ্ট্' (list) ক'রে নিতে হবে ; এবং সর্ব্বদা স্মৃতিতে সেগুলি জাগিয়ে রাখতে হবে। আমাদের প্রত্যেক চেষ্টায় অর্থাৎ কার্য্যে, বাক্যে এবং মনে আমরা যাহা কিছু করি, বলি, এমনকি, মনের দ্বারা যে সমস্ত সঙ্কল্প করি, সেই সমস্ত স্থলে আমরা ঠিক ঠিক মনুষ্যত্ব বজায় রখিয়া তৎ তৎ কার্য্য করিতেছি কি না চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। দুর্ব্বলতা অথবা সঙ্কীর্ণতাবশতঃ যখনই আমাদের ঐ সমস্ত কর্ত্তব্য হইতে চ্যুতি হইবার উপক্রম হইবে তখনই সেইগুলি ধরিয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবিধান করিতে হইবে। এইরূপে আমাদের হৃদয়ের দুর্ব্বলতাগুলি যদি প্রতিদিন আমরা কিছু না কিছু ধ'রে ফেলতে পারি, তবে অচিরে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ ক'রে একজন আদর্শ মানবের সমভূমিত্বে দাঁড়াইতে সক্ষম হইব। আমি আমার জীবনে এইরূপঃ'মনুষ্যত্বের' একটা তালিকা ক'রে নিয়েছি এবং নিজেকে প্রকৃত মনুষ্যত্বের আদর্শে স্থাপিত করবার জন্য বিশেষরূপে চেষ্টা (struggle) ক'রছি। তোমরাও সকলে নিজ নিজ জীবনে ঐরূপ 'মনুষ্যত্বের' একটা তালিকা তৈরী ক'রে নিয়ে সেই আদর্শে চ'লতে চেষ্টা কর।

প্রশ্ন। বুঝিলাম, চরিত্রের উন্নতি সাধন করিতে হইলে এটি অতি উত্তম সংযুক্তি ; কিন্তু মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের বোধ যাদের নাই তারা কি উপায় অবলম্বন করিবে ?

উত্তর। দেখ, আমার মনে হয়, এরূপ কথা অনেক স্থলে বলা সমীচীন হয় না; যেহেতু মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের বোধ প্রায় সকলেরই আছে একথা বলা নিতান্ত অযৌক্তিক নয়; কারণ, তোমাদিগকে তো ইতঃপূর্ব্বে ব'লেছি যে, যে চোর সে অবশ্যই জানে যে, চুরি করা ভাল নয়, কেননা সে কখনই পছন্দ করে না যে, তার কোন জিনিষ অপরে চুরি করুক্; যে মিথ্যাবাদী সে অবশ্যই জানে যে, মিথ্যাকথা বলা ভাল নয়, যেহেতু সে কখনই পছন্দ করে না যে, অপরে তার নিকট মিথ্যাকথা বলুক্; এইরূপ, যে ঘাতক সে অবশ্যই জানে যে, কাহারও প্রাণবধ করা ভাল নয়, কেননা সে কখনই পছন্দ করে না যে, কেহ তাহার প্রাণ নাশ করুক্। অতএব যখন কেহ মানবোচিত কর্ত্তব্যগুলি পালন না করে, তখন যে, তৎ তৎ কর্ত্তব্যবোধের অভাববশতঃ সেগুলি সে পালন করে না, তা নয়; কর্ত্তব্যগুলি সম্বন্ধে পূর্ণবোধ সত্ত্বেও কেবল কর্ত্তব্যের ত্রুটি বা অপব্যবহার করে মাত্র, একথা অবশ্যই বলা যায়। কাজেই 'মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের বোধ সকলের নাই' একথা সব সময় সব ক্ষেত্রে বলা চলে না।

যাহা হউক্, এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচনা করা হইল। ফলকথা, সাধক-জীবন গঠন করিতে হইলে মনুষ্যোচিত কর্ত্তব্যের বোধগুলি সকল সময় স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখতে হবে। বলিতেকি, এই স্মৃতিশক্তির পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভের নামান্তরই একরূপ সাধক জীবন যাপন করা। দেখ, স্মৃতি ও বিস্মৃতি অর্থাৎ মহতের সদুপদেশ এবং নীতিকথা-গুলি 'মনে রাখা' আর 'ভুলে যাওয়া' এই দুটিকে অন্তর্ম্মুখতা ও বহির্ম্মুখতা বলা যেতে পারে। মোটের উপর এই দুটি হ'তেই সাধক জীবনের উন্নতি ও অবনতি সূচিত হ'য়ে থাকে। যিনি একাগ্রচিত্ত তিনি অন্তর্ম্মুখতাবশতঃ সর্ব্বদা সমস্ত বিষয় স্মরণ করিতে পারেন, আর

যিনি বিক্ষিপ্তচিত্ত তিনি সর্ব্বদা বিভিন্ন বিষয়ে বহির্ম্মুখতাপ্রযুক্ত কার্য্যকালে তাঁর কোন কথাই মনে থাকে না।

আরও দেখ, শ্রীভগবান্‌ই সাধক ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্মরণীয় বস্তু; যিনি সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ব বস্তু বিষয়ের ভিতর দিয়া অনুক্ষণ তাঁর স্মৃতিটিকে শ্রীভগবানে জাগিয়ে রাখতে পারেন তিনি কত বড় সাধক! কত বড় মহাপুরুষ! আমার মনে হয়, এই স্মৃতিশক্তির পরিপূর্ণ উৎকর্ষ লাভই মানবজীবনের উদ্দেশ্য। দেখ, বালক যখন ছোট থাকে, কত লেখা পড়া শেখে; উদ্দেশ্য কি জান? স্মৃতিশক্তি বাড়বে; ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে বিদ্যাশিক্ষার ভিতর দিয়া তাহার এই স্মৃতিশক্তি ব্যবহারিক জগতের বস্তু বিষয় ছাড়িয়া যখন শ্রীভগবানে অর্থাৎ তাঁর রূপ গুণ ও লীলাদি চিন্তনে সর্ব্বদা জেগে থাকে এবং তাঁর ধ্যান ধারণায় চিত্ত নিবিষ্ট হয়, তখন তিনি মহাপুরুষ-পদবাচ্য হ'য়ে থাকেন। অতএব তোমরা মনে রেখো, যত কিছু শিক্ষা, যত কিছু সদুপদেশ, সবেরই উদ্দেশ্য 'শ্রীভগবানে স্মৃতিশক্তি জাগিয়ে রাখা'; যেহেতু জ্ঞান মাত্রই ঈশ্বর-পর। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুঃ বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ" অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রীভগবান্‌কে স্মরণ করিবে, কদাচ বিস্মৃত হইবে না। তাই বলি স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষ লাভের চেষ্টা সাধক ভক্তের অবশ্য অবলম্বনীয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। তোমরা সর্ব্বপ্রযত্নে চেষ্টা করিও যাহাতে তোমাদের স্মৃতিশক্তি বর্দ্ধিত হয়।

অদোষদর্শীতা ও গুণগ্রাহীতা।

দেখ, সাধনপথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধককে অদোষদর্শী এবং গুণগ্রাহী হইতে হইবে। অদোষদর্শীতা ও গুণগ্রাহীতা এই দুইটি সদ্‌গুণ সকলেরই বিশেষতঃ যাঁহারা সাধন-পথের পথিক তাঁহাদের পক্ষে অবশ্য অবলম্বনীয়; সাধককে একথা অবশ্য মনে রাখিতে হইবে যে, মানবমাত্রেই দোষে গুণে জড়িত। এই সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে করিতে প্রবৃত্তির বশে চালিত হ'য়ে দৈবাৎ লোকের পদস্খলন অসম্ভব নয়; কাজেই, দৈবাৎ যদি কেহ কোন নিন্দনীয় কার্য্য করিয়া ফেলেন সেই দোষে তাঁকে ঘৃণা করা নিতান্ত অনুচিত। যে কোন কারণেই হউক্ তোমরা কাহারও প্রতি একটা ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করিবে না; কারণ যে নিন্দিত কার্য্যের জন্য তুমি হয়তো কোন ব্যক্তিকে ঘৃণা করিতে চাহিতেছ, সেই কার্য্য যে কোন সময়ে তোমাকর্ত্তৃক কৃত হয় নাই বা পরে হইবার সম্ভাবনা নাই এ কথা কে বলিতে পারে? মানবের প্রশংসা বা নিন্দা তাহার চরিত্রের কতকগুলি উন্নত বা অবনত প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করে। অবনত প্রবৃত্তিগুলির হাত থেকে আজিও কি আমরা সম্যক্ নিস্তার পেয়েছি? কাজেই অপরের দোষদর্শন এবং তাহার প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করা কাহারও পক্ষে সাজে না। যখনই অতি সামান্য কারণে কাহারও প্রতি এইরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষের ভাব মনে আসিবে, তৎক্ষণাৎ যাহাতে সে ভাবকে পরিত্যাগ ক'রে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'তে পার, অনবরত চেষ্টার দ্বারা তোমরা এমন অভ্যাস করিবে।

বর্ত্তমানে আমাদের স্বভাবটা এতই কলুষিত অর্থাৎ অপরের দোষ-

দর্শন প্রবৃত্তিটা এতই বেশী যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দোষের জন্য আমরা মানুষকে কত ঘৃণা ও উপেক্ষা ক'রে থাকি। তাই আমাদের মনে হয়, শ্রীভগবান্‌ও বুঝি আমাদের দোষ ধ'রে তার দণ্ড বিধান করেন। তাই, তিনি যে স্বরূপতঃ অদোষদর্শী, প্রেমময় এবং ক্ষমাময় এই উচ্চ আদর্শে আমরা তাঁকে ধারণাই করিতে পারি না। ভক্ত সাধক অবশ্যই নিজের উপাস্য শ্রীভগবান্‌কে 'করুণাময়' এবং 'ক্ষমাময়' এই সমুন্নত আদর্শেই ধারণা ও অনুভব করিতে চেষ্টা করিবেন; কিন্তু এই লোকের দোষদর্শন প্রবৃত্তি যতদিন আমাদের থাকিবে ততদিন আমরা তাঁকে সেই মহান আদর্শে কিছুতেই ধারণা করিতে সক্ষম হইব না। তবেই দেখ, সাধন-পথে এই দোষদর্শন প্রবৃত্তিটা কত মারাত্মক অন্তরায়।

অন্যপক্ষে যতদিন অপরের দোষদর্শন-প্রবৃত্তি আমাদের থাকিবে ততদিন আমরা কেবল লোকের কতকগুলি অযথা নিন্দাবাদ ক'রে নিজেদের অপরাধের সৃষ্টি ক'রতেই থাকিব এবং ক্রমশঃ আরও কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হ'তেই থাকিব; ফলে, ততদিন এই সংসারে আমাদের যাতায়াতের আর শেষ হবে না। এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই; কেবল তোমরা এই কথাটি মনে রাখিও যে,—মানবমাত্রেই দোষে গুণে জড়িত। তোমরা যদি কোন দোষের জন্য কাহাকেও ঘৃণা করিতে চাও, তবে সেই নীতিবিরুদ্ধ কাজটির প্রতি ঘৃণা করিও; কিন্তু কদাচ সেই দোষী ব্যক্তিকে ঘৃণা করিও না; যেহেতু পাপ বা দোষই ঘৃণার্হ, কিন্তু পাপী বা দোষী ব্যক্তি করুণার পাত্র। এই বিষয়ে ভক্তের চরিত্রের একটা বিশিষ্টতা থাকে; সেটি কি প্রকার জান? প্রকৃত ভক্ত সর্ব্বদা নিজের দোষ দর্শন ক'রে থাকেন এবং প্রয়োজন হইলে সর্ব্বসমক্ষে তাহা অকপটে প্রকাশ করিতে কখন কুণ্ঠিত হন না। আর তিনি কখন নিজের প্রশংসা বা গুণকীর্ত্তন করেন না; অন্যপক্ষে তিনি সর্ব্বথা অপরের দোষ-

দর্শন পরিত্যাগ করিয়া গুণগ্রাহী হন এবং কেবল সকলের গুণকীর্ত্তন ক'রে থাকেন। তিনি নিজে অমানী হ'য়ে সকলকে বহুমান প্রদান করেন; কিন্তু সাধারণ লোক ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ ক'রে থাকে; তারা নিজের দোষ যথাসাধ্য গোপন ক'রতে চেষ্টা করে, কিন্তু অপরের দোষদর্শন এবং পরনিন্দা করিতে একেবারে পঞ্চমুখ। তারা কখন অপরের প্রশংসা করিতে চায় না, কিন্তু আত্মপ্রশংসা করিতেই সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে। তাদের অহঙ্কারটা এত বেশী যে সর্ব্বোপরি নিজের সম্মান বা প্রশংসা বজায় রাখিবার জন্য অবাধে অপরের আত্মসম্মানের মস্তকে পদাঘাত করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু তোমরা ভক্তিপথের পথিক, তোমাদের উচিত সর্ব্বদা লোকের দোষদর্শন পরিত্যাগ করিয়া কেবল গুণগ্রাহী হইতে চেষ্টা করা। নতুবা যদি নিজ চরিত্রের ছিদ্র গুলি সংশোধন না করিয়া কেবল পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে থাক এবং বাহিরে কপটতার প্রশ্রয় দিয়া নিজেদের হৃদয়ের ভিতরে শতপ্রকার আবর্জ্জনা জমা ক'রে রাখ, তবে হাজারই সাধন ভজন করনা কেন সবই বৃথা—সবই ভস্মে ঘি ঢালা মাত্র। তোমাদিগকে তো ব'লেছি যে নৈতিক চরিত্র গঠন না হ'লে আধ্যাত্মিক ভক্তিপথে উন্নতি লাভ একেবারেই অসম্ভব; যেহেতু পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। অন্যান্য সদ্গুণের সহিত অদোষদর্শী এবং গুণগ্রাহী না হ'তে পারলে সাধকোচিত চরিত্রের বৈশিষ্ট রক্ষা হয় না।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে শ্রীভগবান্ যে কত অদোষদর্শী—কত ক্ষমাময় এবং করুণামাখা-প্রাণ—তাহা তোমরা পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর চরিত্র আলোচনা করিলে সম্যক্ বোধগম্য করিতে পারিবে। ভগবদ্ভক্ত সাধক যখনই তাঁর প্রভু শ্রীভগবান্‌কে 'অদোষদর্শী'

বলিয়া মনে করেন তখনই কি এক অব্যক্ত মধুর ভাবে তাঁর তাপদগ্ধ বুকখানা ভ'রে যায়—তাঁর তৃষিত প্রাণে কত আশার সঞ্চার হয়; তাই ভক্ত বৈষ্ণব সংকীর্ত্তনে বিভোর হইয়া গাহিয়া থাকেন,—

"অদোষদরশী আমার প্রভু নিত্যানন্দ রে।"

এইবার তোমাদিগকে 'উন্নত আদর্শের আদানপ্রদান' সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি মনোযোগ দিয়া শুন।

উন্নত আদর্শের আদানপ্রদান।

দেখ, যাঁহারা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে উন্নত আদর্শের আদানপ্রদান করা ভক্তির একপ্রকার শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। যিনি অনবরত উন্নত আদর্শের আদানপ্রদান করিতে পারেন তিনি জগদ্বন্ধু। আমার মনে হয়, জগতে আমাদের পরস্পরে যে সম্বন্ধ, এই উন্নত আদর্শের আদানপ্রদান করাই তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সার্থকতা; এটা একটা খুব বড় জিনিষ। জগতের উপকার কেবল ধন অর্থাদির দ্বারা হয় না, সমুন্নত আদর্শের দ্বারাই জগতের সমধিক উপকার হ'য়ে থাকে। একজন ধনী ব্যক্তি প্রচুর অর্থ দান ক'রে অনেক গরীবের দুঃখ দূর ক'রতে পারেন সত্য, কিন্তু তাতে তাদের সাময়িক অশন-বসনের কষ্টই দূর হ'তে পারে; তাতে তাদের দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হ'তে পারে না। দেখ, জীবন ধারণের উপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মানুষের প্রকৃত অভাব খুব কম, অজ্ঞতাবশতঃ মানুষ তা না বুঝে কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি ক'রে নিজেরা কষ্ট পায় মাত্র। এক একজন পরদুঃখকাতর জ্ঞানী মহাপুরুষ সর্ব্বদা সদুপদেশাদি দ্বারা শত শত উচ্ছৃঙ্খল ও কল্পিত

অভাবে ব্যতিব্যস্ত ব্যক্তিকে সৎপথে এনে তাদের প্রাণে শান্তি দিয়ে জগতের বড় কম উপকার করেন না ; বরং তাঁদের জ্ঞানোপদেশে, শিক্ষায় এবং চরিত্রের উন্নত আদর্শে নিজেরা চরিত্রবান্ হ'য়ে মানুষ যথেষ্ট শান্তি পায় এবং তাতে স্থায়ীভাবে জগতের সমধিক কল্যাণ সাধিত হয়, জীবের দৈন্য হাহাকার অনেক পরিমাণে ক'মে যায়। অতএব তোমরা মহাপুরুষগণের পবিত্র জীবনের সমুন্নত আদর্শগুলি দৈনন্দিন অন্ততঃ কিছুক্ষণ চিন্তা করিতে অভ্যাস করিবে। এইটি আত্মোন্নতি করিবার একটি শ্রেষ্ঠ উপায় ; বিশেষতঃ সাধনপথে ভক্তির খুব বড় একটি অনুশীলন। এক একজন ভক্ত বা মহাপুরুষের উন্নত চরিত্রের বিশিষ্টতা ও মহৎপ্রাণতা-সূচক ভাবধারাগুলি তোমরা সর্ব্বদা স্মৃতি পথে জাগিয়ে রাখতে চেষ্টা করিবে। এই জন্যই স্মৃতিশক্তির উৎকর্ষের এত প্রয়োজন—যে সম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে তোমাদিগকে অনেক কথা বলা হইয়াছে।

দৃষ্টান্তস্বরূপ এস্থলে বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে কয়েকটি ভক্তের মহৎপ্রাণতাসূচক অসাধারণ ও সমুন্নত আদর্শের উল্লেখ করা যাইতেছে, এগুলি তোমরা সর্ব্বদা মনে রেখে ভক্তিলাভের পথে অগ্রসর হইও।

যথা ;—

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 'সহিষ্ণুতা' ও 'ক্ষমা'—

শ্রীহরিনাম গ্রহণের অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া মুসলমান কাজীর আদেশে বাইশ বাজারে যবনগণ কর্ত্তৃক ভীষণ বেত্রাঘাত সহ্য ক'রেও অত্যাচারীগণের জন্য শ্রীভগবানের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—

"এসব অজ্ঞেরে প্রভু করিহ প্রসাদ।
মোর দ্রোহে এ সবার নহু অপরাধ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীর 'দৈন্য'—

শ্রীনীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত সনাতন প্রভুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে যাইতেছিলেন, তখন দৈন্যাবতার সনাতন পাছু হাঁটিতে-হাঁটিতে মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"মোরে না ছুঁইও প্রভু পড়ি তোমার পায়।
একে নীচজাতি অধম আর কণ্ডু রসা গায়॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল বাসুদেব দত্তের 'জীবদুঃখ-কাতরতা'—

পরম ভক্ত শ্রীবাসুদেব দত্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বলিয়াছিলেন,—

"জীবের দুঃখ দেখি মোর হৃদয় বিদরে।
সর্ব্ব জীবের পাপ প্রভু দেহ মোর শিরে॥
জীবের পাপ লৈয়া মুঞি করি নরক ভোগ।
সকল জীবের প্রভু ঘুচাও ভব-রোগ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল অনুপমের 'ইষ্টনিষ্ঠা'—

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন তাঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা—শ্রীরামচন্দ্রের একনিষ্ঠ ভক্ত—অনুপমকে তাহার ইষ্টনিষ্ঠা পরীক্ষা করিবার জন্য বলিয়াছিলেন, 'তুমি রঘুনাথ উপাসনা ত্যাগ করিয়া আমাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ভজন কর' তাহাতে অনুপম বলিয়াছিলেন,—

"রঘুনাথের পাদপদ্মে বেচিয়াছি মাথা।
কাড়িতে না পারি মাথা পাই বড় ব্যথা॥
রঘুনাথের পাদপদ্ম ছাড়ান না যায়।
ছাড়িবার মন হইলে প্রাণ ফাটি যায়॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের 'আদর্শ প্রার্থনা'—

শ্রীহরিনামজপ-সম্পত্তির সম্রাট শ্রীল হরিদাস ঠাকুর পুরীধামে দেহত্যাগ-কালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট নিজের প্রার্থনা জানাইয়া বলিয়াছিলেন,—

"হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল-চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার শ্রীচন্দ্র-বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম।
এইমত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীর 'অযাচক বৃত্তি' ও 'প্রতিষ্ঠাত্যাগ'—

শ্রীবৃন্দাবন ধামে গিরি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা করিয়া ভক্তশিরোমণি শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরী যখন সন্ধ্যাকালে অনাহারে বৃক্ষতলে বসিয়াছিলেন তখন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গোপ বালক বেশে দুগ্ধ ভাণ্ড লইয়া শ্রীমাধবেন্দ্র-পুরীকে দর্শন দিয়া বলিয়াছিলেন,—

"পুরী এই দুগ্ধ লইয়া কর তুমি পান।
মাগি কেন নাহি খাও কিবা কর ধ্যান॥
পুরী কহে কে তুমি কাঁহা তোমার বাস।
কেমনে জানিলে আমি করি উপবাস॥
বালক কহে গোপ আমি এই গ্রামে বসি।
আমার গ্রামেতে কেহ না রহে উপবাসী॥
কেহ মাগি খায় অন্ন কেহ দুগ্ধাহার।
অযাচক জনে আমি দিইত আহার॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

রেমুনায় শ্রীগোপীনাথ মন্দিরে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী যখন মনে মনে গোপীনাথের ভোগের পূর্ব্বে তথাকার প্রসিদ্ধ ক্ষীর প্রসাদের স্বাদ প্রাপ্তির

আকাঙ্ক্ষা করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইয়াছিলেন এবং তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়া গ্রামের শূন্য হাটে বসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কীর্ত্তন করিতেছিলেন তখন শ্রীগোপীনাথের পূজারী, ঠাকুরের স্বপ্নাদেশে একখানি ক্ষীর প্রসাদ লইয়া সেই শূন্য হাটে গিয়া বলিয়াছিলেন,—

"ক্ষীর লও এই যার নাম মাধবপুরী।
তোমার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর কৈল চুরি॥"

* * * *

"অযাচক-বৃত্তি পুরী বিরক্ত উদাস।
অযাচিত পাইলে খান নহে উপবাস॥"

* * * *

"প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী যান পলাইয়া।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর 'বৈরাগ্য'—

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর কৃপাপাত্র সপ্তগ্রামের জমিদারপুত্র শ্রীরঘুনাথ দাস বার লক্ষ টাকার জমিদারী ও পরমা সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর মোহ কাকবিষ্ঠা-বৎ পরিত্যাগ করিয়া পুরীধামে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীচরণে আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন এবং পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আদেশে দীনাতিদীন কাঙ্গাল সাজিয়া শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীরাধাকুণ্ডতীরে বাস করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে যখন এই রঘুনাথ গৃহাদি ছাড়িয়া পলাইতে চাহিতেন তখন তাঁহার মাতা একদিন তাঁহার পিতাকে বলিয়াছিলেন,—

"পুত্র বাতুল হইল রাখহ বাঁধিয়া।"

তদুত্তরে তাঁহার পিতা তাঁহার মাতাকে বলিয়াছিলেন,—

"ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য্য স্ত্রী অপ্সরা সম।
এসব বাঁধিতে নারিলেক যার মন॥
দড়ির বন্ধনে তারে রাখিবে কেমতে।
জন্মদাতা পিতা নারে প্রারব্ধ খণ্ডাইতে॥
চৈতন্য চন্দ্রের কৃপা হইয়াছে ইহারে।
চৈতন্য চন্দ্রের বাতুল কে রাখিতে পারে॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'আদর্শ গুরুভক্তি'—

খেতরির জমিদার শ্রীকৃষ্ণানন্দ দত্তের পুত্র শ্রীনরোত্তম শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া শ্রীলোকনাথ গোস্বামী প্রভুর চরণাশ্রয় প্রাপ্তি কামনায় গোপনে স্বহস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া তাঁহার মলত্যাগের স্থান পরিষ্কার করিয়া দিতেন এবং সেই ঝাঁটা নিজ বুকে ধরিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ঘুমাইয়া পড়িতেন,—

"আপনাকে ধন্য মানে শরীর সফল।
প্রভুর চরণ প্রাপ্তি এই মোর বল॥
কহিতে কহিতে কাঁদে ঝাঁটা বুকে দিয়ে।
পাঁচ সাত ধারা বহে মুখ বুক বেয়ে॥"

প্রেম বিলাস।

তোমরা একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি এই সমস্ত ভগবদ্ভক্তের সমুজ্জ্বল আদর্শ মানবচরিত্রকে কত উন্নত করিতে পারে এবং শান্তির সুস্নিগ্ধ ধারায় জীব হৃদয়ের সর্ব্ব সন্তাপ দূর করিয়া দিয়া তাহাদের জীবন ধন্য ও মধুময় করিয়া দিতে পারে।

আরও দেখ, এক একজন মহাপুরুষের পবিত্র জীবনের আদর্শে জগতের যে উন্নতি সাধিত হয় আইনের কড়া শাসনে তাহা কখনই হইতে পারে না। কেবল শাসনের দ্বারা কখন জগতের ক্ষতিকারক কোন অন্যায়কে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায় না। আইনের কড়া শাসন বরং চরিত্রবান্ লোকেই মেনে চলে, কিন্তু চরিত্রহীন অসদাচারী ব্যক্তিগণ আইনের শাসন মোটেই মানে না বলিলেও চলে; যেহেতু তাহারা শাসনকে বাহিরে কতকটা শিরোধার্য্য করিয়া লয় বটে, কিন্তু মনে মনে তারা আইনের শাসনকে মোটেই মানিতে চাহে না। জগতে যখনই দুর্দ্দান্ত ও পাষণ্ডপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের জীবন পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সৎপথে চালিত হ'য়েছে, তখনই কোন না কোন মহাপুরুষের জীবনের উন্নত ও মহান্ আদর্শ দ্বারাই তাহা হইয়াছে—আইনের শাসনে হয় নাই—এ কথার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। নদীয়ার জগাই মাধাইএর জীবনের এইরূপ অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর অপার করুণার ও প্রেমের মহান্ আদর্শেই সঙ্ঘটিত হইয়াছিল—তারা পাপপথ ছেড়ে দিয়ে পুণ্যের পবিত্র পথে চলিয়াছিল। পাপীকে চিরদিনই লোকে ঘৃণাই ক'রে এসেছে; কই, তাতে তো তাদের পাপ প্রবৃত্তি কমে নাই? কলুষিত চরিত্র সংশোধিত হয় নাই? 'পাপীকে যে আদর ক'রে ভালবেসে কোলে তুলে লওয়া যায়' এই পবিত্র আদর্শ নিয়ে কেহই এযাবৎ তাদের সম্মুখে দাঁড়ায় নাই। যে শুভ মুহূর্ত্তে সেই পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীনিতাইচাঁদের প্রাণ তাদের কলুষ-কলঙ্কিত জীবনের দুর্দ্দশা দেখিয়া কেঁদে উঠেছিল এবং করুণা-ছল-ছল নয়নে তিনি তাদের পানে চেয়েছিলেন ও তাদিগকে ভালবেসে কোলে তুলে লইবার জন্য বাহু প্রসারিত ক'রে তাদের দিকে ছুটেছিলেন—এই সমুন্নত পবিত্র এবং উজ্জ্বল আদর্শ যে মুহূর্ত্তে তারা তাদের সামনে দেখতে পেয়েছিল—তৎক্ষণাৎ তারা তাদের সারাজীবনের অভ্যস্ত

পাপপথ একেবারে ছেড়ে দিয়ে শ্রীনিতাইচাঁদের চরণতলে লুটিয়ে প'ড়েছিল; শ্রীনিতাইচাঁদের কৃপায় তাদের পাপ চরিত্র সংশোধিত ও বিশুদ্ধ হ'য়ে গিয়েছিল। অতএব দেখ, এক একটি মহান্ আদর্শের দ্বারা এইরূপে যখন জগতে শত শত নর নারীর কুপথগামী জীবনের গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নতির পথে—ধর্ম্মের পথে—চালিত হ'য়ে থাকে, তখন অবশ্যই যে তাঁরা জগতের অসীম উপকার করেন এবং তাঁদের উন্নত চরিত্রের আদর্শ দ্বারা জগত যে অনেক ক্ষতি, অত্যাচার ও উৎপীড়নের হাত হ'তে বেঁচে যায়, একথা বলা কোন মতেই অযৌক্তিক হয় না।

সাধু, ভক্ত ও মহাপুরুষগণের উন্নত ও পবিত্র জীবনের আদর্শ দ্বারা মানবহৃদয়ের চিররুদ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলির একটা মধুময় স্পন্দন জেগে ওঠে; তখন মানুষ মহতের গুণমুগ্ধ হ'য়ে নিজ চরিত্রের সমস্ত আসুরিক ভাবগুলি পরিত্যাগ ক'রে ক্রমে সত্য, সরলতা, অহিংসা, দয়া, ক্ষমা প্রভৃতি গীতোক্ত দৈবী সম্পদে সমৃদ্ধ হয় এবং তাদের কলুষ-কলঙ্কিত হৃদয় পুণ্যের পূত প্রবাহে সম্যক্ বিধৌত হইয়া দেবভাবে বিভাবিত হ'য়ে যায়। এই প্রসঙ্গে এই কথাটি তোমরা বিশেষ ক'রে মনে রাখিও যে, সমুন্নত আদর্শ ভিন্ন কদাচ জীব হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত সাত্ত্বিক মনোবৃত্তিনিচয়ের উদ্বোধন হয় না এবং সাত্ত্বিক বৃত্তিগুলির উদ্বোধন না হ'লে অর্থাৎ সেগুলির একটা মধুময় স্পন্দন না জাগিলে মানুষ কোন দিনই আধ্যাত্মিক মার্গে অর্থাৎ ধর্ম্মপথে উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না।

এসম্বন্ধে আর বেশী কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। জগতের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তোমরা দেখিতে পাইবে যে, জগৎ চিরদিনই মহান্ আদর্শের পূজা ক'রে এসেছে। যখনই যেখানে মানব একটা সমুন্নত আদর্শ পেয়েছে তখনই সেখানে শত সহস্র নর নারী স্বতঃই আকৃষ্ট হ'য়ে সসম্ভ্রমে সেই আদর্শের চরণতলে নিজেদের মস্তক লুটিয়ে দিয়ে নিজেদিগকে

ধন্য ও কৃতার্থ মনে ক'রেছে। একটি মহান্ আদর্শের দ্বারা যখন জীব-জগতে এত বড় একটা ভাবান্তর অর্থাৎ উন্নতির দিকে পরিবর্ত্তন সম্ভব হ'তে পারে, তখন মনে ক'রে দেখ, এই উন্নত আদর্শের শক্তি কত মহীয়সী। আবার অন্যপক্ষে দেখ, একটি সমুজ্জ্বল আদর্শ দ্বারা যেমন জগতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়, তেমনি একটা অনাদর্শ দ্বারা—একটা হীনচরিত্র দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতি লোকের দ্বারা—জগতের যথেষ্ট অকল্যাণ ও অনিষ্ট সাধিত হ'য়ে থাকে। তাই বলি, তোমাদের চরিত্র এমনভাবে গঠন করিতে হইবে যেন তোমাদের কাছ থেকে লোকে একটা ভাল আদর্শ পায়, যেন তোমাদের কোন প্রকার অনাদর্শের দ্বারা জগতের কোন অকল্যাণ সাধিত না হয়। অতএব তোমরা নিজেদের অহঙ্কার ও কর্ত্তৃত্ব-অভিমান দূর ক'রে অর্থাৎ 'আমি সব চেয়ে ভাল বুঝি, অন্যের কাছ থেকে আমার জানিবার বুঝিবার কিছু নাই' এইরূপ মনের তমোভাব ত্যাগ ক'রে অনবরত ভক্ত মহাপুরুষগণের উন্নত চরিত্রের আদর্শগুলি সম্বন্ধে পরস্পর আলোচনা করিবে এবং তাঁদের উন্নত আদর্শের সমুজ্জ্বল আলোক সম্মুখে রেখে ধীরভাবে নিজেদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হইবে। তাঁদের উন্নত আদর্শ গ্রহণ ক'রে নিজেরা এমনভাবে আদর্শ চরিত্রবান্ হ'তে চেষ্টা ক'রবে যাহাতে তোমাদিগকে দেখে অপরেও ক্রমশঃ সেই মহান্ আদর্শ গ্রহণ করিতে প্রলুব্ধ হ'য়ে পড়ে।

ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তি প্রসঙ্গে মোটামুটি অনেক কথাই আলোচনা করা হইল। এবিষয়ে আর দুই একটি কথা ব'লে এ প্রসঙ্গের শেষ করা যাউক। এইবার এস আমরা 'শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত ও জ্ঞানবিচার' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও জ্ঞানবিচার।

দেখ, সাধক ভক্তের পক্ষে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে মোটামুটি একটু জ্ঞান থাকা বিশেষ দরকার। যদিও একটু উপরে উঠে গেলে অর্থাৎ বিশ্বাস ও অনুভবের অবস্থায় উপনীত হ'লে পর ও সবের অর্থাৎ তর্ক যুক্তি ও জ্ঞানবিচারের তত বেশী প্রয়োজন হয় না, তথাপি সাধনের প্রথম অবস্থায় এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একটা জ্ঞান থাকা অবশ্য প্রয়োজন। যেহেতু যে ভক্তি জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হয় না, তাহা বালির বাঁধের মত দুদিন পরে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। তাই বলি, নিজের উপাস্যতত্ত্বকে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা সম্যক্ প্রকারে সমর্থিত ও জ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন ক'রে তবে সাধন-পথে অগ্রসর হইবে; নচেৎ হয়তো বিরুদ্ধবাদীদের এক কথায় অর্থাৎ কূট তর্কের ফলে নানারূপ সন্দেহ ও অবিশ্বাস এসে তোমার ভক্তি ও ইষ্টনিষ্ঠা নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে। অতএব সাধকের পক্ষে ভক্তির অনুকূলে জ্ঞানবিচার ও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আলোচনার যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। এরূপ জ্ঞানবিচার ভক্তির বাধক নহে, বরং সমূহ পরিপোষক। তাই ভক্তিশাস্ত্র সাধন পথে ভক্তকে এ বিষয়ে সাবধান করিবার জন্য বলিয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহাতেই লাগিবে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

মনীষী ভক্তিশাস্ত্রকারগণ বহু শাস্ত্র গ্রন্থ আলোচনা ও গবেষণা করিয়া ভক্তের উপাস্যতত্ত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন,

জগতের কল্যাণের জন্য সেগুলি তাঁহারা তাঁহাদের কৃত বহু ভক্তিগ্রন্থে এরূপভাবে পর্য্যায়ক্রমে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, সাধক ভক্তগণ অনায়াসে সেগুলি অধ্যয়ন ও পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিয়া নিজ নিজ উপাস্যতত্ত্বে অচলা নিষ্ঠা ও মতি স্থির রাখিয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবার যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা পাইয়া থাকেন এবং পরিণামে শ্রীভগবানে ভক্তি ও প্রেম লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে পারেন। অতএব তোমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রভৃতি ধর্ম্মতত্ত্বের সার সিদ্ধান্ত পরিপূর্ণ ভক্তিগ্রন্থগুলি প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া পাঠ করিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্তে জ্ঞান লাভ করিতে সচেষ্ট হইবে। কিছুদিন নিয়মিতরূপে উক্ত সদ্‌গ্রন্থগুলি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পাঠ ও অভ্যাস করিলে তোমরা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে যে সেইগুলি কত অনন্ত ও অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার; কত অমৃততুল্য মধুময় প্রাণস্পর্শী জ্ঞান ও ভক্তির কথা উক্ত ভক্তিশাস্ত্রগুলির প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। প্রাণ জুড়াইবার জন্য মানুষ সৎসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুলিত হয়; সকলের ভাগ্যে সব সময় সৎসঙ্গলাভের সুযোগ হয় না বটে, কিন্তু মানুষের সন্তপ্ত হৃদয় শীতল করিবার জন্য সুমধুর ভক্তিকথা পরিপূর্ণ সদ্‌গ্রন্থাদির অভাব নাই। অতএব নিত্য নিয়মিতরূপে কোন না কোন একটি ভক্তিশাস্ত্রগ্রন্থের অধ্যয়ন ও অনুশীলন তোমাদের সাধনের একটি শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া জানিবে।

ধর্ম্মভীরুতা।

দেখ, 'ধর্ম্মভীরু' ব'লে একটা কথা তোমরা শুনে থাক; আধ্যাত্মিক পথে অর্থাৎ ধর্ম্মলাভের পথে এ কথাটির দাম খুব বেশী। এই ধর্ম্মভীরুতাই সাধককে পদে পদে নানাবিধ প্রলোভন ও নিষিদ্ধ পাপাচরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সাধনপথে উন্নতি লাভের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা ক'রে থাকে। মনে কর, একটা মিথ্যা কথা বলিলে হয়তো পাঁচটা টাকা পাওয়া যেতে পারে; সাধারণ লোকে হয়তো এই প্রলোভনটি ত্যাগ করিতে পারিবে না, কিন্তু যিনি সাধক—যিনি ধর্ম্মভীরু—টাকার লোভে দৈবাৎ যদি তাঁর মনে হয়—'মিথ্যাকথাটা ব'লব নাকি'? তৎক্ষণাৎ তাঁর বিবেক তাঁকে ইঙ্গিতে সাবধান করে দেবে—'না, না, ধর্ম্ম নষ্ট হবে'। ঐরূপ 'এই জিনিষটি চুরি ক'রলে বেশ দুপয়সা হাতে আসে'; 'চুরি ক'রব নাকি'? 'না, না, চুরি ক'রলে ধর্ম্ম নষ্ট হবে'। 'একটু চেষ্টা ক'রলেই অমুকের বিষয়টা ঠকিয়ে নিজের হস্তগত করা যায়'; 'চেষ্টা ক'রব নাকি'? 'না, না, ঠকিয়ে নিলে ধর্ম্মের কাছে পতিত হ'তে হবে'। তবেই দেখ, এই 'ধর্ম্মভীরুতা' পদে পদে সাধক ভক্তকে পতনের হাত থেকে কি ক'রে বাঁচিয়ে রাখে। এই ধর্ম্মভীরুতা সাধকের চরিত্রে কখন ঠিক ঠিক প্রকাশ পায় জান? যখন সাধক যে কোন প্রকার পার্থিব বিষয়ভোগ-জনিত আত্মতৃপ্তি—যেমন চৌর্য্য মিথ্যাদি অন্যায় উপায়ে অর্থোপার্জ্জন, সৌন্দর্য্যের মোহ অর্থাৎ সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভোগ-স্পৃহা ইত্যাদি—অপেক্ষা 'ধর্ম্ম'কেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও একমাত্র চরম লক্ষ্য বস্তু বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করেন এবং কিছুতেই নিজের অবলম্বনীয়

ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হইতে চাহেন না, তখনই সাধক ঠিক ঠিক 'ধর্ম্মভীরু' হইতে পারেন।

এই ধর্ম্মভীরুতা সাধকের নিকট এতবড় মূল্যবান্ বলিয়া বিবেচিত হয় যে, ত্রিভুবনের আধিপত্য ও ঐশ্বর্য্য পাইবার লোভেও ভগবদ্ভক্ত সাধক ধর্ম্ম হইতে একতিলও বিচলিত হইতে চাহেন না। ধর্ম্মভীরু সাধকের সাধন পথ হ'তে পদস্খলনের সম্ভাবনা নাই। এই ধর্ম্মভীরুতা সাধকের দেহরক্ষী (ইংরাজীতে যাকে বলে Body guard 'বডি গার্ড') স্বরূপ। যিনি ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া পড়িয়া থাকেন, ধর্ম্মই তাহাকে যাবতীয় আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করেন। একটি চলিত কথায় তোমরা অবশ্যই শুনিয়া থাক—'ধর্ম্মের জয় অধর্ম্মের ক্ষয়'। অতএব যিনি ধর্ম্মভীরু, সর্ব্বদা সর্ব্বত্র তাঁহার জয় যে অবশ্যম্ভাবী, একথা বলা কোন মতেই অযৌক্তিক নয়। যিনি ধর্ম্মভীরু, যিনি সুখে দুঃখে সকল অবস্থাতেই ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকেন, অর্থাৎ যাঁহার মন নিমিষার্দ্ধের জন্য শ্রীভগবানের চরণ কমল হইতে অনুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহাতেই নিত্যযুক্ত থাকে, তিনিই ভক্ত চূড়ামণি—ভগবদ্ভক্তগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

অতঃপর এস আমরা সাধকের 'সম্ভ্রমবুদ্ধি' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি।

সম্ভ্রমবুদ্ধি।

সম্ভ্রমবুদ্ধি ভক্তির বর্দ্ধক। এই সম্ভ্রমবুদ্ধি না থাকিলে ভক্তির অন্তর্নিহিত মধুময় ভাবগুলি উপলব্ধি করা যায় না। মনে কর, তোমরা রাস্তার ধারে তোমাদের বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া রহিয়াছ ; এমন সময় হয়তো নানাবিধ বাদ্যাদি শোভাযাত্রা সহকারে—দেবী প্রতিমা অথবা

শালগ্রাম শিলা তোমাদের সম্মুখ দিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে ; তৎক্ষণাৎ উপাস্য বুদ্ধিতে ঐ প্রতীমা বা শালগ্রামশিলাতে সম্ভ্রমবোধ আরোপ ক'রে উঠে দাঁড়াতে হবে এবং বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণাম ক'রতে হবে। ফলে, দেখতে পাবে যে, কিছুদিন ঐরূপ ক'রতে ক'রতে তখন আর মাটির প্রতিমা বা পাথরের নুড়ি ব'লে বোধ হবে না। এই সম্ভ্রমবোধ জাগিলে দেবী প্রতিমা আসিতে দেখিলে সত্যই মনে হবে 'আমার আনন্দময়ী মা দুর্গা আসিতেছেন' ; শালগ্রাম শিলা আসিতে দেখিলে সত্যই মনে হবে 'আমার আনন্দলীলাময় শ্রীগোবিন্দই আসিতেছেন'। এইরূপ পরম কারুণিক শ্রীগুরুদেবের প্রতি সর্ব্বদা একটা সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে রাখলে 'তিনি আসিতেছেন' দেখিলেই মনে হবে—'অহো ! আজ আমার পরম সৌভাগ্য ; যেহেতু আমার প্রভু আসছেন—আমার ইষ্টদেব—আমার আরাধ্য দেবতা আসছেন' ; কখনই তাঁকে সাধারণ মানুষ ব'লে বোধ হবে না। অতএব দেখ, এই সম্ভ্রমবুদ্ধি ভক্তির কত পরিপোষক ; যাঁরা আমাদের ভক্তির পাত্র তাঁদিগকে ভক্তি করিবার নানাপ্রকার পদ্ধতি আছে। কোন মহৎব্যক্তিকে আসিতে দেখিলে উঠিয়া দাঁড়ান, দণ্ডবৎ প্রণতি, মহতের অনুগমন, ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের পদধূলি গ্রহণ, প্রসাদ গ্রহণ, পাদোদক সেবন প্রভৃতি ক্রিয়াগুলি সম্ভ্রমবুদ্ধির পরিচায়ক এবং ভক্তি করিবার এক একপ্রকার সুচারু পদ্ধতি। এই সমস্ত ক্রিয়ার ভিতর দিয়া মহাপুরুষগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদে এবং মঙ্গলকামনায় ভক্তির মধুময় ভাবগুলি ক্রমশঃ বিনীত ও অনুগত সাধক ভক্তে সঞ্চারিত হ'য়ে থাকে। এই সম্ভ্রমবোধ না থাকিলে ভক্তির অস্তিত্বই থাকে না ; যেহেতু 'ভক্তি' জিনিষটিই সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বোধের বাচক। বলিতেকি, এই সম্ভ্রমবোধের সহিত ভক্তির ওতপ্রোত সম্বন্ধ বিদ্যমান। অতএব মহতের প্রতি সম্ভ্রমবোধ তোমাদের যেন সর্ব্বদা জেগে থাকে।

নিস্বার্থ পরোপকার।

দেখ, তোমরা যথাসাধ্য পরোপকার করিবে। নিজের সাধ্যায়ত্ত হ'লে কোন জিনিস অন্ধ, আতুর, ভিক্ষুক অথবা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত যে কোন যাচক ব্যক্তিকে দিতে কুণ্ঠিত হইও না। কদাচ বিত্তশাঠ্যের প্রশ্রয় দিয়া প্রকৃত অভাবগ্রস্ত যাচককে বিমুখ করিও না। চাহিলেই দিবে, ফলে দেখিবে কোন দিন ইহাতে তোমাদের অভাব হইবে না। ভিক্ষুককে একটা পয়সা দিয়ে মনে ক'রনা যে তুমি কেবল তারই উপকার করিলে; এর দ্বারা তোমারও একটা মহৎ উপকার সাধিত হইল। কিরূপে জান? দেখ, শ্রীভগবান্ তোমার হৃদয়ে 'দয়া' বলিয়া যে একটি অতি স্নিগ্ধ সাত্ত্বিক বৃত্তি দিয়া রাখিয়াছেন, অভাবগ্রস্ত দরিদ্র ভিক্ষুককে একটা পয়সা দিয়া তুমি সেই দয়াবৃত্তির অনুশীলনের একটা সুযোগ পাইলে। তোমার হৃদয়স্থ 'করুণা' বৃত্তিটিকে জাগিয়ে দিবার জন্য শ্রীভগবান্ই যাচক ভিক্ষুক রূপে তোমার সম্মুখে উপস্থিত হ'য়ে থাকেন। এই জন্যই, তোমরা অবশ্য শুনে থাকবে, চলিত কথায় ভিক্ষুকদিগকে 'দরিদ্র নারায়ণ' বলা হয়।

আরও দেখ, পরের উপকারের জন্য তোমরা যে কোন কর্ম্ম করিবে তাহা নিস্বার্থভাবেই করিবে। প্রত্যুপকারের প্রত্যাশা রাখিয়া কখন কাহারও উপকার করিতে যাইও না। তোমরা সাধক শ্রেণীভুক্ত হইয়া যে ভক্তি ও প্রেম লাভ করিতে চাও, 'পরার্থে নিস্বার্থভাবে ত্যাগ স্বীকার করা'কে বর্ত্তমানে সেই প্রেমের একপ্রকার সংজ্ঞা বলা যাইতে পারে। তাই বলি, তোমরা যথাসাধ্য স্বার্থত্যাগের কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে

চেষ্টা কর; যেহেতু ইহার পরিণতিতেই তোমরা প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইবে। **নিস্বার্থভাবে কৃত কর্ম্ম অপরের উপকার ও প্রীতি সম্পাদনার্থে অনুষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ-তৃপ্ত্যর্থে পর্য্যবসিত হয় এবং পরিশেষে আত্মতৃপ্তিসাধনেরও হেতু হয়।**

ভক্তির অনুশীলনের সারাংশ।

ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে মোটামুটি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। পরিশেষে তোমাদিগের প্রতি বক্তব্য এই যে, তোমরা অভিমান, অহঙ্কার প্রভৃতি যেগুলি মানুষের ব্যতিব্যস্ত অবস্থা আনয়ন করে, সেগুলি ত্যাগ ক'রে সর্ব্বাগ্রে শান্ত হ'তে চেষ্টা ক'রবে। দেখ জীবের ব্যতিব্যস্ত অবস্থাই মায়া; যিনি যতটা পরিমাণে তাঁর এই ব্যতিব্যস্ত অবস্থা কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন তিনি ততটা পরিমাণে মায়ামুক্ত। তোমরা সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া সর্ব্বদা তোমাদের স্বাভাবিক শান্তিকে বজায় রাখিতে চেষ্টা করিবে। ইতঃপূর্ব্বে এ বিষয়ে প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু আলোচনা করা হইয়াছে। তোমরা যে সমস্ত ভক্ত মহাপুরুষগণের কথা শুনিয়াছ, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রত্যেকেই সাধক-জনোচিত শান্তির আধার বিশেষ। বলিতে কি, তাঁদের প্রত্যেকেই যেন এক একটি আদর্শ শান্ত রতির ভৌতিক মূর্ত্তি একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভক্ত চরিত্র নানা প্রকার সদ্‌গুণ রাশীর আধারবশতঃ স্বভাবতঃই অতি শান্ত, শিষ্ট এবং সর্ব্বদাই সকলের নিকট বিনয়াবনত। তাঁদের স্নিগ্ধ ব্যবহার দেখিলেই মনে হয় তাঁরা যেন এ জগতের লোক নন। এই স্বভাবসিদ্ধ সরল, শান্ত ও স্নিগ্ধ চরিত্রই সাধারণ লোক হইতে তাঁদের বিশেষত্ব। বাস্তবিক, মানব যখন 'ভক্তির' আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন আপনা হ'তেই কোমল ও নত হ'য়ে পড়ে। একমাত্র এই ভক্তিই জীবের অহঙ্কার ও অভিমানকে নাশ করিতে সক্ষম; কারণ আত্মাভিমানী অহঙ্কারী

জীবের মাথা নীচু ক'রে দিয়ে 'তৃণাদপি সুনীচ' করিতে এমনটি আর দ্বিতীয় নাই।

যে সমস্ত সদ্‌গুণকে ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তি বলা হইল, সেইগুলি যাজন করিতে করিতে তোমরা ভক্তিরাজ্যের উন্নত মধুময় ভাবগুলির একটু একটু অনুভব পাইবে; ক্রমশঃ তোমাদের আত্ম-স্বরূপের উপলব্ধি হইবে এবং শ্রীভগবানে ও ভক্তে কি যে এক মধুরাদপি মধুর নিত্য সেব্য-সেবক সম্বন্ধ বর্ত্তমান, তখন তাহা বোধগম্য হইবে। ক্রমশঃ সেই প্রাণাধিক প্রিয়তম হৃদয়দেবতাকে ভালবাসিবার জন্য তোমাদের প্রাণটা এমন ভাবে ব্যাকুল হ'য়ে উঠবে—তাঁকে পাইবার জন্য এমনি একটা তীব্র উৎকণ্ঠা জেগে উঠবে—যে নিরন্তর ভক্তসঙ্গে শ্রীভগবানের গুণলীলা প্রসঙ্গ আলোচনা করা ভিন্ন অন্য কোন কিছুই ভাল লাগিবে না। শ্রীভগবানের জন্য ভক্তের এই যে ব্যাকুলতা—এই যে উৎকণ্ঠা—ইহা অবশ্য আধ্যাত্মিক মার্গে অনেক উপরের অবস্থা। যখন শ্রীভগবান্‌কে পাইবার জন্য ভক্তের প্রাণে এইরূপ সুতীব্র ব্যাকুলতা জাগে, তখন ভক্তের হৃদয়ে নানাবিধ উন্নত ভাবের তরঙ্গ উঠে। ভাব-রাজ্যের সেই সমস্ত অতি স্নিগ্ধ মধুর প্রাণস্পর্শী অবস্থা যে কিরূপ তাহা সাধারণ জীবকে বুঝাইবার জন্য পরম কারুণিক মনীষী ভক্তি-শাস্ত্রকারগণ যতদূর সম্ভব ক্রমানুসারে বিশ্লেষণ ও স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া শাস্ত্রগ্রন্থে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। আশাকরি, সাধু গুরু ও মহতের কৃপায় ক্রমশঃ তোমরা সেই সমস্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে।

তোমরা বিশেষ ক'রে মনে রাখিও যে, **একমাত্র 'ভক্তি'ই সাধককে সেই সমুন্নত অনুভবের রাজ্যে লইয়া যাইতে সক্ষম**। একদিকে 'ভক্ত' অন্যদিকে 'শ্রীভগবান্' মাঝে আছেন

কেবল এই 'ভক্তি'; এই উভয়ের মধ্যে ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এই ভক্তি দেবীই শ্রীভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলন করিয়ে দেন। বাস্তবিক, একমাত্র এই ভক্তিই ভক্তের জীবন-স্বরূপ একথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তোমরা যদি এই ভক্তি লাভ করিতে চাও, তবে ইহার অনুশীলনী বৃত্তিগুলি যাজন ক'রে প্রকৃত সাধকজীবন লাভ করিতে কৃতসঙ্কল্প হও। একথা বিশেষ ক'রে মনে রেখো যে, **সর্ব্বাগ্রে ইহার নীতিমূলক অনুশীলনগুলি আয়ত্ত না হইলে ভক্তির মধুময় ভাব কদাচ স্থায়ী হইতে পারে না**; তাই ইহার অনুশীলনগুলি সম্বন্ধে তোমাদিগকে এত বিশেষ ক'রে পুনঃ পুনঃ বলা হইল।

এখানে আরও একটি কথা তোমাদের আলোচ্য এবং বিশেষভাবে মনে রাখিবার দরকার। দেখ, 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'শ্রীভগবান্' এই তিনটি বস্তুর মধ্যে যে কোন একটি আর দুইটির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে অন্বিত; অর্থাৎ কোনটিকে অপর দুইটি হ'তে পৃথক করা যায় না। 'ভক্তি' অবশ্যই শ্রীভগবান্‌কে লইয়া; যদি শ্রীভগবান্‌কে বাদ দেওয়া যায় তবে 'ভক্ত' বা 'ভক্তি' ব'লে কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; যেহেতু 'কাহার ভক্ত'? বলিলে কোন উত্তর পাওয়া যায় না। ঐরূপ, 'ভক্ত' যদি না থাকে তবে কে কাহাকে ভক্তি করিবে? আর 'ভক্তি' যদি না থাকে তবে 'ভক্ত' ও 'শ্রীভগবানে' কোন সম্বন্ধই থাকে না। অতএব একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, 'ভক্তি', 'ভক্ত' ও 'শ্রীভগবান্' এই তিনে পরস্পরের সহিত এরূপ অবিচ্ছন্নভাবে অন্বিত যে, একটির কথা বলা মাত্রই অপর দুইটির অস্তিত্ব স্বতঃই মনোমধ্যে উদিত হ'য়ে থাকে।

সাধকজীবন ও ভক্তির অনুশীলনী বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা তোমাদিগকে বলা হইল, সেগুলি বিশেষ মনোযোগের সহিত তোমরা

স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও এবং যখনই সময় ও সুযোগ পাইবে, অবান্তর প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরস্পরে এই সমস্ত সৎ প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে পুনঃ পুনঃ আলোচনা করিবে। এই উপায়ের দ্বারা যদি তোমাদের সাধক জীবন গঠনোপযোগী একটু জ্ঞান লাভ হয় এবং শ্রীভগবানের চরণে যদি তোমাদের একটু নিষ্ঠা, ভক্তি ও রতি মতি লাভ হয় তবে এই সমস্ত প্রসঙ্গ আলোচনা করা সার্থক হইবে।

সাধকজীবন

ও

ভক্তিপথের অন্তরায়।

সাধকজীবন ও ভক্তিপথের অন্তরায়।

সাধকজীবনে ভক্তির অনুশীলনগুলি সম্বন্ধে অর্থাৎ যে সমস্ত মানবোচিত সদ্‌গুণ ভক্তিলাভের পক্ষে অনুকূল এবং মানবের নৈতিক চরিত্র যেগুলির সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত না হ'লে ভক্তির মধুময় ভাব মানবের হৃদয়ে স্থায়ী হয় না, সেই সদ্‌গুণগুলি সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। অতঃপর যে সমস্ত বিষয় সাধক ভক্তের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য অর্থাৎ যে সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণ সাধনপথের অন্তরায় এবং ভক্তিলাভের বিঘাতক, সাধকের পক্ষে অবশ্য পরিত্যজ্য সেই বিষয়গুলি সম্বন্ধে এস আমরা যথাসম্ভব আলোচনা করি।

ঘৃণা।

দেখ, ঘৃণা ও বিদ্বেষবোধ ভক্তিলাভের পথে বিশেষ অন্তরায়। জগতে কাহাকেও ঘৃণা বা তাচ্ছল্য করা উচিত নয়। বুদ্ধিভ্রংশ সকলেরই হ'তে পারে; প্রবৃত্তির বশে কে কখন কোন সূত্রে কুপথে চালিত হ'য়ে পড়ে, তাহা বলা যায় না। অতএব জ্ঞানাভিমানী হ'য়ে যেন কদাচ কাহাকেও অজ্ঞানী, অপবিত্র বা দুর্ব্বৃত্ত ব'লে ঘৃণা করিও না; কারণ তুমি যতই কেন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্ ও সচ্চরিত্র হও না, যে অজ্ঞানতার জন্য অথবা যে অসদাচরণের জন্য আজ তুমি একজনকে ঘৃণা করিতে চাহিতেছ কাল হয়তো দৈববশে মোহাভিভূত হ'য়ে তুমিই সেই কুকর্ম্মে রত হ'তে পার; কাজেই ঘৃণা করিবার ন্যায্য অধিকার কাহারও নাই। বিজ্ঞ, বহুদর্শী ও উদারচেতা মহাত্মাগণ বলেন,—কাহারও প্রমত্ত ও অজ্ঞান অবস্থায় তাকে ঘৃণা না ক'রে ভালবেসে তার ভুল সংশোধন করিয়া দিবার

চেষ্টা করা উচিত; তার হুঁস্ জাগিয়ে দিয়ে তাকে যে কোনও উপায়ে উন্নতির পথে চালিত ক'রে দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

সাধারণ লোকে অজ্ঞানতাবশতঃ অপরকে ঘৃণা ক'রে থাকে বটে, কিন্তু যাঁরা ভক্তিপথের পথিক, কাহাকেও নিন্দা বা ঘৃণা করা তাঁদের পক্ষে মোটেই শোভা পায় না। ভক্তিশাস্ত্রে বলা হইয়াছে জগতের যাবতীয় বস্তু বা ব্যক্তি সমস্তই শ্রীভগবানের শরীর; জগতের যাবতীয় বস্তু বিষয় সম্বন্ধে ভক্তকে যখন এইরূপ একটা অসাধারণ বোধ জাগিয়ে রাখতে হবে তখন ভক্ত কাহাকে ঘৃণা করিবে? সমস্তই শ্রীভগবানের শরীর' এই উন্নত বোধ এলে ঘৃণা বিদ্বেষ আপনা হ'তেই চলে যায়।

প্রশ্ন। আজকালকার অনেক সাধু সন্ন্যাসী বিষয়ী গৃহস্থ লোকদিগকে একপ্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকেন। গৃহস্থ বিষয়ী ব্যক্তিগণের উপর এরূপ একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করা কি তাঁহাদের উচিত?

উত্তর। তোমরা সত্যই বলিয়াছ, সন্ন্যাসাভিমানী কোন কোন ব্যক্তিকে দেখা যায় তাঁরা বিষয়ী গৃহস্থ লোকদিগকে ঠিক যেন শিয়াল কুকুরের মত ঘৃণা ক'রে থাকেন। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া তাঁরা ব'লে থাকেন,—'শাস্ত্র বিষয়ী গৃহস্থ লোকের সঙ্গ করিতে নিষেধ ক'রেছেন'। বেশ কথা, শাস্ত্রে বিষয়ীলোকের সঙ্গ ক'রতে নিষেধ করা হ'য়েছে, তাদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না ক'রলেই হ'ল; তা ব'লে তাদিগকে ঘৃণা করবার দরকার কি? বস্তুতঃ শাস্ত্রের মহৎ উদ্দেশ্য তা নয়; শাস্ত্রে যে বিষয়ী-সংসর্গ নিষেধ করা হ'য়েছে, তাহার কারণ এই যে, বিষয়ী গৃহস্থগণ যেরূপ সর্ব্বদা বৈষয়িক ভোগসুখে রত থাকে, সেরূপ অত্যধিক ভোগাভিনিবেশ হ'লে সাধকের চিত্তমালিন্য ঘটিতে পারে, ভগবদ্ভাবাবেশ মন্দীভূত হ'য়ে যেতে পারে, তাই অত্যধিক ভোগাভি-নিবেশকে লক্ষ্য ক'রে শাস্ত্র বিষয়ীসঙ্গ নিষেধ ক'রেছেন; তাই ব'লে

বিষয়ী গৃহস্থ লোকদিগকে ঘৃণা ক'রতে বলা হয় নাই। সাধক ভক্তের পক্ষে প্রথম অবস্থায় বিষয়ী ব্যক্তির সঙ্গ বর্জ্জনীয় হ'তে পারে বটে, তাই ব'লে বিষয়ী ব্যক্তি কদাচ ঘৃণার্হ নহে। সঙ্গ না করা এবং ঘৃণার ভাব পোষণ করা এ দুইএর মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। যাঁরা সাধন-পথের পথিক তাঁদের জ্ঞানটা সর্ব্বদা তত্ত্বে ধারণা ক'রে রাখতে হবে। দেখ, সাধু. অসাধু, গৃহস্থ, সন্ন্যাসী, বিষয়ী, বৈরাগী সবই শ্রীভগবানের সৃষ্টির এক একটি অভিনব বৈচিত্র; এই তত্ত্বে জ্ঞানের ধারণা করিয়া অর্থাৎ ইহা সম্যক্ প্রকারে বোধগম্য করিয়া তাঁহাকে অর্থাৎ শ্রীভগবান্‌কে বহুত্বে আস্বাদন করিতে হইবে। অতএব কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র ঘৃণার ভাব পোষণ করা নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

আরও দেখ, কাহারও প্রতি এই প্রকার অযথা বিদ্বেষভাব পোষণ করায় একটা ভয়ানক কুফল ফলে। মনে কর, তুমি একজন নিষ্ঠাবান্ ব্রহ্মচারী; পাছে তোমার ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয়—তোমার সাধনার ব্যাঘাত হয়—তাই হয়তো তুমি নারী জাতির প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাব পোষণ ক'রে থাক; এমন কি, স্ত্রীলোকের নাম শুনিবামাত্র অথবা স্ত্রীলোক দেখিলেই একটা বিজাতীয় ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত কর; কিন্তু জেনে রেখো, একথা অবশ্যই সত্য যে, যদি তুমি মনে মনে স্ত্রীলোকের প্রতি এইরূপ ঘৃণা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে থাক, তবেকোন না কোন সময়ে তোমাকে ঐ স্ত্রীলোকের পাল্লায় প'ড়ে হাবুডুবু খেতে হবে। কেন জান? স্ত্রীলোকের প্রতি বিদ্বেষভাবই তোমার মনের ভিতর তার একটা সংস্কার জন্মাইয়া দিতেছে। মনস্তত্ত্বের সূক্ষ্ম রহস্যবিদ্ পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন যে, যদি আমরা কাহারও প্রতি একটা সুতীব্র বিদ্বেষভাব পোষণ করি, আমাদের অজ্ঞাতসারে তাহার সহিত আমাদের একটা সম্বন্ধ-বন্ধনের সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অতএব দেখ, যে বিষয়ের জন্য তুমি

অপরকে ঘৃণা করিতে চাও, ঠিক সেই বিষয়ের জন্য তুমিই আবার অপরের ঘৃণার পাত্র হইয়া পড়িতে পার।

প্রীতি-ভালবাসার দ্বারা যেমন দুই ব্যক্তির মধ্যে একটা মধুর সম্বন্ধের বন্ধন স্থাপিত হয়, ঘৃণা-বিদ্বেষের দ্বারাও ঠিক সেইরূপ একটা প্রতিকূল অর্থাৎ বিরুদ্ধ ভাব-বন্ধনের সংস্কার জন্মিয়া থাকে। অতএব কাহাকেও ঘৃণা করা যে কোন মতেই উচিত নয় একথা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অজ্ঞানতানিবন্ধন মানুষের ভ্রম-প্রমাদ হওয়া নিতান্ত অস্বাভাবিক নয়; মানুষের ভুল ভ্রান্তি তো সর্ব্বদাই হ'য়ে থাকে। যদি ভ্রমবশতঃ কেহ কখন কোন সাধুজনবিগর্হিত নিন্দনীয় কর্ম্মের আচরণ করেই ফেলেন, তাই ব'লে, জ্ঞানবানের পক্ষে তজ্জন্য তাঁকে ঘৃণা করা কখনই শোভনীয় হ'তে পারে না। নিষিদ্ধ আচরণকারী অজ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানবানের করুণার পাত্র; কদাচ ঘৃণার পাত্র নহেন। ভক্তিশাস্ত্র বলেন,—'জীব মাত্রই নিত্য শ্রীভগবদ্দাস', ইহাই জীবের স্বরূপ। তাহাই যদি হইল, তবে দোষীই হউক আর নির্দ্দোষীই হউক্ জীব কখন তার স্বরূপ-তত্ত্ব অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের নিত্য দাস' এই তত্ত্ব হইতে বিচ্যুত হয় না; কেবল মায়া কর্ত্তৃক একটা অজ্ঞানতা বা মোহের আবরণে প'ড়ে কখন কখন নিন্দনীয় আচরণ করিয়া ফেলে এবং দিন কতক সাধারণ লোকচক্ষে নিন্দার পাত্র ব'লে বিবেচিত হয় মাত্র। মনে কর, 'হরিহর' নামে একজন লোক আছে; সে কিছুদিন জ্বর-বিকারে ভুগিবার পর তার হৃত স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইল। যে 'হরিহর', সেই 'হরিহর'ই রহিল, মাঝে দিন কতক না হয় তার জ্বর-বিকার হ'য়েছিল। ঠিক সেইরূপ 'নিত্য শ্রীভগবদ্দাস' জীব নিত্যই তাঁর দাস আছে, ছিল এবং থাকিবে; মাঝে না হয় মায়ার ঘোরে প'ড়ে একটা অন্যায় কাজ ক'রে দিনকতক কষ্ট ভোগ করে মাত্র।

আরও দেখ, ঘৃণা করা মানুষের কতদূর অপূর্ণতার পরিচায়ক! যে

মানুষ তারই মত আর একজন মানুষকে অস্পৃশ্য ও অশুচী ব'লে ঘৃণা করে, কি করিয়া তার সাধকোচিত চরিত্র—তার মনুষ্যত্ব—অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে? মানুষ হ'য়ে আর একজন মানুষকে 'দূর্ দূর্' ক'রে ঘৃণা ক'রতে লজ্জা হয় না? তোমার খাবার সময় পাতের কাছে যদি একটা বিড়াল এসে বসে, কই তাকে তো তুমি তত ঘৃণা করণা? আর, একটা মানুষ যদি আসে, তবেই যত দোষ হ'ল! মানুষ কি পশুরও অধম?

যে সমস্ত সাধুজনবিগর্হিত কার্য্য, প্রবৃত্তি এবং সঙ্গ ভক্তি-পথের অন্তরায়, সাধকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রথম অবস্থায় সর্ব্বদা সেই সমস্ত কার্য্য, প্রবৃত্তি এবং সঙ্গ হইতে দূরে থাকিবেন এবং ঐ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা হইতে সর্ব্বদা নিজ নিজ ভক্তিভাবকে বাঁচাইয়া রাখিবেন অর্থাৎ নিজের ভক্তিভাবের বিঘাতক বিজাতীয় সঙ্গাদি অবশ্য বর্জ্জন করিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া যতই গর্হিতকর্ম্মী হউক্ না কেন, কাহারও প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব পোষণ করিতে পারিবেন না। তোমার চারা গাছটি বেড়া দিয়া রাখিতে পার কিন্তু একটা ছাগ বা গাভী—যারা অজ্ঞ পশু বৈ নয়—যদি দৈবাৎ তোমার অসাবধানতার ফলে তোমার চারা গাছটি নষ্ট করিয়া ফেলে, তবে তাদের উপর তুমি কোন মতেই রাগ অথবা ঘৃণা করিতে পার না। সেইরূপ তোমাদের ভক্তিভাবগুলি যতদিন সুদৃঢ় না হয়, ততদিন তোমরা অসৎসঙ্গ হইতে অবশ্যই দূরে থাকিবে; একবার ভাব দৃঢ় হইলে পর আর সাধনপথ হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা থাকিবে না। চারাগাছ বড় হ'লে তখন বেড়া খুলে দিলেও আর কোনরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিবে না।

দেখ, লোকচরিত্র-অভিজ্ঞ বহুদর্শী মহাপুরুষগণ কাহাকেও ঘৃণা করেন না। প্রবৃত্তির তাড়নায় ইতস্ততঃ ভ্রাম্যমান্ জীবের দুর্দ্দশা দেখে তাঁদের কাতর প্রাণে করুণার সঞ্চার হয়; সেই করুণায় জগৎ স্নিগ্ধ

হয়, পাপীর পাপপ্রবৃত্তি মহাপুরুষগণের করুণায় এবং প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে বিদূরিত হইয়া যায়। তাঁদের করুণার শক্তিতে—তাঁদের মহান্ আদর্শে—জীব পাপপথ পরিত্যাগ ক'রে সৎপথে—পুণ্যের ও ধর্ম্মের পথে—আসিতে বাধ্য হয়; বাস্তবিক ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের এমনি অদ্ভুত ক্ষমতা।

মোট কথা, তোমরা জানিয়া রাখিও যে, ঘৃণা করিবার জন্য জগতে কোন কিছুই সৃষ্ট হয় নাই; সবেরই দেশ কাল ও পাত্রানুযায়ী প্রয়োজনীয়তা থাকিতে পারে। তবে যে সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণ ও প্রতিকূল সঙ্গাদি ভক্তিপথের বাধক, সেইগুলি হইতে সর্ব্বদা সাবধান থাকিলেই হইল। তাই বলি, পাপী বা দোষী ব্যক্তিকে কদাচ ঘৃণা করিও না; পাপকার্য্য অথবা পাপপ্রবৃত্তি ঘৃণার্হ হইতে পারে বটে, কিন্তু পাপীর প্রতি ঘৃণা বা বিদ্বেষ ভাবের পরিবর্ত্তে করুণা ও ভালবাসার ভাব পোষণ ও প্রদর্শন করাই সকলের উচিত। বিপথগামী পুত্রের প্রতি পিতার ঘৃণা হয় না, বরং পিতার প্রাণ তারই জন্য সমধিক কাতর হয় এবং তাকে ভালবেসে সৎপথে ফিরিয়ে আনতে তিনি সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকেন, একথা বোধ হয় তোমরা সহজেই বুঝিতে পার।

পরনিন্দা, দোষদর্শন ও মহৎ-অপরাধ।

দেখ, তোমরা কখন পরনিন্দা করিও না। যাঁহারা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইতে চান, তাঁহারা এ বিষয়ে খুব সাবধান হইবেন। পরকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি সাধনপথে একটি প্রবল অন্তরায়। নিন্দুক আর দোষদর্শীর মত সর্ব্বনাশকারী জীব আর নাই। সাধকদিগের মধ্যে যাঁহারা পরনিন্দা করেন এবং যাঁহাদের দোষদর্শী স্বভাব থাকে, তাঁহারা

কখনই আধ্যাত্মিক রাজ্যের কোন উন্নত অনুভব পাইতে পারেন না। তাঁদিগকে জোর ক'রে ব'লে দেওয়া যেতে পারে যে, সাধন ভজন ক'রে তাঁদের কিছু হবে না। বলিতে কি, নিন্দুক ও দোষদর্শী লোকের আধ্যাত্মিক রাজ্যে অর্থাৎ ভক্তিপথে মোটেই প্রবেশাধিকার নাই বলিলেও চলে। অতএব তোমরা দোষদর্শী হ'য়ে দোষী ব্যক্তি সম্বন্ধে কদাচ আলোচনা করিও না। যদি নিরপেক্ষভাবে একটু যুক্তির ভিতর দিয়া এই বিষয়টি আমরা আলোচনা করি, তবে আমরা বেশ বুঝিতে পারিব যে, যাকে আমরা দোষী ব'লে সাব্যস্ত করি, প্রকৃতপক্ষে তার কোন দোষ দেওয়া যেতে পারে না ; যেহেতু শ্রীভগবানের বিক্ষেপিকা শক্তি মায়া তাহাকে মোহাভিভূত এবং যথেচ্ছ পরিচালিত ক'রে তাকে ঐরূপ নিন্দনীয়, দোষজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়েছে। এমনও তো হ'তে পারে যে, কালে মায়ার ফেরে প'ড়ে মোহবশতঃ আমরাও ঐরূপ গর্হিত কার্য্যে লিপ্ত হ'তে পারি। তাই বলি, দোষজনক কার্য্যের উল্লেখ করিয়া কোন কৃতাপরাধী ব্যক্তিকে নিন্দা করিও না। বরং তৎকৃত ঐ নিন্দনীয় কার্য্যের কুফল সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া নিজেরা সতর্ক হইতে পার।

এমন অনেক লোক আছেন যাঁদের নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি এত বেশী যে, সাধারণ লোকের কথা দূরে থাকুক তাঁরা মহৎ ব্যক্তিগণকেও নিন্দা করিতে, এমন কি, তাঁদের আদর্শ চরিত্রের উপরে কটাক্ষ করিতে ছাড়েন না। তাঁদের এই পরনিন্দাপ্রবৃত্তি দেখিয়া মনে হয়, পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা যেন তাঁদের বড় মুখরোচক। যে সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণ তাঁরা নিজে করিতে কুণ্ঠিত হন না, ঠিক সেই সব কার্য্যের জন্যই অপরের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত ক'রে থাকেন। বাস্তবিক, যে কোন কারণেই হউক্ অপরকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি বড়ই দোষাবহ।

তোমরা ভক্তিপথের পথিক, ভক্তিশাস্ত্রগুলি আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, সাধু, সজ্জন ও মহৎ ব্যক্তিগণের নিন্দা করিলে 'মহৎ-অপরাধ' সঞ্চিত হয়। এই মহৎ-অপরাধ ভক্তিপথের একটি মারাত্মক প্রতিবন্ধক; সাধক ভক্তের সরস, স্নিগ্ধ ও ভক্তিভাবপূর্ণ প্রাণকে শুষ্ক ও নীরস করিয়া দিতে এমনটি আর দ্বিতীয় নাই। তাই তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া বলিতেছি যে, তোমরা যেন কখনও মহৎ ব্যক্তির নিন্দা করিয়া মহৎ-অপরাধ সঞ্চয় করিও না। কথাবার্ত্তায় প্রসঙ্গক্রমে যদি কখন সাধু গুরু বা মহতের নিন্দা শ্রুত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ সে স্থান ত্যাগ করিবে; তাহাতে যদি ব্যবহারিক হিসাবে কোন ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, তবে অগত্যা উপেক্ষা বুদ্ধি ক'রে নীরব থাকিবে; নিতান্ত অসহ্য বোধ হইলে অবশ্যই সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

দেখ, মহৎ-অপরাধের অর্থাৎ মহৎ ব্যক্তির অযথা নিন্দায় দুই প্রকার কুফল ফলে। প্রথমতঃ, সাধারণ জীবের পক্ষে, তাহাদের পূর্ব্ব-সঞ্চিত পূণ্যকর্ম্মজনিত যে সমস্ত সুখভোগ নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সমস্ত ভোগ নষ্ট হইয়া যায়। আর দ্বিতীয়তঃ, সাধক ভক্তের পক্ষে, তাঁহাদের সাধন-লব্ধ সমুন্নত ভক্তির মধুময় ভাবগুলি নষ্ট হইয়া যায়। সাধু মহতের নিন্দা করিলে সাধক আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রাণস্পর্শী সুমধুর ভাবগুলির অনুভবে বঞ্চিত হন। সাধক ভক্ত নিজে নিজে স্পষ্টই বুঝিতে পারিবেন যে, তাঁর যে হৃদয় ভগবদ্ভক্তির অতি স্নিগ্ধ ও মধুর ভাবাবেশে নিরন্তর গর গর ও আনন্দোৎফুল্ল থাকিত, দৈব দুর্ব্বিপাকে যদি কখন কোন সাধু বা মহৎব্যক্তির অযথা নিন্দাবাদের দ্বারা তাঁর জিহ্বা কলুষিত হয়, যদি তিনি কোন মহতের প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁর চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তবে তাঁর সেই সরস স্নিগ্ধ

ভক্তিভাবপূর্ণ হৃদয় একেবারে শুষ্ক হইয়া যাইবে; তখন তাঁর ভাব-বিহীন প্রাণটা যেন তৃষিত মরুভূমির মত নীরস ও খাঁ খাঁ করিতে থাকিবে। শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপায় সাধক ভক্তের হৃদয় কত উন্নত মধুময় ভাবসম্পত্তিতে সমৃদ্ধ হয়; যদি মহৎ-অপরাধের দ্বারা সাধকের চিত্ত হ'তে সেই ভাবসম্পত্তি বিনষ্ট হয়, সাধক যদি যাবতীয় শ্রেয়ঃ এবং ভক্তিধনে বঞ্চিত হন তবে তাহার তুল্য দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? অতএব যাহাতে ভ্রমক্রমেও কোন সাধু মহতের নিন্দা বা অপবাদ না করিয়া ফেল, সে বিষয়ে তোমরা বিশেষ সাবধান থাকিও, যেহেতু মহতের নিন্দা অতি গুরুতর অপরাধ। এ বিষয়ে ভক্তি-শাস্ত্র সাধকদিগকে সাধনপথে সাবধান করিয়া দিবার জন্য বলিতেছেন,—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মঃ লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

আরও দেখ, শ্রীভগবান্ জীবের সকল দোষ—সকল অন্যায়—সহ্য করিয়া থাকেন কিন্তু এই 'মহৎ-অপরাধ' সহ্য করিতে পারেন না। তাঁর কাছে অপরাধ কর, এমন কি, তাঁর উদ্দেশে দুর্ব্বাক্য ব'লে তাঁর নিন্দা কর, তাতে তাঁর সাম্যভাবের ব্যতিক্রম হইবে না; কিন্তু তাঁর ভক্তের কাছে অপরাধ করিলে অর্থাৎ তাঁর ভক্তজনের অযথা নিন্দা করিলে তিনি তাহা সহ্য করিবেন না। এ কথার প্রমাণ তাঁর অবতার-লীলার ভিতর দিয়া অনেক স্থলে আমরা দেখিতে পাই। আমার মনে হয়, তাই বোধ হয়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তিনি নিজেই স্বীকার ক'রেছেন,—"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্ব্বৃত্তদিগের অত্যাচার উৎপীড়ন হইতে সাধুদিগের পরিত্রাণের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন। আপনার কথায় বুঝিলাম, পরনিন্দা করা—বিশেষতঃ মহতের নিন্দা করা—ভক্তিপথের একান্ত বিরোধী; কিন্তু যদি কোন পরনিন্দাপরায়ণ ব্যক্তি আমাদের নিকট কোন সাধু গুরু বা মহতের অযথা নিন্দাবাদ করিতে থাকেন, তবে কি উপায়ে তাঁকে নিরস্ত করা যায়? এমন কি কোন উপায় নাই যাহার দ্বারা তাঁহাকে মহতের নিন্দাবাদ হ'তে নিরস্ত ক'রে দিয়ে তাঁর নিন্দুক স্বভাবের পরিবর্ত্তন ক'রে দেওয়া যায়?

উত্তর। দেখ, অপরের অযথা নিন্দা করা—কেবল পরের দোষ দর্শন করা—যাঁদের স্বভাব দাঁড়িয়ে গেছে, সহজে তাঁহাদের সেই ঘৃণিত প্রবৃত্তির পরিবর্ত্তন করান যায় না। তবে একটা উপায় অবলম্বন করিলে, আমার মনে হয়, এ বিষয়ে কতকটা কৃতকার্য্য হওয়া যায়। অজ্ঞানতানিবন্ধনই মানুষ যে মহতের নিন্দা ক'রে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিন্দুক ব্যক্তিকে যদি যুক্তিদ্বারা এ বিষয়ে একটু জ্ঞান দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায়, তবে বোধ হয় তাঁর ঐ কুপ্রবৃত্তি আপনা হ'তেই ক্রমশঃ হ্রাস হ'য়ে যেতে পারে। যদি তোমাদের কাছে কেহ কোন সাধু ভক্তের বা কোন মহাপুরুষের নিন্দা করেন এবং তাঁর মহৎ চরিত্রে একটা অযথা কলঙ্ক আরোপ ক'রে, তাঁর প্রতি তোমাদের বহুদিবস হ'তে সঞ্জাত শ্রদ্ধা ও ভক্তি বিচলিত করিতে চেষ্টা করেন তবে তাঁহাকে প্রথমে এইরূপ কথা বলিবার পদ্ধতি অবলম্বন ক'রে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিবে; যথা,—"দেখুন, জীবমাত্রেই দোষে গুণে জড়িত; এ জগতে সম্পূর্ণ দোষমুক্ত কেহই নাই। যাঁদের দোষাংশ অতি অল্প এবং গুণাংশ খুব বেশী তাঁহাদিগকেই আমরা সাধু, মহৎ বা মহাপুরুষ ব'লে থাকি। অতএব আপনি যা ব'লছেন অর্থাৎ তাঁর চরিত্রে আপনি যে দোষারোপটি ক'রছেন সেটা হয়তো আপনি ঠিকই

অনুমান ক'রেছেন। তবে, কি জানেন, জীবমাত্রেই যখন দোষে গুণে জড়িত, আর তিনিও যখন একটি জীব, তখন দুটো একটা দোষ তাঁতে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। আর, তাঁতে ঐ দুই একটি দোষ আছে ব'লেই তো তিনি এই জীবজগতে আমাদের সঙ্গে মিলে মিশে প'ড়ে আছেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে মিশে তাঁর মুখে দুটো মিষ্ট কথা—ভক্তি ও ভগবৎকথা—শুনে আমাদের তাপিত প্রাণ শীতল ক'রতে পারছি—আমাদের তৃষিত প্রাণে একটু শান্তি অনুভব ক'রতে পারছি। তা যদি না হইত অর্থাৎ তাঁতে যদি একটুও দোষ না থাকিত, তবে তো তিনি আমাদের মত 'জীব' হ'য়ে এ জগতে আর প'ড়ে থাকতেন না; যেহেতু সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত হ'য়ে গেলেই তিনি মুক্তপুরুষ 'শিব' হ'য়ে এ জগৎ থেকে চ'লে যেতেন; তা হ'লে আমরা তাঁর সঙ্গলাভও করিতে পারিতাম না, আর তাঁর কাছে দুটো মধুমাখা ভগবৎকথা শুনে প্রাণ জুড়াতেও পারিতাম না। অতএব তাঁতে যে দোষের কথা আপনি ব'লছেন, ভেবে দেখুন, এক হিসাবে আমাদের ভালর জন্যই হয়তো সেই দোষটুকু তাঁতে র'য়েছে।"

সাধু ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষগণের সঙ্গলাভ, তাঁদের নিকট হ'তে সদুপদেশ গ্রহণ ও তাঁদের শ্রীমুখে শ্রীভগবানের গুণলীলাসূচক সুমধুর ভক্তিকথা শ্রবণ যখন আমাদের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তখন মহৎ ব্যক্তির চরিত্রে অযথা দোষারোপ ক'রে তীব্র সমালোচনা করা ও নিন্দা করা আমাদের পক্ষে কোন মতেই শোভা পায় না। আরও এক কথা এই যে, মহৎ ব্যক্তিগণ কখন কি ভাবে চলেন, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র-বুদ্ধিতে ঠিক ঠিক বোধগম্য করিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। শাস্ত্রই এ বিষয়ে ব'লেছেন,—"মহতের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়", "তেজীয়সাং ন দোষায়" ইত্যাদি।

অন্য পক্ষে, আবার দেখ, শ্রীভগবান্‌কে আমরা 'পতিতপাবন' ব'লে থাকি; আর, যদি আমরা আপন আপন বুকে হাত দিয়ে, সত্যের অপলাপ না ক'রে, মনে মনে চিন্তা ক'রে দেখি, তবে আমাদের মধ্যে কেহই এমন কথা বলিতে পারিব না যে, 'আমরা কখন নীতিমার্গ হ'তে পদস্খলিত হই নাই' অর্থাৎ কখন কোন নিষিদ্ধ আচরণে ন্যায়-পথ—ধর্ম্ম পথ—হ'তে 'পতিত' হই নাই। তবেই দেখ, তাঁর 'পতিত-পাবন' নামের সার্থকতার জন্য তাঁরই ইচ্ছায় আমাদের দুটো একটা দোষে 'পতিত' হওয়া বিচিত্র নয়। তাই বলিতেছিলাম—দোষে গুণে 'জীব' আর দোষ মুক্ত 'শিব'—এই কথাটি ঠিক ঠিক বুঝিলে আর কোন গণ্ডগোলই থাকে না; কাহারও কোন দোষ দেখিলেও তাঁকে নিন্দা করিবার প্রবৃত্তি আমাদের আপনা হ'তেই ক'মে যায়। তোমরা প্রয়োজন হইলে, এইরূপ কথা বলিবার পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া বিনীতভাবে মহতের নিন্দাকারীর নিন্দাবাদ প্রবৃত্তিকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিবে।

পরিশেষে এই কথাটি তোমাদিগকে বলিতেছি যে.—পরনিন্দা ত্যাগ করা সকলেরই—বিশেষতঃ সাধক ভক্তের পক্ষে—অবশ্য কর্ত্তব্য; যেহেতু এটি বৈষ্ণবতার একটি প্রধান অঙ্গ। বৈষ্ণব শাস্ত্রগ্রন্থ দশবিধ 'নামাপরাধ' প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছেন, সাধকশ্রেণীভুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে 'সৎ সকলের নিন্দা' সর্ব্বথা বর্জ্জন করিবেন। তোমরা যদি কেবল পরনিন্দা পরচর্চ্চা এবং মহৎ চরিত্রের অযথা বিরুদ্ধ সমালোচনা ত্যাগ করিতে চেষ্টা কর, তবে দেখিতে পাইবে যে, সাধনপথে অগ্রসর হইবার জন্য তোমরা প্রভূত শক্তি পাইবে। অতএব আমার আদেশ—তোমরা সর্ব্বাগ্রে পরনিন্দা ত্যাগ করিতে সচেষ্ট হও এবং মনে রেখো ইহা 'গুরুবাক্য'।

কপটতা

সাধন পথে আর একটি অন্তরায় কপটতা। যাঁরা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁরা নিজেদের ব্যবহারে, কথায় এবং কাজে সর্ব্বথা এই কপটতা বর্জ্জন করিতে যত্নবান হইবেন। দেখ, আজকাল আধ্যাত্মিকতায়ও কপটতা এসে পড়েছে। আমরা ব্যবহারিক জগতে সচরাচর যে সমস্ত অসরলতা, কুটিলতা ও মিথ্যা ব্যবহার ক'রে আস্‌ছি, এমনি সময় পড়েছে যে, আধ্যাত্মিক পথে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণেও আমরা ঐ সমস্ত কপট ও মিথ্যা ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হই না। যে দিকে চাই দেখি যেন কেবল কপটতা দিয়ে জগৎটা ছেয়ে ফেলেছে; সরলতা নাই বলিলেই হয়; ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি উন্নত ধর্ম্মভাব কি ক'রে থাকবে বলতো? এই সব কপটতা, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনা প্রভৃতি হ'তে তোমরা খুব সাবধান থাকিবে; তোমাদের যেটুকু আধ্যাত্মিকতা আছে অর্থাৎ তোমরা যতটুকু সাধন ভজন কর এবং যতটুকু সৎসঙ্গ ও সৎ বিষয়ে চর্চ্চা প্রভৃতি ভক্তির অনুশীলন কর, তার ভিতর যেন কপটতা মিশিও না; নিজেদের আধ্যাত্মিকতাকে কপটতার হাত থেকে সর্ব্বদা বাঁচিয়ে চ'লবে। ব্যবহারিক জগতেও কপটতা অবলম্বন চরিত্রের যথেষ্ট অবনতির লক্ষণ; তথাপি যদি কখন কোন অনিবার্য্য কারণে ব্যবহারিক জগতে বৈষয়িক অথবা সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত একটু আধটু কপটতা এসে পড়ে পড়ুক, তাতে বড় বেশী ক্ষতি হবে না; কেননা সেটুকু দুদিনে শুধ্‌রে যাবে। কিন্তু আধ্যাত্মিকতায় অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে বিন্দুমাত্র কপটতা এলে সবই ভস্মে ঘি ঢালা হবে; যেহেতু এটা এ পথের প্রবল প্রতিবন্ধক।

দেখ, একটু মনোনিবেশ সহকারে চিন্তা ক'রে দেখলে তোমরা বেশ বুঝিতে পারিবে যে, বর্ত্তমানে কেবল মিথ্যা কপটতা প্রভৃতি দ্বারাই যেন যাবতীয় জগৎব্যাপার চ'লে আসছে। কিন্তু এইগুলির বিপরীতগুলির দ্বারা অর্থাৎ সত্যের দ্বারা, সরলতার দ্বারা, জগৎ সুশৃঙ্খলে চ'লতে পারে কি না—এটা ভেবে দেখবার সময় আসছে। আমার মনে হয়, সত্য, সরলতা প্রভৃতি ন্যায়পথ অবলম্বনের দ্বারাই জগৎব্যাপার বেশ সুন্দর ভাবেই চলিতে পারে; কপটতা ও মিথ্যাচরণ করিবার কোনই দরকার হয় না। যদি আমরা প্রত্যেকে বর্ত্তমানের অবলম্বিত নীতিবিরুদ্ধ পদ্ধতিগুলির বিপরীতগুলি অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করি, তবে জগতের এই অশান্তি, হাহাকার, দুঃখকষ্ট সব দূর হ'তে পারে এবং অচিরে জীবের শান্তি ও আনন্দ পুনরায় ফিরে আসতে পারে।

সাধনপথে এসে, সৎসঙ্গ ক'রে, যদি মানুষের সহিত ব্যবহার ক'রতে না শিখে থাক, তবে তোমার সাধন ভজন সবই বৃথা। প্রবৃত্তির বশে দৈবাৎ যদি কখন তোমরা কোন সাধুজনবিগর্হিত কার্য্য করিয়া ফেল, তাতে কিছু এসে যাবে না; অকপটে তাহা ব্যক্ত করিবে। লোকাপেক্ষা ক'রে মিথ্যা ও কপটতার প্রশ্রয় দিয়ে কদাচ ব্যবহারের সততা নষ্ট করিও না। এটা স্থির জেনে রেখো যে, যতদিন না আমাদের হৃদয়নিহিত এই কপটতার কবাট সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত হ'য়ে যাবে, ততদিন আধ্যাত্মিক রাজ্যের উন্নত ও মধুময় ভাবগুলি আমরা কিছুতেই আস্বাদন করিতে সমর্থ হইব না। অনেক সময় লোকাপেক্ষাই কপটতার জনক হ'য়ে থাকে, কিন্তু সাধনপথে অগ্রসর হ'তে হ'লে সেই লোকাপেক্ষা সর্ব্বথা বর্জ্জন করিতে হইবে; কপটতা ত্যাগ ক'রে সম্পূর্ণ সরল হইতে হইবে। আরও দেখ, যিনি

কপট, যিনি লোকের সহিত সরল ব্যবহার করিতে চাহেন না, তাঁর মন সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ; তিনি কি ক'রে ধর্ম্মপথে অগ্রসর হইবেন? যেহেতু তিনি সদাই সতর্ক থাকেন পাছে তাঁর মিথ্যাচরণ ও কপট ব্যবহার অন্যের নিকট প্রকাশ হ'য়ে পড়ে। সর্ব্বদা সন্দেহাকুলচিত্ত ব্যক্তির জীবন বাস্তবিকই বড় দুর্ব্বহ; যেহেতু তিনি মানবাত্মার উন্নতিকারক কোন নীতি বা ধর্ম্মকথায় সরলভাবে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন না। কাজেই কপটাচারী ব্যক্তি সরলবিশ্বাসী সাধু-প্রকৃতি ব্যক্তির অনুভূত সাত্বিক আত্মপ্রসন্নতা লাভে বঞ্চিত হন। ইতঃপূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ, একমাত্র বালকোচিত সরলতাই অনেক সাধু মহাত্মার ঈশ্বরাভিনিবেশের হেতু। ঈশ্বরবিশ্বাসী সরলান্তঃকরণ সাধু ব্যক্তিগণের হৃদয় কত নির্ম্মল এবং উন্নত! শ্রীভগবানের গুণ-লীলাসূচক সুমধুর ভক্তিকথাগুলি সরল বিশ্বাসে নিজ নিজ হৃদয়ে ধারণা করিয়া তাঁহারা যে নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন, কপটাচারী ব্যক্তির সদা সন্দেহাকুল নীচ অন্তঃকরণে সে আনন্দ লাভের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব যদি ভক্তি লাভ করিতে চাও তবে কপটতা পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সরল হইতে চেষ্টা কর।

উত্তেজনা।

দেখ, মানবাত্মার স্বাভাবিক অবস্থা শান্ত ও অচঞ্চল। এই শান্ত প্রকৃতিই ভক্তিলাভের পক্ষে অনুকূল; কাজেই যে কোন প্রকার উত্তেজনা অর্থাৎ অস্বাভাবিক চঞ্চলতা ও ব্যতিব্যস্ততা ভক্তিপথের নিতান্ত বিরোধী। অতএব উত্তেজনা মাত্রই সাধকের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য। তোমরা ভক্তিপথের পথিক; মনে রাখ, তোমাদিগকে

ধর্ম্মপথে এগুতে হবে—ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি আধ্যাত্মিক রাজ্যের সমুন্নত মনোরম বৃত্তিগুলির মাধুর্য্য উপলব্ধি ও আস্বাদন করিতে হইবে। চিত্তের স্বাভাবিক শান্ত অবস্থাই যখন সেই ভক্তি লাভের পক্ষে অনুকূল, তখন যে সমস্ত বিষয় ভক্তিপথের অন্তরায়, সেগুলি যে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ ক'রে চিত্তের শান্ত অবস্থা বজায় রাখিতে হইবে, একথা সহজেই অনুমেয়। অতএব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে ক্ষুব্ধ হ'য়ে অনর্থক চিত্তচাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিও না। রোগ শোক, সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ প্রভৃতি মানবজীবনের অবশ্যম্ভাবী ঘটনাগুলির দ্বারা যাহাতে চিত্তের কোনরূপ উত্তেজনা ও ব্যতিব্যস্ততা না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। মনে কর, কোন ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃই হউক্ অথবা ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক্, তোমার কোন স্বার্থহানি বা অনিষ্টচেষ্টা ক'রছে; তাতে সেই লোকটির উপর তোমার একটা ক্রোধ ও বিরক্তির ভাব এসে তোমার হৃদয়ে হয়তো একটা উত্তেজনার সৃষ্টি ক'রতে পারে; এই সামান্য একটু উত্তেজনা হয়তো ছ'মাস ধ'রে তোমায় সাধনপথে মনোনিবেশের পক্ষে বাধা দিতে পারে; এমন কি, বহুদিন পর্য্যন্ত তোমার ভক্তিপথের প্রবল প্রতিবন্ধকস্বরূপ হ'য়ে থাকতে পারে। কাজেই একটু স্বার্থহানি হয় হ'ক্, অনিষ্ট হয় হ'ক্, তথাপি সেই অনিষ্টকারীর প্রতি অসূয়া প্রকাশ ক'রে চিত্তের চঞ্চলতা আনয়ন করা যুক্তিযুক্ত নহে। এরূপ ক্ষেত্রে সাধক ভক্তের কর্ত্তব্য কি তা জান? এর সিদ্ধান্ত এই যে, যিনি অন্যায় ভাবে তোমার উপর দোষারোপ ক'রছেন বা তোমার অনিষ্ট চেষ্টা ক'রছেন, আগে তাঁকে বেশ মিষ্ট কথায় বিনীতভাবে তোমার নির্দ্দোষিতার কথা জানাবে। তাতে যদি কোন ফলোদয় না হয়, আর যদি তোমার একটু স্বার্থ ত্যাগ ক'রলে বিরোধের নিষ্পত্তি

হয়, তবে তাও করিবে, এবং যদি কিছুতেই কোন ফল না হয়, তবে উপেক্ষাবুদ্ধিতে অসূয়াশূন্য হ'য়ে অবাধে তাহা সহ্য করিবে। তোমার নিজের নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিতে গিয়া সর্ব্বদা সাবধান থাকিবে যেন বিন্দুমাত্র বিদ্বেষভাব না আসে, যেন তোমার ধৈর্য্য ও চিত্তস্থৈর্য্য অক্ষুণ্ণ থাকে। যদি অপরের অন্যায় অত্যাচার এইরূপে নীরবে সহ্য ক'রে গেলেও কোন প্রতিকার না হয়, তবে বুঝতে হবে যে, 'এটা হবার, তাই হ'য়ে যাচ্ছে' অর্থাৎ ভগবদিচ্ছায় তোমাকে এই অন্যায় অপবাদের বা ক্ষতির স্তরের ভিতর দিয়ে যেতেই হবে। এরূপস্থলে সহিষ্ণুতা ও স্বার্থত্যাগ ভিন্ন সাধকজনোচিত চিত্তের অচঞ্চল শান্ত অবস্থা রক্ষা করা যায় না।

তোমরা ইতঃপূর্ব্বে 'সহিষ্ণুতা' প্রসঙ্গে ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের কথা শুনিয়াছ। ভেবে দেখ দেখি, তাঁর কি অসীম সহিষ্ণুতা ছিল! যবনগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দয়ভাবে প্রচণ্ড বেত্রাঘাত অম্লানবদনে সহ্য ক'রেও চিত্ত স্থির, অচঞ্চল ও বিন্দুমাত্র উত্তেজনা শূন্য; কি যেন একটা যোগযুক্ত অবস্থা; নিজের শরীরের উপর দারুণ আঘাতের জন্য কোন দুঃখ কষ্ট বা ক্ষোভ ছিল না; অধিকন্তু অজ্ঞানাচ্ছন্ন আঘাত-কারীদিগের জন্য ব্যথিত হ'য়ে তাদের মঙ্গলের জন্য শ্রীভগবানের কাছে করুণা ও ক্ষমা ভিক্ষা ক'রেছিলেন। মোট কথা, তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ রেখো যে, যখনই ভক্তির বিঘাতক কোন প্রকার উত্তেজনার সৃষ্টি হইবার উপক্রম হইবে তৎক্ষণাৎ তাহা ত্যাগ করিয়া শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিবে। নিজের শান্তিকে খুব সযত্নে রক্ষা করিবে। আমার বিশ্বাস, ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের এই নিদারুণ বেত্রাঘাত সহ্য করার কথা স্মরণ করিলে তোমরা নিশ্চয়ই শান্তভাব অবলম্বন করিতে সক্ষম হইবে; যেহেতু ঐরূপ উন্নত

আদর্শের স্মৃতিতে তোমাদের চিত্ত উত্তেজিত হইবার অবসর পাইবে না। তোমরা সাধনপথের পথিক, মনে রেখো তোমাদের লক্ষ্য অনেক উপরে; তোমরা জগতের মুখাপেক্ষী নও, একমাত্র শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী হ'য়ে প'ড়ে আছ। অতএব যে কোন কারণেই হউক্ বিন্দুমাত্র উত্তেজনা সৃষ্টির পরিবর্ত্তে যদি তোমাদিগকে যাবতীয় পার্থিব স্বার্থ ত্যাগ ক'রতে হয় সেও স্বীকার তথাপি চিত্তের অযথা ব্যতিব্যস্ততা এনে নিজেদের স্বাভাবিক শান্তি কদাচ নষ্ট হ'তে দিও না। শ্রীভগবানে ভক্তিলাভই যখন তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য, এবং উত্তেজনামাত্রই যখন সেই ভক্তিলাভের পথে অন্তরায়, তখন সাধক ভক্তের পক্ষে উত্তেজনা যে সর্ব্বথা পরিত্যজ্য, এ কথা বেশী করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন। আমরা সচরাচর এই সংসারে যে সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি, তাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, এই সাংসারিক অবস্থা পরম্পরা সাধনপথের অত্যন্ত প্রতিকূল। তাই অনেকে ব'লে থাকেন, 'সংসারে থেকে সাধন ভজন কিছুতেই হ'তে পারে না; সংসার ছেড়ে চ'লে না গেলে আধ্যাত্মিক পথে এগুনো যায় না, যেহেতু সংসারে বাস ক'রতে গেলে পদে পদেই মানুষ উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে, এই উত্তেজনার হাত হ'তে পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই'। এ বিষয়ে আপনার অভিমত কি?

উত্তর। দেখ, এই সংসারের প্রতিকূল অবস্থা ও ঘটনাগুলি সাধককে প্রথম প্রথম সাধনপথে অত্যন্ত বাধা দেয় সত্য এবং সেই জন্য অনেকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে সংসার ছেড়ে চ'লে যেতে চান। কিন্তু উত্তেজনাবশতঃ সংসার ছেড়ে বনে গেলে কি হবে? প্রকৃতি একদিন অবশ্যই তাঁদিগকে ঘাড় ধ'রে আবার এই সংসারে

এনে ফেলবে। 'সংসার ছেড়ে বনে গেলে হবে, সংসারে থেকে হবে না' এ কথা অযৌক্তিক এবং ভিত্তিহীন। এরূপ কথা যাঁরা বলেন তাঁদের বোঝা উচিত যে সংসার সাগর পার হ'তে হ'লে এই সংসারে থেকেই পার হইবার উপায় শিক্ষা ক'রতে হবে। সাগর পার হ'তে হ'লে তরঙ্গ দেখে ভয় পেলে চ'লবে কেন? ঢেউয়ে ঢেউয়ে জলে নেমে সাঁতার শিখতে হবে, তারপর সাঁতার শিখে সাগর পার হ'তে হবে। ডেঙ্গায় থেকে কেহ সাঁতার শিখতে পারে না এবং সাগর পার হ'তেও পারে না। তাই ব'লছিলাম, উত্তেজনাবশতঃ বনে গেলে কিছুই হয় না; বরং সংসারে থেকেই সাধন ভজন করা ভাল। ইতঃপূর্ব্বে 'বৈরাগ্য' প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেক কথা আলোচিত হ'য়েছে সেগুলি তোমরা মনে রেখো।

দেখ, ধীরভাবে সাধনপথে অগ্রসর হ'লে ক্রমে ক্রমে সব প্রতিকূলতা স'রে যায়; তখন আবার এই সংসারই অনেক বিষয়ে সাধনের অনুকূল ব'লে বোধ হয়। আরও দেখ, উত্তেজনা ক'রেছ কি মারা গেছ, তা ব্যবহারিক জগতেই হউক্, আর আধ্যাত্মিক পথেই হউক্; কোনরূপ উত্তেজনা কোন স্থলেই প্রশংসনীয় নয়। অতএব খুব ধীরভাবে জ্ঞানবান্ হ'য়ে নিজের শান্তিকে বজায় রেখে সংসারপথে বুঝে চ'লবে। দেখ, আমি আমার গন্তব্য পথে চলিবার একটা নিয়ম এই ক'রে নিয়েছি যে, আমার সামনে যতটুকু আলোক দেখিব অর্থাৎ জ্ঞান ও বিবেক বুদ্ধি দ্বারা যতটুকু ভাল ব'লে বুঝিব, ঠিক ততটুকুই পা বাড়াব। উত্তেজনাবশতঃ হটকারিতার প্রশ্রয় দিয়ে যার তার কথায় অন্ধকারে তার বেশী একপাও এগুবো না।

প্রশ্ন। আমাদের মনে হয়, সাধনপথ অবলম্বন করিবার পর প্রথম প্রথম সাধকদিগের মধ্যে এক প্রকার সাত্ত্বিক উত্তেজনা আপনা

আপনি এসে পড়ে। সাধকের পক্ষে উত্তেজনা মাত্রই যখন বর্জ্জনীয়, তখন এগুলি দমনের বা নাশের উপায় কি ?

উত্তর। তোমরা সত্যই বলিয়াছ ; এরূপ অনেক. সাধককে দেখা যায় যাঁরা কিছুদিন সাধন ভজন করিবার পর এমন একটা সাত্ত্বিক মায়াগ্রস্ত হ'য়ে পড়েন যে, তাঁরা মনে করেন 'এটা ক'রব, সেটা ক'রব' অথবা 'আমি একজন ভক্ত হ'য়ে পড়েছি' ইত্যাদি। দেখ, আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞানলাভ ভিন্ন উত্তেজনা দমনের উপায়ান্তর নাই। একমাত্র জ্ঞানলাভ দ্বারাই এই সমস্ত অস্বাভাবিক উত্তেজনার নাশ হয় ; তবে, জ্ঞানালোচনা যে খুব শক্ত কাজ তাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে হইলে অনবরত মহতের সঙ্গ এবং ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, আলোচনা ও সিদ্ধান্তবিচার করিতে হইবে। একবার জ্ঞানগুলি হৃদয়ে বদ্ধমূল হ'য়ে গেলে পর অযথা উত্তেজনা আপনিই প্রশমিত হ'য়ে যায়। অনেকে উত্তেজনাবশতঃ সংসার ছেড়ে চ'লে যায় এবং দুদিন পরে মনে করে 'আমি একটা কিছু হ'য়ে প'ড়েছি'। এই শ্রেণীর লোকেরা তুড়ি দিয়ে কাজ সারতে চায় ; কিন্তু তা কি হয় ? যতদিন না প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয়, ততদিন কিছুতেই উত্তেজনার নাশ হয় না ; আর উত্তেজনা না কমিলে ভক্তি, প্রেম, এ সমস্ত স্নিগ্ধ মধুর ভাব-সম্পত্তি লাভ করা যায় না। তাই তোমাদিগকে বলিতেছি যে, সাধনপথে প্রবেশ ক'রেই ভক্তি, প্রেম লাভ করিবার জন্য তাড়াতাড়ি করিবার অর্থাৎ ব্যস্ত হইবার কোন প্রয়োজন নাই। এ সব যখন আসবার হবে, তখন আপনিই আসবে ; আপনি না এলে জোর ক'রে কেহ কখন ভক্তি প্রেম লাভ করিতে পারে না। দরকার হচ্ছে, মহতের অনুগত হ'য়ে অনবরত ধীরভাবে ধর্ম্মতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে

বিশুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করা। ধর্ম্মতত্ত্বের সার সত্যগুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হ'লে পর আপনা হ'তেই ভক্তি প্রেম প্রভৃতির অতি স্নিগ্ধ হৃদয়গ্রাহী মনোরম ভাবগুলির স্ফূরণ হইতে থাকিবে।

দেখ, সাধনপথে উত্তেজনার পরিণাম ফল যে কিরূপ হয়, তাহা জানিবার জন্য তোমাদিগকে বেশী দূর যাইতে হইবে না। তোমাদেরই মধ্যে একজন সাধক ছিল, তোমরা অনেকেই বোধ হয় তাহাকে চিনিতে; সাধনপথে এসে প্রথম প্রথম সে কত বিনয়, কত ভক্তি, কত ইষ্টনিষ্ঠা দেখাতে লাগলো। তার আনুগত্য, ভজনশীলতা ও ভক্তিভাব দেখে আমার মনে হ'য়েছিল যে, ভবিষ্যতে সে একজন আদর্শ ভক্ত ব'লে পরিগণিত হ'তে পারবে। কিন্তু কালের কি কুটিল গতি! হঠাৎ একটা উত্তেজনার বশবর্ত্তী হ'য়ে সে 'সন্ন্যাস' নিয়ে গেরুয়া প'রে বৃন্দাবনে চ'লে গেল। কত নিষেধ করলাম, কিছুতেই শুনলে না। মনে ক'রলে,—'প্রভু তো গৃহী, আমি রাতারাতি স্বামীজী টামিজী গোছের বড় দরের যা হয় একটা কিছু হ'য়ে প'ড়বো'; তাই ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী সেজে ছুটে বেরুলো। এখন শুন্‌তে পাই, বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছে; তার মায়ের বিশেষ অনুরোধে নাকি বিবাহও ক'রেছে। ফলে, তার সমস্ত সাধন ভজন অনেকটা শিথিল হ'য়ে গেছে। দেখ, উত্তেজনার ফল এইরূপই হ'য়ে থাকে; এটা এ পথে অর্থাৎ সাধনপথে অগ্রসর হবার পক্ষে প্রবল প্রতিবন্ধক। তাই বলছিলাম, অত্যধিক উত্তেজনা কোন স্থলেই প্রশংসনীয় নয়। ভক্তিলাভের পথে উত্তেজনার ফলে সাধকের যে কিরূপ অবনতি হয়, তাহা বুঝাইবার জন্যই তোমাদিগকে এ কথা বলিলাম। তবে এতেও তার দোষ দিতে পারি না, কেননা শেষ কথা কি জান? 'যারে যৈছে নাচায়, সে তৈছে নাচে'। আরও এক কথা এই যে, সাধন কখন বিফল বা নষ্ট হয় না।

তাহার এই সাময়িক স্তম্ভনভাব অর্থাৎ সাধনপথে গতিরোধ বা অবনতির ভাব অবশ্যই একদিন চ'লে যাবে এবং শ্রীভগবানের কৃপায় আবার সে সাধনপথে উন্নতি লাভ করিতে পারিবে।

প্রশ্ন। আজকাল প্রায় সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্মাচরণ ব্যাপারটি যে ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা দেখিয়া আমাদের মনে হয় যে, ধর্ম্মানুষ্ঠান এবং তাহার আনুসঙ্গিক ক্রিয়া পদ্ধতিগুলি যেন একটা সাময়িক উত্তেজনা মাত্র—প্রাণহীন ও অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার বিশেষ। ধর্ম্মাচরণের অন্তর্নিহিত সুমধুর ভাবের আস্বাদন এবং সত্যবস্তুর উপলব্ধি খুব কম স্থলেই হ'য়ে থাকে। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

উত্তর। তোমরা সত্যই ব'লেছ; বর্ত্তমানে 'ধর্ম্মাচরণ' ব'লে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে যতকিছু আচরণ অনুষ্ঠান দেখা যায়, তার প্রায় পনর আনা তিন পাই কেবল উত্তেজনা মাত্র। দেখ, ধর্ম্মাচরণের দুইটি দিক বা অংশ আছে; প্রথমটি উত্তেজনার অংশ এবং দ্বিতীয়টি অনুভূতি বা আস্বাদনের অংশ। ধর্ম্মাচরণের এই উত্তেজনাপ্রবণতা অংশটি ধর্ম্মের বহিরাবরণ মাত্র; উহার অন্তর্গত অতি স্নিগ্ধ মধুর এবং পরম আস্বাদনীয় আন্তরবৃত্তি বিশেষের উদ্বোধন অর্থাৎ জাগরণই ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত সার সত্যবস্তু। এই স্নিগ্ধ মধুময় আন্তর বৃত্তির জাগরণ অর্থাৎ সেই নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্ভক্তির উদয় যাঁহার হইয়াছে তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক; তাঁরই ধর্ম্মাচরণ সার্থক। আমার মনে হয়, বর্ত্তমানে জগতে 'ধার্ম্মিক' নামে খ্যাত যত লোক আছেন অর্থাৎ যে সমস্ত লোক সাধন-পথের পথিক হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিতেছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় বার আনা লোকে ধর্ম্মের উত্তেজনার অংশ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত; আর তিন আনা লোক ধর্ম্মের খোসা অংশ নিয়েই সন্তুষ্ট, তিন পাই লোকে ধর্ম্মকে আব্ছা

আব্ছা অনুভব করেন; আর, ধর্ম্মের প্রকৃত মাধুর্য্য বোধ হয় এক পাই লোকে আস্বাদন করেন কি না'সন্দেহ। এই হিসাবে যত 'ভক্ত' আছেন তাঁদের মধ্যে প্রায় বার আনা লোক ভক্তির উত্তেজনার অংশ নিয়েই ব্যস্ত হ'য়ে প'ড়ে আছেন; প্রকৃত জ্ঞানী ভক্ত খুব কম। এই অযথা উত্তেজনার অংশ চ'লে গেলে পর তখন শান্ত ভাব আসে; এই শান্ত ভাব আধ্যাত্মিক জীবন গঠন করিবার ভিত্তি-স্বরূপ। সাধকজীবনে এই শান্ত অবস্থা লাভ হইলে পর ক্রমশঃ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানাংশগুলি বিকসিত হয় এবং তারপর ধীরে ধীরে ভক্তি-ভাবগুলি উদয় হইতে থাকে।

সাধনপথে ধর্ম্মাচরণের ব্যপদেশে এই যে সমস্ত সাত্ত্বিক উত্তেজনার কথা বলা হইল, এগুলিকে ছাড়িয়া দিলেও সাধারণ হিসাবে কাম ক্রোধাদি প্রবৃত্তিগুলির অযথা উত্তেজনা দ্বারা মানবের কত ক্ষতি হয় তাহা কি তোমরা ভাবিয়া দেখিয়াছ? দেখ, একটি গূঢ় রহস্যের কথা বলিতেছি শুন,—যে কোন প্রকারের হউক্ না কেন, উত্তেজনা হইবা-মাত্রই আমাদের দেহস্থ তেজস্তত্ত্বের অর্থাৎ অগ্নি অংশের ক্রিয়া হ'তে থাকে; সমস্ত দেহে একটা ঘর্ষণ (ইংরাজীতে যাকে বলে Friction) হ'তে থাকে; শরীর উত্তপ্ত হ'য়ে ওঠে, তাতে অর্থাৎ সেই উত্তাপে আমাদের শরীরস্থ 'অপ্' তত্ত্বের অংশ যে রস—যাহা হইতে শুক্র অর্থাৎ ধাতু উৎপন্ন হয়—তাহা শোষণ করে। কাজেই অযথা উত্তেজনাপ্রবণ ব্যক্তিগণ বেশীদিন জীবিত থাকে না; যেহেতু তাহাদের জীবনীশক্তি ক'মে যায়। মানুষ যদি এই সমস্ত অযথা উত্তেজনা ত্যাগ ক'রে তার স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তবে সুস্থ শরীরে শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারে। উত্তেজনাশূন্য ব্যক্তির জীবনীশক্তি (Longivity) বর্দ্ধিত হয়,—এটা একটা দার্শনিক কথা। আমার

মনে হয়, আমাদের দেহের স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে বিশেষ কোন প্রকার ঔষধাদি সেবনের প্রয়োজন হয় না; কেবল অযথা উত্তেজনাশূন্য হ'য়ে এবং পরিমিত ভাবে আহার বিহারের নিয়মগুলি পালন ক'রে মোটামুটি সাদাসিদে ভাবে জীবনযাপন ক'রলেই আমাদের শারীরিক স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে এবং ফলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়।

এই প্রসঙ্গে তোমাদিগকে একটি আবশ্যকীয় কথা ব'লে রাখি, মনে রেখো। দেখ, যদি পরমায়ু বৃদ্ধি করিতে চাও তবে সহজ সরল ও সত্যের পথে চল এবং অযথা উত্তেজনাশূন্য হও। যদি সম্পূর্ণরূপে উত্তেজনাশূন্য হওয়া যায় তবে মানুষের মুখমণ্ডল বরাবর ঠিক যেন বালকের মত কোমল ও স্নিগ্ধ থাকে। মূর্ত্তিমন্ত করুণার অবতার পরমদয়াল পতিতপাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু 'অদোষদর্শী' এবং 'অক্রোধ-পরমানন্দ' অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে উত্তেজনাশূন্য ছিলেন একথা তোমরা শুনিয়াছ; তাই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁর শ্রীমুখমণ্ডল সরল বালকের মত কোমল, স্নিগ্ধ এবং প্রিয়দর্শন ছিল।

উত্তেজনা সম্বন্ধে অনেক কথাই আলোচিত হইল। এ বিষয়ে আর একটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, বিশেষ করে কথাটি মনে রেখো। দেখ তোমরা এখন সাধকশ্রেণীভুক্ত, তোমাদের নিজেদের একটা সাধকজনোচিত ব্যক্তিত্ব থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তোমরা তোমাদের নিজ নিজ ইষ্টদেবতা শ্রীগুরুদেব ব্যতীত অপর কাহারও কোন কথায় উত্তেজিত হ'য়ে নিজেদের ব্যক্তিত্ব (Personality) হারিয়ে ফেল'না। তোমাদিগের সাধকজনোচিত ব্যক্তিত্ব জিনিষটি যেন এত শিথিলমূল ও ভঙ্গপ্রবণ না হয় যে, যার তার একটা সামান্য কথায় হটাৎ উত্তেজনা এসে তাহা নষ্ট হ'য়ে যাবে।

অতএব সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় উত্তেজনাশূন্য হ'য়ে নিজ নিজ ইষ্টদেবের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি অটুট রেখে খুব ধীর ও শান্তভাবে সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

নিষিদ্ধ আচরণ।

দেখ, যে সমস্ত আচরণ দ্বারা মানবের নিজের এবং জগতের অর্থাৎ জগতস্থ অপর জনসাধারণের যথেষ্ট ক্ষতি হ'য়ে থাকে, বিশেষতঃ যেগুলি আধ্যাত্মিক পথে উন্নতি লাভের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল, সাধু এবং শাস্ত্রবিগর্হিত সেই সমস্ত নিষিদ্ধ আচরণ সাধক মাত্রেই অবশ্য বর্জ্জন করিবেন। ইতঃপূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ, ধর্ম্মপথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে অর্থাৎ ধর্ম্মাচরণ দ্বারা ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি উন্নত মধুময় ভাবগুলি উপলব্ধি করিতে হইলে চিত্তকে সর্ব্বদা পবিত্র রাখিতে হইবে; অতএব যে সমস্ত আচরণে চিত্তে বিন্দুমাত্র অপবিত্রতা বা মালিন্য আনয়ন করে সাধক কখনও সেরূপ আচরণ করিবেন না। যেমন একখানি সুপরিষ্কৃত শুভ্র বস্ত্রে ক্ষুদ্র একটি মসীবিন্দু নিক্ষেপ করিলে তাহা ঐ বস্ত্রের সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা নষ্ট করে এবং অতি সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতঃ উক্ত কার্য্যটিকে নিতান্ত অশোভনীয় প্রতিপন্ন করায়, ঠিক সেইরূপ সামান্য একটি নিষিদ্ধ আচরণ সাধকের চরিত্রে দৃষ্ট হইলে উহা সেই নিষ্কলঙ্ক ভক্তচরিত্রের পবিত্রতা, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য নষ্ট করিয়া দেয় এবং অপেক্ষাকৃত অতি সহজেই সাধারণ লোকের তীব্র কটাক্ষ ও বিরুদ্ধ সমালোচনার বিষয়ীভূত হ'য়ে পড়ে। কাজেই যাঁহারা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে এ বিষয়ে সাধারণ লোক অপেক্ষা কত বেশী সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে তাহা সহজেই অনুমেয়।

প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত সাধু মহাত্মাগণের পবিত্র চরিত্রে কদাচ কোনরূপ নিষিদ্ধ পাপাচরণ দৃষ্ট হয় না। কেন জান? ভগবদ্ভক্তের মন সর্ব্বদা ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ থাকাবশতঃ উহা সর্ব্বক্ষণই একটা পবিত্র ভাবে বিভাবিত থাকে; ভক্তের মন কোন সময়েই সম্পূর্ণরূপে ইষ্টচিন্তা-সম্পর্কশূন্য থাকে না। কারণ ভক্ত কোন সময়েই শ্রীভগবান্‌কে ভুলে থাকতে পারে না। ভক্তিশাস্ত্রে আমরা দেখিতে পাই, প্রকৃত ভগবদ্ভক্তের একটি বিশিষ্ট লক্ষণই এই যে, তাঁর যাবতীয় চেষ্টা অর্থাৎ কর্ম্মোদ্যম সমস্তই শ্রীভগবৎ-তৃপ্ত্যর্থে অনুষ্ঠিত হয়; অর্থাৎ ভক্ত কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বক্ষণ শ্রীভগবানের পূজা, সেবা, ধ্যান, ধারণা, জপ, কীর্ত্তন ইত্যাদিতে নিযুক্ত থাকেন; কাজেই তাঁর চিন্তাশক্তি কদাচ অন্যত্র অর্থাৎ ভগবচ্চিন্তাশূন্য হ'য়ে তদেতর বিষয়ে প্রযুক্ত হইবার অবসর পায় না। ভক্তিশাস্ত্রে ভক্তের এই বিশিষ্ট লক্ষণটিকে 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা' বলা হইয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে ভক্তের কোন কোন আচরণ সাধারণ লোকের মত প্রতীয়মান হইলেও তার মধ্যে একটা বিশেষত্ব এই থাকে যে, পবিত্র ভগবচ্চিন্তার সহিত অন্বিত থাকাবশতঃ উহা কোন সময়েই বিবেকের অননুমোদিত হয় না। ভগবদ্ভক্তের বিবেকবুদ্ধি সর্ব্বদাই জেগে থাকে, কোন সময়েই উহা সাধারণ লোকের মত সুপ্ত বা মোহগ্রস্ত হয় না। আরও দেখ, যদিও শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামীরূপে প্রতি জীবহৃদয়েই বিরাজ করেন সত্য, কিন্তু ভক্তের পবিত্র হৃদয়েই তাঁর আবির্ভাব অর্থাৎ বিশেষ প্রকাশ বা অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে। তবেই দেখ, **সাধক যতদিন না নীতিবিরুদ্ধ আচরণগুলি ত্যাগ করিতে পারিবেন অর্থাৎ যতদিন না তাঁর হৃদয় সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক ও পবিত্র হইবে ততদিন তিনি প্রকৃত 'ভক্ত' পদবাচ্য হইতে পারিবেন না।**

যদি দৈববশতঃ কোন ভক্তচরিত্রে কখন কোন প্রকার নিষিদ্ধ আচরণ দৃষ্ট হয়, তবে বুঝিতে হইবে, তাঁর অনাদিসিদ্ধ প্রারব্ধ হয়তো তখনও পর্য্যন্ত ক্ষয় হয় নাই; তাই মায়ার ছলনায় একটা কুপ্রবৃত্তির টানে পড়ে ভক্তের ক্ষয়োন্মুখ প্রারব্ধের একটা ভোগ হ'য়ে যায় মাত্র। যদিও ভক্তচরিত্রে সেরূপ নিষিদ্ধ আচরণ বড়ই নিন্দনীয় ও অশোভনীয় তথাপি বহুদর্শী চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সহসা একটা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ক'রে ভক্তচরিত্রের দোষদর্শন করেন না। তাঁরা ভক্তের এরূপ নিষিদ্ধ ব্যবহারের ভিতর দিয়েও একটা পরম উপকারী অভিজ্ঞতা লাভের উপায় স্বীকার করেন। সেটা কিরূপ জান? ভক্ত সেই নিষিদ্ধ আচরণের জন্য অবশ্যই সাধারণের কাছে নিতান্ত লজ্জিত ও ঘৃণার্হ হ'য়ে থাকেন; ফলে এই হয় যে, তিনি নিজকৃত নিন্দনীয় আচরণে অত্যন্ত অনুতপ্ত হ'য়ে মনে মনে সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের চরণে সমস্তই নিবেদন করিয়া অধিকতর দৃঢ়তার সহিত নিজের সাধনপথে মনোনিবেশ করিতে চেষ্টা করেন এবং সেইরূপ গর্হিত কার্য্য যাহাতে আর তাঁহার দ্বারা দ্বিতীয়বার আচরিত না হয়, সে বিষয়ে শ্রীভগবানের নিকট সকাতরে প্রার্থনা জানিয়ে বিশেষ সাবধান হ'য়ে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায় যে, এইরূপ একটা অবনতিকে দ্বার ক'রে অর্থাৎ সোপান বা উপলক্ষ্য ক'রে জীবের উন্নতি প্রকাশ পায়। তবেই দেখ, সকৃৎ নিন্দনীয় আচরণ প্রকৃত ভক্তচরিত্রকে একেবারে শিথিল ও অধঃপাতিত করিতে পারে না। বরং ভবিষ্যতে অধিকতর সংযত হইবার জন্য বিশেষ যত্নশীল হইতে শিক্ষা দেয়। তাই বলিতেছিলাম, এইরূপ দৈবকৃত প্রতিকূল ঘটনার ভিতর দিয়াও ভক্তের একটা হিতকর অভিজ্ঞতা লাভ হইতে পারে।

আরও দেখ, একটা নিষিদ্ধ পাপাচরণের দ্বারা সাধক ভক্তকে

লোকসমাজে কিরূপ নিন্দনীয় ও অবজ্ঞেয় হইতে হয়—এইটি জগতের সাধারণ লোককে শিক্ষা দিবার জন্যই হয়তো শ্রীভগবদিচ্ছায় কদাচ কোন ভক্তচরিত্রের ভিতর দিয়া কোন একটা নিষিদ্ধ আচরণ ঘ'টে যায়। তোমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর লীলায় দেখিতে পাও—তাঁর পার্ষদগণের মধ্যে ছোট হরিদাস, বৈরাগী সন্ন্যাসী হ'য়ে একজন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে (অবশ্য তিনি একজন পরম ভক্তিমতী ও তপস্বিনী স্ত্রীলোক ছিলেন) চাউল ভিক্ষা ক'রে এনেছিলেন ব'লে শ্রীমন্মহাপ্রভু চিরদিনের তরে তাঁকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন; জীবনে আর কখন তাঁর মুখদর্শন করেন নাই। অবশ্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিত্য পার্ষদ ও পরম ভক্ত ছোট হরিদাসের নির্ম্মল চরিত্রে সত্য সত্যই কোনরূপ বিশেষ অন্যায় আচরণ অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভবপর ছিল না; তথাপি পাছে পরস্ত্রী সম্ভাষণের দ্বারা বৈরাগ্য-ধর্ম্মাবলম্বী ভক্ত সাধকের পবিত্র চরিত্রে তাঁহার অজ্ঞাতসারেও বিন্দুমাত্র কলঙ্ক স্পর্শ হয় এবং স্ত্রীলোকের সহিত অবাধ মিলনের প্রশ্রয় দিলে পাছে সাধক ভক্তের চিত্ত-মালিন্য এসে পড়ে, তাই সর্ব্বজ্ঞ ও দূরদর্শী লোকশিক্ষক শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ একটা অভিনয়ের দ্বারা জগদ্বাসী জীবগণকে শিক্ষা দিলেন যে, যাঁরা ভক্তি-পথের পথিক হইতে চান—শ্রীভগবানে ভক্তিলাভই যাঁদের সাধনের উদ্দেশ্য—তাঁহাদিগকে নিষিদ্ধ ও নীতিবিরুদ্ধ আচরণগুলি হইতে কত অধিক মাত্রায় সাবধান হইতে হইবে এবং ভক্তের পক্ষে নিষিদ্ধ পাপাচরণ কত বেশী পরিমাণে দোষাবহ।

একজন বৃদ্ধা তপস্বিনী এবং পরম ভক্তিমতী স্ত্রীলোকের নিকট হইতে চাউল ভিক্ষা করিয়া আনার অপরাধে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু ছোট হরিদাসকে বর্জ্জন করিয়াছিলেন তখন তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে শ্রীল স্বরূপ দামোদর ও শ্রীল পরমানন্দপুরী প্রভৃতি বিশিষ্ট ভক্তগণ হরিদাসের

সামান্য অপরাধ ক্ষমা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুকে বিশেষ অনুরোধ পূর্ব্বক যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে তিনি তাঁহাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সাধক ভক্তগণের পক্ষে জ্ঞাতব্য, স্মরণীয় এবং তাঁর শ্রীমুখের নিষেধবাক্য অবশ্য পালনীয়। যথা ;—

"কোন্ অপরাধ প্রভু কৈল হরিদাস।
কি লাগিয়া দ্বারমানা কৈল উপবাস ॥"
"প্রভু কহে বৈরাগী করে প্রকৃতি সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন ॥
দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারু প্রকৃতি হরে মুনি জনের মন ॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আরও দেখ, এই সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্র মানবকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য যে নিষেধাজ্ঞা করিতেছেন, আমার মনে হয়, অত বড় শাসনবাক্য আর কোথায়ও প্রযুক্ত হয় নাই। যথা ;—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত।

অর্থাৎ 'মাতা, ভগিনী বা দুহিতার সহিত নির্জ্জনে একাসনে অবস্থিতি করিবে না ; কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করে।' 'মানবের' পক্ষে শাস্ত্রে যখন এত বড় শাসনবাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তখন মানুষ বিদ্যায়, জ্ঞানে, বৈরাগ্যে এবং সংযমে যতই উন্নতি লাভ করুক

না কেন, তাহাকে অবশ্যই এই শাসনবাক্যের নিকট ঘৃণায় ও লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হইবে। অতএব তোমরা কখনও জ্ঞানাভিমানী হইয়া নিজেদের চরিত্রে সংযমের গর্ব্ব করিও না; বরং যাহাতে কোনরূপ নীতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ পাপাচরণ তোমাদের চরিত্রে না এসে পড়ে সেজন্য পূর্ব্ব হইতেই তোমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিবে এবং সর্ব্বদা মঙ্গলময় শ্রীভগবানের ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল হইয়া নিজেদের ভক্তজনোচিত চরিত্রের বৈশিষ্ট ও পবিত্রতা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে।

কল্পিত অভাব।

দেখ, জীবনধারণোপযোগী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য মানুষের প্রকৃত অভাব খুব কম; অজ্ঞানতাবশতঃ মানুষ তাহা না বুঝিয়া কতকগুলি কল্পিত অভাব সৃষ্টি করিয়া নিজেরা কষ্ট পাইয়া থাকে। আমরা অনেক সময় আমাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত কতকগুলি অভাব সৃষ্টি করিয়া আপনাদিগকে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করি এবং সেই সমস্ত কল্পিত অভাব মোচনের জন্য শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা ক'রে থাকি; কিন্তু আমরা বুঝিতে পারি না যে, আমরা যাহা চাই অর্থাৎ যে সকল বস্তুর অভাব বোধ করি সেগুলি হয়তো ঠিক ঠিক আমাদের প্রার্থয়ীতব্য নয়। আমাদের প্রকৃত অভাব যে কি, সব সময় আমরা তাহা সম্যক বুঝিতে পারি না; তাই যেগুলি আমাদের চাওয়া উচিত নয় তাহাও আমরা তাঁর কাছে চাহিয়া বসি; আবার না পাইলে হয়তো শ্রীভগবান্‌কে নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বলিতেও দ্বিধা বোধ করি না।

সাধনপথে উন্নতি লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্ত অবস্থা যখন

একান্ত প্রয়োজন, তখন অত্যধিক ভোগাকাঙ্ক্ষার বশবর্ত্তী হ'য়ে সর্ব্বদা অভাবগ্রস্ত ও অসন্তুষ্টচিত্ত হওয়া সাধকের পক্ষে কখনই উচিত নয়। ইতঃপূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ যে, ইহ সংসারের ভোগাভিনিবেশ অর্থাৎ বিষয়ভোগের আসক্তি যতটা পরিমাণে তোমাদের কমিতে থাকিবে, ঠিক ততটা পরিমাণে তোমরা সাধনপথে অর্থাৎ পারমার্থিক ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে সক্ষম হইবে। ভগবদ্ভক্ত সাধক অবশ্যই শ্রীভগবানের কৃপায় সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হইবেন এবং সুখে দুঃখে সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া অনুক্ষণ তাঁর কৃপাকেই ধ্রুবতারার মত লক্ষ্য করিয়া চলিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ নিজেই শ্রীমুখে স্বীকার করিয়াছেন,— "তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। সাধক ভক্ত অবশ্যই এই গীতোক্ত শ্রীভগবদ্বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাসী ও আস্থাবান্ হইবেন। তোমরা একটু নিবিষ্টচিত্তে মনে ক'রে দেখ দেখি, ভগবদ্বিশ্বাসী ভক্তের পক্ষে ইহা কত বড় আশার কথা—কত বড় ভরসার কথা!

স্বরূপতঃ বিচার করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের চাহিবার কিছুই নাই। চাইব আবার কি? আমাদের যাহা প্রকৃত প্রয়োজন তাহা আমাদের চেয়ে তিনি ঢের বেশী বোঝেন। যাত্রা থিয়েটারের দৃশ্যসূচী (Programme) যেমন নাটক লেখকের ইচ্ছায় অভিনয় হইবার পূর্ব্বেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকে, ঠিক সেইরূপ শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব হইতেই দেয় অদেয় বিচার করিয়া আমাদের প্রাপ্তব্য বস্তু বিষয়গুলির সুব্যবস্থা করিয়া রাখেন। অজ্ঞানতাবশতঃ আমরা উহা বুঝিতে পারি না; তাই যখন তখন 'এটা চাই', 'ওটা চাই', 'এটা না হ'লে চলে না', 'ওটা না হ'লে চলে না' মনে ক'রে অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকি। যাঁর পালনী শক্তি না চাহিতেই অর্থাৎ চাহিবার বহু পূর্ব্বেই সদ্যোজাত শিশুর জন্য মাতৃস্তনে ক্ষীরধারা সঞ্চয় ক'রে রেখে দেন, তিনি কি

জানেন না তোমার আমার কি চাই, আর কি না চাই? অবশ্যই তিনি তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন।

আবার দেখ, শাস্ত্র বলিতেছেন,—'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস' অর্থাৎ নিত্য ভগবদ্দাসত্বই জীবের স্বভাব। জীব যতদিন তাহার এই স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিবে ততদিন বাস্তবিকই সে অভাবগ্রস্ত। ইহাই অর্থাৎ নিজ স্বরূপের অনুপলব্ধি—আপনাকে না চেনাই—জীবের প্রকৃত অভাব। অতএব যাঁহারা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে,—এই সংসার শ্রীগোবিন্দের, আমরা তাঁর নিয়োজিত সেবক মাত্র; সেবকের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা প্রভুই করিবেন। তাঁরই ইচ্ছায় আমরা এই সংসারে এসেছি, মাত্র 'পেট ভাতায় মজুরী' ক'রে তাঁর সংসারে তাঁর কাজ ক'রে যাব; যেমন অবস্থায় রাখবেন তেমনি অবস্থায় থেকেই সন্তুষ্ট থাকব। ভক্ত এ বিষয়ে শ্রীভগবানের উদ্দেশে এইমাত্র ব'লে থাকেন,—'কি করব প্রভু! এই শরীরটা দিয়েছ, দুটি না খেতে পেলে তো আর এই শরীরটা রক্ষা হবে না, তাই যা হ'ক ক'রে দুটি শাক-অন্ন দিয়ে এই শরীরটা রক্ষা হ'লেই হল, তার বেশী আর কিছুই চাই না'। ফলকথা, আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য মোটামুটি আহার বিহার এবং সাদাসিদে চাল চলনই যথেষ্ট; কাজেই তদতিরিক্ত যাবতীয় অভাববোধ সবই আমাদের 'কল্পিত অভাব' মাত্র। ঐ সমস্ত কল্পিত অভাব বোধ ত্যাগ ক'রে আমাদিগকে 'সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ' হ'তে হবে। তা না হ'লে কোন দিনই আমরা সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারিব না।

আরও দেখ, প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত তাঁর উপাস্য শ্রীভগবান্‌কে পরম 'প্রেমময়' এবং 'করুণাময়' ব'লেই মনে করেন; কাজেই তাঁর কৃপার

কথা বিস্মৃত হ'য়ে কোন অবস্থাতেই তিনি তাঁহাকে 'অকরুণ' বা 'নিষ্ঠুর' ব'লে মনে করিতে পারেন না। জাগতিক বস্তুবিষয় প্রাপ্তির অভাববোধ মাত্রই চিত্তের ব্যতিব্যস্ততা আনয়ন করে; কাজেই উহা যে ভক্তিলাভের পক্ষে যথেষ্ট বাধা প্রদান করে একথা সহজেই অনুমেয়। অতএব তোমরা কতকগুলি অপ্রয়োজনীয় কল্পিত অভাব সৃষ্টি ক'রে সেগুলি মোচনের জন্য শ্রীভগবানের কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করিও না; বরং তাঁর "যোগক্ষেমং বহাম্যহম্" এই শ্রীমুখের স্বীকারোক্তিতে দৃঢ় আস্থাবান্ হ'য়ে তোমরা সর্ব্বদা তাঁর মঙ্গলময়ী ইচ্ছা ও কৃপাকে লক্ষ্য ক'রে চলিও। যখন যাহা দিবার প্রয়োজন হইবে তখন তাহা তিনি নিশ্চয়ই তোমাদিগকে দিবেন, তার জন্য ব্যস্ত ও চিন্তিত হইবার দরকার নাই। আর একথাটিও তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে,—'পাইবার উপযুক্ত হইলে তোমরা অবশ্যই পাইবে এবং তিনি না দিলে কেহ কিছু পাইতে পারে না'।

অতঃপর 'ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিশোধ' সম্বন্ধে তোমাদিগকে কিছু বলিতে ইচ্ছা করি মনোযোগ দিয়া শুন।

ক্রোধ, হিংসা ও প্রতিশোধ।

দেখ, ক্রোধ, হিংসা এবং প্রতিশোধ এগুলি মায়ার বৃত্তি। এই গুলি মনে উদয় হইবামাত্র সাধক ভক্তের সাধকোচিত জ্ঞানকে আবৃত ক'রে ফেলে এবং তাঁহার চিত্তের স্বাভাবিক সাম্যাবস্থা নষ্ট ক'রে দিয়ে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে; কাজেই এইগুলি সাধক ভক্তের পক্ষে সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। তোমরা সহসা যাহাতে ঐ সকল প্রবৃত্তির বশীভূত হ'য়ে না পড় সে বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে।

হিংসাপ্রবৃত্তির একটা স্বভাব এই যে, বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া পাইলে হিংসার মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হয় এবং প্রতিক্রিয়া না পাইলে অর্থাৎ হিংসিত ব্যক্তির পক্ষ হইতে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না থাকিলে হিংসাকারীর হিংসাপ্রবৃত্তি আপনা হ'তেই মন্দীভূত হইয়া যায়। সেটি কিরূপ জান? যেমন উনান হ'তে কাঠ টেনে নিলে আগুন আপনা হ'তেই নিবে যায়, সেইরূপ কেহ তোমাকে যতই কেন হিংসা করুক না, তুমি যদি কোনরূপ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না ক'রে নীরবে তাহা সহ্য ক'রে যেতে পার, তবে তোমার হিংসাকারী ব্যক্তি আপনা হ'তেই অনুতপ্ত হ'য়ে তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইবে; কেননা, **নিরপরাধ ব্যক্তির উপর অবাধ অত্যাচার প্রকৃতি কখন অনুমোদন করেন না।** যাঁরা সাধকশ্রেণীভুক্ত, এবিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত 'তরোরিব সহিষ্ণুনা'—এই উপদেশ বাণী তাঁদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন এবং অনুসরণীয়। এই সহিষ্ণুতার ক্ষমতা এত বেশী ও অব্যাহত যে, জাগতিক সমস্ত পশুবলের উপর ইহা আধিপত্য করিতে সমর্থ।

আরও দেখ অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণতার ফলে মানুষ অতি সামান্য কারণে উত্তেজিত হ'য়ে পড়ে, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ লইবার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। মনে কর, তুমি একটা রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছ, একটা লোক তাড়াতাড়ি তোমার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে দৈবাৎ তোমার গায়ে একটা ধাক্কা লাগলো, তাতেই তুমি হয়তো হট্ ক'রে চ'টে গেলে; কিন্তু তুমি বুঝতে পারলেনা যে, তোমার অজ্ঞাতসারে মায়া তোমাকে একটু নাচিয়ে দিয়ে গেল। একটু আধটু অসাবধানতাবশতঃ ভিড়ের মাঝে এরূপ ঘটনা যে না ঘটে তা নয়, কিন্তু ক্রোধী স্বভাবের ফলে ঐ লোকটির অনিচ্ছাকৃত সামান্য একটা ধাক্কা খেয়ে তার উপরে তুমি একেবারে তেলে বেগুণে জ্বলে উঠলে এবং তাকে হয়তো অকথ্য

ভাষায় গালি দিয়ে ফেল্‌লে, এমন কি, হয়তো তাহাকে প্রহার করিতেই উদ্যত হইলে। কিন্তু মনে ক'রে দেখ দেখি, এই সংসারে তার চেয়ে কত বড় বড় বিরাট ধাক্কা খেয়ে মানুষকে হাবুডুবু খেতে হ'চ্ছে; সে সব তো বেশ নীরবে সহ্য ক'রতে হ'চ্ছে। তাই বলি, ঐরূপ স্থলে যাহাতে হটাৎ ক্রোধের উদ্রেক না হয় অর্থাৎ হটাৎ সামান্য কারণে কাহারও উপর চ'টে না যাও, সেবিষয়ে সর্ব্বদা একটু হুঁস্ জাগিয়ে রাখবে।

এই ক্রোধ বা হিংসা-প্রবৃত্তি সময়ে সময়ে এমন গোপনভাবে অন্য আকারে এসে আমাদের ভিতর প্রবেশ করে যে, আমরা সহসা ইহাকে ধরিতে পারি না; অনেক সময় রহস্য করিতে গিয়া আমরা একটা প্রতিশোধ বা জেদের বশবর্ত্তী হইয়া পড়ি। এই জেদ বা প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা আপাততঃ রহস্যাকারে প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু ইহা ক্রমে রহস্যের ন্যায়সঙ্গত সীমা অতিক্রম ক'রে আমাদের অজ্ঞাতসারে অনেক ক্ষতি ক'রে থাকে। যেমন সমুদ্রের তরঙ্গে মিশ্রিত মৃত্তিকা অল্পে অল্পে জমিয়া কালে একটা প্রকাণ্ড দ্বীপাকারে পরিণত হয়, সেইরূপ এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জেদের সমষ্টি কালে অহঙ্কার রূপে পরিণত হ'য়ে মানবের নৈতিক জীবনে অনেক ক্ষতি করে। কাজেই যে কোন কারণেই উদয় হউক্ না এবং যতই কেন ক্ষুদ্র হউক্ না, চরিত্রের হানিকর এরূপ জেদ বা প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা আসা মাত্রই তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে; সামান্য রহস্য ব'লে তাহাকে উড়াইয়া দেওয়া অর্থাৎ প্রশ্রয় দেওয়া কোন মতেই কর্ত্তব্য নহে; যেহেতু সামান্য জেদও প্রতি-হিংসার নামান্তর মাত্র। অবশ্য রহস্যেরও প্রয়োজনীয়তা আছে; স্থল-বিশেষে একটা পবিত্র এবং ক্ষতিশূন্য রহস্যের দ্বারা নির্দ্দোষ আনন্দ এবং হাস্যের অভিব্যক্তি হ'য়ে থাকে, তাহাতে দেহের ক্লান্তি এবং অবসন্নতা কথঞ্চিৎ বিদূরিত হইয়া একটা সজীবতা (Refreshment)

আনয়ন করে। কিন্তু ঐ রহস্য যাহাতে উহার ন্যায়সঙ্গত সীমা অতি-ক্রম না করে সে বিষয়ে যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন। তোমরা শুনিলে হয়তো আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যাবে যে, যে ভুবনমঙ্গল হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন মানবের মনের সমস্ত আবর্জ্জনারাশী দূর ক'রে দেয়, সমস্ত অমঙ্গল নাশ ক'রে দিয়ে সর্ব্ব মঙ্গল উদয় করে, সেই সঙ্কীর্ত্তনের ভিতর দিয়াও ধর্ম্ম-শিক্ষার ব্যপদেশে ঐ বিদ্বেষ বা ঘৃণার ভাব—ঐ প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা—অনেক সময় সাত্ত্বিক মোহগ্রস্ত সাধকদিগের মধ্যেও সঞ্চারিত হ'য়ে পড়ে। "সে ভড়ুয়া গ্রাম্য শূকর", "তবে লাথি মার তার শিরে", "সেই সে পাষণ্ড" প্রভৃতি কীর্ত্তনের পদাংশগুলি যে এইরূপ ঘৃণা ও বিদ্বেষভাবের যথেষ্ট পরিচায়ক এবং 'ভক্ত' নামধেয় বৈষ্ণবগণ উপরোক্ত পদাংশগুলি সঙ্কীর্ত্তনের সময় যে মনে মনে অপর জনসাধারণ হইতে নিজেদের একটা প্রাধান্য-গর্ব্ব পোষণ করেন, একটু লক্ষ্য করিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

এই প্রসঙ্গে আর একটী কথা তোমাদিগকে বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শুন এবং স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও। দেখ, শ্রীভগবানে প্রেম-ভক্তি লাভই সাধক ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য; কিন্তু 'হিংসা' ও 'প্রেম' এই দুইটী পরস্পরের বিশেষ অন্তরায় এবং পরিপন্থী। এই দুইটী বৃত্তি কখন একসঙ্গে থাকিতে পারে না। তাই বলি, তোমাদের ভিতর যদি কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র হিংসার ভাব কোথায়ও লুক্কায়িত থাকে, নিজেদের অন্তরের মধ্যে তন্ন তন্ন ক'রে অনুসন্ধান ক'রে সেটাকে বার ক'রে ফেল; আগে সে আবর্জ্জনা ঝাঁট দিয়ে বার-বাড়ীতে ফেলে দিয়ে এস; তারপর প্রেমভক্তি লাভ ক'রতে চেও।

দেখ, এই হিংসা বা বিদ্বেষের মূলে প্রায়শঃই কোন না কোন প্রকার স্বার্থ জড়িত থাকে; ইহা একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝা যায়।

যেখানেই এই স্বার্থে আঘাত পড়ে' সেখানেই এই ক্রোধ, হিংসা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হ'তে দেখা যায় এবং সেখানেই প্রতিহিংসা বা প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা হ'য়ে থাকে। কাজেই, যিনি যতটা পরিমাণে তাঁর স্বার্থ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবেন, এই অবনত প্রবৃত্তিগুলি তাঁর ততটা পরিমাণে মন্দীভূত হ'য়ে যাবে এবং তিনি ততটা পরিমাণে তাঁর সাধকোচিত চরিত্রের বৈশিষ্ট রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন। সাধক ভক্ত অবশ্যই প্রেমের দ্বারা কামকে, উদারতার দ্বারা সঙ্কীর্ণতাকে এবং স্বার্থত্যাগ দ্বারা ক্রোধ হিংসা ও বিদ্বেষকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন।

প্রশ্ন। আমাদের মন এমনই অবনত সংস্কারাচ্ছন্ন যে, যদি কেহ আমাদের স্বার্থে সামান্য একটু আঘাত করে, অমনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি আমাদের একটা হিংসার ভাব জেগে ওঠে; এই হিংসাপ্রবৃত্তি ত্যাগ করিবার কি কোন সহজ উপায় নাই?

উত্তর। দেখ, এই হিংসাপ্রবৃত্তি ও বিদ্বেষভাব ত্যাগ করিবার একটা উপায় আছে। সেটা কিরূপ জান? ভালবাসা এবং হৃদয়ের উদারতা দ্বারা মানবমাত্রকেই 'আত্মীয়' বোধ করা অর্থাৎ 'আপনার জন' মনে করা। যখনই মানুষমাত্রকেই 'আপনার জন' ব'লে মনে হবে, তখনই ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি অবনত প্রবৃত্তিগুলি আপনা হ'তেই স'রে যাবে; তখন তাদিগকে মন থেকে তাড়াতে আর বেশী বেগ পেতে হবে না। অতএব তোমরা মানবমাত্রকেই 'আপনার জন' মনে ক'রে ভালবাসতে অভ্যাস করিও; তাহা হইলে ক্রমশঃ তোমরা অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে লোকের প্রতি ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্ট মনোবৃত্তিগুলি বর্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে এবং তোমাদের সাধকোচিত চরিত্র অতি সহজেই গঠিত হইবে। মনে রেখো—**একমাত্র ভালবাসা ও প্রেমের কাছে সমস্ত জগৎ নতমস্তকে বশীভূত হ'য়ে যায়।**

অসৎ প্রসঙ্গের আলোচনা।

দেখ, সাধক ভক্ত কখন কোনপ্রকার অসৎ প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন না। সাধকের পক্ষে কায়, মন ও বাক্যে সর্ব্বদা একটা পবিত্র ভাব রক্ষা করা যে একান্ত প্রয়োজন একথা বোধ হয় তোমাদিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইতে হইবে না। অতএব যখনই যে কোন কারণেই হউক্, যদি মনে কোনরূপ অপবিত্রতা বা মলিনতা আসিবার উপক্রম হইবে, তৎক্ষণাৎ উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। সাধারণতঃ যে সকল কারণে মানুষের মন মলিন হয় অর্থাৎ মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়, 'অসৎ প্রসঙ্গের আলোচনা' তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এই অসৎ প্রসঙ্গের অবতারণা আবার অসৎ লোকের সহিত সঙ্গের ফলেই হইয়া থাকে; তাই, একটা চলিত কথায় লোকে ব'লে থাকে;—"সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ"। বাস্তবিক, কেবল অসৎসঙ্গের ফলেই মানুষের সমস্ত সদ্‌গুণ নষ্ট হ'য়ে যায়—দেবোপম চরিত্রবান্ ব্যক্তি একেবারে চরিত্রহীন ও পশুতুল্য হ'য়ে পড়ে। এই অসৎ সঙ্গ বলিতে কেবল যে অসৎ-স্বভাব-সম্পন্ন কুলোকের সঙ্গই বুঝিতে হইবে তাহা নহে, কুৎসিত ভাব ও অসৎ প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ কুপুস্তকাদি পাঠ, কুৎসিত ভাবব্যঞ্জক চিত্রাদি দর্শন এবং জঘন্য মনোবৃত্তিগুলির উদ্দীপনকারী ইতরভাবমিশ্রিত সঙ্গীতাদি শ্রবণ, এগুলিকেও অসৎ সঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিতে হইবে; কারণ এইগুলির দ্বারাও মানব চরিত্রের যে যথেষ্ট অবনতি ঘটে তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব তোমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইবার জন্য বলিতেছি যে, **বরং মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিবে সেও ভাল, তথাপি কখনও কোন প্রকার**

কুৎসিত প্রসঙ্গের আলোচনা করিবে না বা কেহ কোন অসৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করিলে তাহা শ্রবণ করিবে না। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল রঘুনাথ দাসকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তোমরা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া তদনুযায়ী আচরণ করিবে। যথা,—

"গ্রাম্য কথা না শুনিবে গ্রাম্য বার্ত্তা না কহিবে।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

আরও দেখ, অনর্থক কতকগুলি জটিল, কুটিল কিম্বা মিথ্যা কথার অবতারণা করিলে তোমাদের মনের সাধকোচিত শান্ত অবস্থা :চঞ্চল ও উত্তেজিত হইতে পারে এবং উহার ফলে মনের মধ্যে এমন কতকগুলি অযথা চিত্তমালিন্য আসিয়া পড়িতে পারে যে, তাহাতে মন অনেক নিম্নগামী হইয়া সাধকজীবনের যথেষ্ট ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তোমাদিগকে তো ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে সাধক ভক্ত নিজের মনটিকে একটা না একটা সমুন্নত আদর্শে সর্ব্বদা চিন্তাশীল রাখিবেন; তাহা হইলে মনে কোন প্রকার সাধুজননিন্দিত অকথ্য বা অশ্রাব্য কুৎসিত প্রসঙ্গের উদয় হইবার অবসর হইবে না। মনে রেখো, যিনি ভক্তি পথের পথিক, শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি প্রেম লাভই যাঁহার একমাত্র লক্ষ্য, তিনি সর্ব্বদা এমন কথা কহিবেন বা এমন প্রসঙ্গের আলোচনা করিবেন যাহার দ্বারা মানবাত্মার উন্নতি এবং বিকাশোপযোগী কিছু না কিছু শিক্ষা হয়। ভক্তের কথাগুলিও এমন শিষ্ট, শ্রুতিমধুর এবং হৃদয়গ্রাহী হওয়া চাই যাহাতে শ্রোতা মাত্রেরই হৃদয় তৃপ্ত, স্নিগ্ধ ও শীতল হইয়া যায়।

ভ্রম, আলস্য ও অবহেলা।

দেখ, সাধক মাত্রেরই কতকগুলি নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে। ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে সেই কর্ত্তব্য কর্ম্মগুলি নিয়মিতরূপে সম্পাদন করা তাঁহাদের উচিত। যাঁহারা সাধকশ্রেণী-ভুক্ত হ'য়েছেন, তাঁদের পক্ষে কোন্ কার্য্যটি কর্ত্তব্য আর কোন্‌টি অকর্ত্তব্য ইহা নিরূপণ করিবার জন্য বিশেষ চিন্তিত হইবার প্রয়োজন নাই; যেহেতু **আপন আপন ইষ্টদেবতা শ্রীগুরুদেব কর্ত্তৃক নিরূপিত এবং আদিষ্ট কর্ম্মগুলিই তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।**

এখন, এই কর্ত্তব্য কর্ম্মে ভ্রম, আলস্য ও অবহেলা—এগুলি আত্মার অবনতির লক্ষণ। কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা স্থির জ্ঞান থাকা অর্থাৎ কর্ত্তব্য কার্য্যকে শ্রীগুরুদেবের আদেশ মনে ক'রে সুদৃঢ় রূপে আঁকড়ে ধ'রে থাকা সাধকের পক্ষে আত্মোন্নতির পরিচায়ক; কর্ত্তব্যের করণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই; যেহেতু কর্ত্তব্যের অকরণে প্রত্যবায় ঘটে। তোমরা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি শাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবে যে, ভ্রম, আলস্য ও তন্দ্রা এগুলিকে তমোগুণের লক্ষণ বলা হইয়াছে; বলিতেকি, এই আলস্যেরই পূর্ণ পরিণতিকে এক প্রকার মৃত্যু বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে হইলে সাধককে যখন রজোগুণ এবং তমোগুণগুলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিশুদ্ধ সত্বগুণ আশ্রয় করিতে হইবে, তখন কর্ত্তব্য কর্ম্মে আলস্য বা অবহেলা—যেগুলি তমোগুণের লক্ষণ—সেগুলি সাধকের পক্ষে অবশ্য বর্জ্জনীয়। শারীরিক দুর্ব্বলতাবশতঃ অথবা অধিক পরিশ্রমের পর কখন কখন আমাদের একটা সাময়িক আলস্যবোধ আসে এবং

কর্ত্তব্য কর্ম্মে একটু আধটু ত্রুটি হ'য়ে থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া অত্যধিক আলস্য আসিবে কেন? অতএব এবিষয়ে যাহাতে তোমাদের মনের বল অটুট এবং উৎসাহ অদম্য থাকে সেদিকে তোমাদিগকে বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে এবং সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, **সম্পূর্ণ আলস্যশূন্যতাই আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নতিশীল জীবনের লক্ষণ।**

আবার দেখ, নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য ও অবসাদ এসব জীবের স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহেরই ধর্ম্ম। জীবের জড়দেহে এগুলি যতটা পরিমাণে দেখা যায়, সূক্ষ্মদেহে তদপেক্ষা অনেক কম; আবার চিন্ময় অর্থাৎ সচ্চিদানন্দময় দেহে এগুলি মোটেই নাই। যাঁরা কেবল স্থূল দেহটা নিয়েই বেশী ব্যতিব্যস্ত থাকেন, তাঁরা নিজেদের মনকে উন্নত-চিন্তাশীল করিয়া সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন না; কাজেই এই স্থূলদেহেই তাঁদের অত্যধিক অভিনিবেশ বিদ্যমান থাকে; তাই আলস্য ও অবসাদ তাঁদেরই বেশী দেখা যায়। যাঁহারা সাধু, যাঁহারা মহৎ, তাঁহারা সর্ব্বদা সূক্ষ্ম এবং উন্নত চিন্তাশীল, কাজেই স্থূলদেহে অভিনিবেশ তাঁহাদের খুব কম। নিদ্রা, তন্দ্রা, আলস্য এগুলিকে প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা স্থূল দেহাভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের চেয়ে তাঁহাদের অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। যাঁরা সাধন পথের পথিক তাঁদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, তাঁরা এখন আধ্যাত্মিক পথের যাত্রী, তাঁদের পক্ষে কেবল এই স্থূল দেহটার ভরণ পোষণ, আহার বিহার ইত্যাদি নিয়ে সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত থাকলে চ'লবে না; যতটা পারা যায়, মহতের পদানুসরণ করিয়া সূক্ষ্ম ও উন্নত চিন্তাশীলতা দ্বারা অর্থাৎ সর্ব্বদা ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্ব প্রভৃতি সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলি চিত্তে ধারণা করিয়া দেহাত্মবোধশূন্য

হ'তে চেষ্টা করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক তত্ত্বমাত্রই সূক্ষ্মচিন্তামূলক; অতএব সাধক ভক্ত সর্ব্বদা সূক্ষ্ম এবং উন্নত চিন্তাশীল হইয়া আপন শ্রীগুরুদেব কর্তৃক উপদিষ্ট কর্ত্তব্য কর্ম্মে অনলস হইতে সচেষ্ট হইবেন এবং আলস্য তন্দ্রা ও অবহেলা এগুলি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিয়া নিজের সাধনপথে অবহিত হইবেন।

মহৎ চরিত্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা।

ইতঃপূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি যে, যিনি সাধকশ্রেণীভুক্ত হ'য়ে ভক্তি লাভ করিতে চান, তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অদোষদর্শী ও গুণগ্রাহী হইতে হইবে। অতএব তোমরা দোষদর্শী হইয়া কখন মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত্র সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে যাইও না। সদুপদেশ ব্যতীত জ্ঞানলাভ করা যায় না; আর সেই সদুপদেশ মহৎ ব্যক্তিগণের নিকট হইতেই গ্রহণ করিতে হয়: কিন্তু সদুপদেশ গ্রহণার্থী হইয়া কোন মহৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিতে যাইবার পূর্ব্বে এ কথাটি তোমাদিগকে অবশ্যই মনে রাখিতে হইবে যে, জীবমাত্রই দোষে গুণে জড়িত, মহৎ ব্যক্তিগণের চরিত্রে গুণাংশের আধিক্য থাকিলেও একেবারে দোষাংশবর্জ্জিত নাও হ'তে পারে। তোমরা এ কথা বিস্মৃত হ'য়ে কদাচ কোন মহৎ ব্যক্তির চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইওনা। তোমাদের জ্ঞানলাভের জন্য যতটুকু প্রয়োজন তাহা তোমরা অবশ্যই তাঁর কাছে পাইবে; কিন্তু তদতিরিক্ত যাহা কিছু তাঁহাতে আছে বা ছিল তাহা তোমাদের সমালোচনা করিবার প্রয়োজন নাই: যেহেতু তাহা তোমাদের বিচারের বিষয়ীভূত নয়, কেননা তোমরা জ্ঞানোপদেশ-প্রার্থী। মহতের চরিত্র সম্বন্ধে বিরুদ্ধ

সমালোচনা করিতে গেলেই তাঁহার নিকট হইতে তোমার যে সমস্ত জ্ঞাতব্য আছে অর্থাৎ যে সমস্ত উন্নত জ্ঞান লাভের প্রত্যাশা আছে, সেগুলি তোমাতে আবির্ভাবের অর্থাৎ সঞ্চারের পথ রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। দেখ, প্রদীপ আলো দেয় বটে, কিন্তু তার শীষে কালিও পড়ে; তোমার আলোর প্রয়োজন, আলো লও এবং আলোয় আলোয় চ'লে যাও; কিন্তু তা না ক'রে যদি প্রদীপের সমালোচনা ক'রতে গিয়ে বল 'কালি পাড়াটা প্রদীপের পক্ষে খুবই অন্যায়,' তবে অবশ্য তোমার কাছে প্রদীপ নিবিয়ে দিতে হবে। ফলে হবে কি জান? আলো পাওয়া আর তোমার ভাগ্যে ঘ'টবেনা, তোমাকে প্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে অন্ধকারে ব'সে থাকতে হবে।

মহৎ ব্যক্তির চরিত্রে ভ্রমবশতঃ যদি কখন কোন দোষ দৃষ্ট হয় তবে অন্যে তাহার সমালোচনা করিবার পূর্ব্বেই তিনি নিজে তাহা অকপটে সর্ব্বসমক্ষে ব্যক্ত করিতে পারেন এবং তাঁর চরিত্রের দোষাংশ অতি শীঘ্রই পরিত্যাগ করিয়া নিজে আরও পবিত্র ও নিষ্কলঙ্ক হইতে পারেন। কিন্তু তাই বলিয়া সেই বিষয় লইয়া প্রতিকূল সমালোচনা করিবার তোমার আমার প্রয়োজন নাই। এরূপ ক্ষেত্রে মহৎচরিত্রের আপাতঃপ্রতীয়মান কোনরূপ বিক্রিয়া সাধকের পক্ষে উপেক্ষা ক'রে যাওয়াই ভাল। তাহা না করিয়া যদি তোমরা তাহার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে থাক, তবে কোন দিনই তোমরা সাধু মহতের নিকট হ'তে কোন জ্ঞান সঞ্চয় করিতে পারিবে না।

মনে কর, একজন খুব অনুগত শ্রদ্ধাবান্ শিষ্য তাঁর নিজের অভীষ্ট দেবতা শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে কত উন্নত দিব্য জ্ঞানালোক পাইতেছেন; ভক্তি ও ভগবৎতত্ত্বসম্বন্ধীয় কত মধুর ভাব প্রাণে উপলব্ধি করিয়া নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করিতেছেন। কিন্তু

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ যদি তিনি তাঁর শ্রীগুরুদেবের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বিচারবুদ্ধি ও বিরুদ্ধ সমালোচনা ক'রে মনে করেন,—'প্রভুর এই কাজটা করা ভাল হয় নাই; তাঁর মত লোকের পক্ষে এরূপ নিন্দনীয় আচরণটি করা নিতান্তই অন্যায় ও অশোভনীয় হইয়াছে'—তবে অবশ্যই তাঁর শ্রীগুরুদেবের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার লাঘব এমন কি নাশ পর্য্যন্ত হইতে পারে এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর আচার্য্যদেবের নিকট হইতে সমুন্নত জ্ঞানালোক গ্রহণের ক্ষমতা শিষ্যের অজ্ঞাতসারে নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; এমন কি, দিব্য জ্ঞানালোক শিষ্যে সঞ্চারিত হইবার পথ একেবারে বন্ধ অর্থাৎ রুদ্ধ হইয়া যাইতে পারে; কেননা শ্রীগুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধাবান্ এবং তাঁর সদুপদেশে আস্থাবান্ হওয়া ভিন্ন দিব্যজ্ঞান লাভের উপায়ান্তর নাই। এরূপ স্থলে কিরূপ ক্ষতি হয় জান? শিষ্য তখন ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে সন্দেহদোলায় প'ড়ে মায়া-কবলিত হ'য়ে যান; কাজেই তাঁর আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুদিনের জন্য স্থগিত হ'য়ে যায়। আলোর পর হটাৎ অন্ধকার যেমন ঘোরতর দেখায়, সেইরূপ শিষ্যের চিত্ত শ্রীগুরুর আচরণে সংশয়াকুল হইবামাত্র শিষ্য শ্রীগুরুদেবের সমভূমি হইতে অনেক নিম্নে প'ড়ে যান অর্থাৎ উন্নত জ্ঞানালোক গ্রহণের ক্ষমতা তখন আর তাঁর থাকে না।

আরও দেখ, সাধু মহাপুরুষগণের চরিত্রে যদি কখন আপাতদৃষ্টিতে কোন কিছু দোষাবহ বলিয়া মনে হয়, তথাপি তোমরা জানিয়া রাখিও তাঁহাদের চরিত্রের একটা বিশিষ্টতা থাকে এই যে, তাঁদের আচার ব্যবহার, চাল চলন সর্ব্বাংশে ঠিক সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় নহে। তাঁহারা কি উদ্দেশ্যে কখন কি করেন, কখন কি ভাবে চলেন তাহা সব সময় আমরা সবিশেষ জানিতে বা বুঝিতে পারি কি? তাই শাস্ত্রে এ সম্বন্ধে উল্লেখ দৃষ্ট হয়,—'মহতের ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে না বুঝয়'।

সাধু মহাপুরুষগণ যে শ্রীভগবানের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত জীব একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। তাঁদের সুগভীর চরিত্রের একটা বিশেষত্ব এই যে, দৈবাৎ যদি তাঁদের আচরণে কোন ভ্রম-প্রমাদ উপস্থিত হয়, তাঁরা অতি সহজেই তাহা ধ'রে ফেলেন অর্থাৎ নিজে নিজেই বুঝিতে পারেন এবং অতি সত্বরেই সেটি 'পাস্' (pass) ক'রে অর্থাৎ কাটিয়ে চ'লে যান; সেই দোষ বা ভ্রম তাঁহাদিগকে ছুঁইতেও পারে না অর্থাৎ তাঁহাদের চরিত্রের মহত্বকে খর্ব্ব বা কলুষিত করিয়া বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে না। দুটা একটা অবশ্যম্ভাবী ভ্রম-প্রমাদকে তাঁরা তাঁদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথে কোন প্রতিবন্ধক ব'লে মনে করেন না অর্থাৎ তাহাতে তাঁদের মনের জোর কমিতে দেখা যায় না। তাঁদের সমুন্নত চরিত্রে দৈবঘটিত দুটা একটা ভ্রম বা দোষ আপনা হ'তেই অতি শীঘ্র সংশোধিত হ'য়ে যায়, সেগুলি দূরীকরণের জন্য তাঁরা বিশেষ ব্যস্ত হন না বা অপর কাহারও সদুপদেশ অথবা সাহায্যের প্রয়োজন বোধ করেন না। মোট কথা, সাধু মহাপুরুষগণের নিকট হইতে আমাদের জানিবার বুঝিবার এবং শিখিবার অনেক কিছু আছে, তাঁদের চরিত্রের মহৎ গুণগুলিই আমাদের গ্রহণীয় এবং অনুকরণীয়। দোষ-দর্শনপূর্ব্বক তাঁহাদের মহৎ চরিত্রের বিরুদ্ধে সমালোচনা করা সাধক ভক্তের পক্ষে সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য, যেহেতু উহা ভক্তিলাভের পক্ষে সম্যক্ বাধক। অতএব এ বিষয়ে তোমরা সর্ব্বদা সাবধান হইও।

পরিশেষে তোমরা আমার এই কথাটি বিশেষ করিয়া মনে রাখিও যে,—সাধু মহাত্মাদিগের আচরণ 'বিধি নিষেধের পার'; তাঁহাদের অগাধ চরিত্র সম্যক না বুঝিয়া সহসা তাহার একটা বিরুদ্ধ সমালোচনা করা নিতান্ত অজ্ঞানতার পরিচায়ক। সর্ব্বভুক্ বহ্নির পক্ষে যেমন সর্ব্ব-ভোজন দোষাবহ নহে, তদ্রূপ তেজীয়ান্ মহৎ ব্যক্তিগণের পক্ষে

দৈবঘটিত দুটি একটি নিষিদ্ধ আচরণও নিন্দনীয় নহে। এ বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমুখে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মাহাত্ম্য-বর্ণন প্রসঙ্গে যে শিক্ষা-শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা সাধক ভক্তের পক্ষে সাদরে গ্রহণীয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সতর্কবাণী। যথা,—

"গৃহ্ণীয়াদ্ যবনীপাণিং বিশেদ্ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।
তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দ-পদাম্বুজম্॥"

* * * * * *

"মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ।
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য—বলে গৌরচন্দ্র॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

যদিও ইতঃপূর্ব্বে 'মহৎ-অপরাধ' প্রবন্ধে এই বিষয়টি যৎকিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে তথাপি সাধকজীবন লাভেচ্ছু ব্যক্তির পক্ষে এ বিষয়ে অত্যধিক সতর্কতা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া এস্থলে পুনরায় আরও কিছু আলোচিত হইল। সদুপদেশের পুনরুল্লেখ দোষাবহ না হইয়া গুণেরই হইয়া থাকে।

অভিমান ও অহঙ্কার।

দেখ, অভিমান এবং অহঙ্কার ইহারা মায়িক বৃত্তি; এই দুইটি বৃত্তি জীবকে সর্ব্বদা ভগবদ্বহির্ম্মুখ করিয়া থাকে। ইহারা সাধারণ জীবের স্বাভাবিক জ্ঞানকে, এমনকি, সময়ে সময়ে সাধক ভক্তগণের সাধকোচিত জ্ঞানকেও মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। কাজেই সাধনপথে ইহাদের মত অনিষ্টকারী শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। সাধারণ জীবের মধ্যে ইহারা ক্রোধ,

হিংসা, প্রতিশোধ প্রভৃতি রাজসিক বা তামসিক বৃত্তির ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়, আর সাধক ভক্তগণের মধ্যে সাধন ভজন প্রভৃতি সাত্বিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়াও অতি সূক্ষ্মরূপে এগুলি প্রকাশ পাইতে দেখা যায়। খুব সতর্ক হ'য়ে হুঁস্ জাগিয়ে না রাখলে ইহাদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। দেখ, কেঁচো মাটির নীচে লুকিয়ে থাকে সত্য, কিন্তু যতই কেন লুকিয়ে থাকুক না, বিশ হাত মাটি খুড়েও কেঁচোকে খুঁজে বার করা যায়; কিন্তু অভিমান বা অহঙ্কার মানুষের মনের ভিতর কোথায় যে লুকিয়ে থাকে, তা কিছুতেই সহজে খুঁজে বার করা যায় না। তোমরা হয়তো শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইবে যে, সাধনপথে একমাত্র অভিমান বা অহঙ্কার দ্বারা সাধকের যত বেশী অনিষ্ট সাধিত হয়, আমার মনে হয়, কাম, পানদোষ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি দ্বারায়ও তত অনিষ্ট সাধিত হয় না; কারণ কামাদির প্রলোভনে প'ড়ে সাধক না হয় সাময়িক কিছুদিনের জন্য কষ্ট পান, দুদিন পরে ঐগুলি আপনা হ'তেই সেরে যায়; কিন্তু অভিমান বা অহঙ্কার এমন সূক্ষ্মভাবে আমাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থেকে আমাদের সাধন পথে বিঘ্ন উৎপাদন করে যে, কিছুতেই তাহাদিগকে আমাদের মন থেকে তাড়ান যায় না।

দেখ, বিষয়ী ব্যক্তির ধনাদির অহঙ্কার, বলবান ব্যক্তির শারীরিক বলের অহঙ্কার প্রভৃতি সাধারণ স্থূল বস্তু বিষয়ের অহঙ্কার দমন করিবার নানাপ্রকার উপায় কথিত আছে; কিন্তু সাধকদিগের মধ্যে সাধন ভজন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়ে সূক্ষ্ম সাত্বিক অহঙ্কার বা অভিমান প্রশমিত করিবার উপায় কি জান? উহার একমাত্র উপায় এই যে, সর্ব্বদা নিজের একটা দৈন্যাত্মিকা বুদ্ধির যাজন করা অর্থাৎ নিয়ত নিজেকে 'তৃণাদপি সুনীচ' মনে ক'রতে অভ্যাস করা। ইহার ফলে সাধকের অন্তর্নিহিত সুপ্ত অভিমান ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া যায়। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের

এই অভিমান বা অহঙ্কারের ক্রিয়া অনেক সময় প্রকাশ পায় না সত্য, তাই বলিয়া তখনই যে আমরা অভিমান-বিজয়ী হইতে পারিয়াছি, এমন কথা বলা যায় না ; যেহেতু আমাদের নিদ্রিত অবস্থায়ও এই অহঙ্কার জেগে থাকে এবং আমাদের সুপ্ত অবস্থায় সময়ে সময়ে এই অহঙ্কার কাম ক্রোধাদি রূপে উদয় হইয়া আমাদের আত্মোন্নতির পথে অনেক বাধা প্রদান ক'রে থাকে। তাই শ্রীভগবানের কাছে আমাদের সর্ব্বদা প্রার্থনা এই যে, যেন আমরা শ্রীগুরুদেবের চরণে অচলা মতি রাখিয়া এবং সর্ব্বদা 'তৃণাদপি সুনীচ' হইয়া এই অভিমান ও অহঙ্কার শূন্য হইতে পারি।

আরও দেখ, সাধকমাত্রেরই মনে রাখা উচিত যে, 'আমি খুব জ্ঞানী,' 'আমি অন্যের অপেক্ষা খুব ভাল বুঝি' বা 'আমি একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত' এইরূপ একটা অহঙ্কারাত্মক বোধ যেন ঘুণাক্ষরেও মনে উদয় না হয় ; যেহেতু এরূপ অহঙ্কারাত্মক বোধ সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল। যখন শ্রীভগবৎকৃপায় সাধকের এই প্রকার জ্ঞানের বা ভক্তির গর্ব্ব ভেঙ্গে চুরমার হ'য়ে গিয়ে তাঁর একটা দৈন্যাত্মিকা দিব্য বুদ্ধির উদয় হয়, তখনই সাধক ঠিক ঠিক নিরভিমানী হইতে পারেন।

আর একপ্রকার অভিমান আছে যাহা অতি অলক্ষিতভাবে সাধকের অন্তরে উদিত হ'য়ে থাকে। উহার বশবর্ত্তী হ'য়ে সাধক মনে করে— 'আমি শ্রীভগবানের সাধন ভজন করি, অতএব আমি অন্যাপেক্ষা খুব ভাগ্যবান্'। ইহাও একপ্রকার অহঙ্কার ; ভক্তিশাস্ত্র এই প্রকার আত্মশ্লাঘাসূচক অহঙ্কারকে 'সৌভাগ্যমদ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সাধকদিগের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্যমদ সাধ্যবস্তু লাভের পথে সমূহ অন্তরায় বলিয়া জানিও। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবানের রাসলীলা আলোচনা করিলে তোমরা জানিতে পারিবে যে, অন্যের কথা দূরে থাকুক, তাঁর

স্বরূপশক্তি গোপীগণেরও এইরূপ সৌভাগ্যমদ অর্থাৎ সৌভাগ্যজনিত অহঙ্কার উদয় হইয়াছিল তাই শ্রীভগবান্ গোপীগণের সহিত আনন্দক্রীড়া করিতে করিতে সহসা রাসমণ্ডলী হইতে অন্তর্দ্ধান করিয়াছিলেন। অতএব ধনৈশ্বর্য্যাদি সাধারণ বৈষয়িক বিষয়েই হউক্ আর সাধন ভজন প্রভৃতি আধ্যাত্মিক বিষয়েই হউক্, যাহাতে মনে কোন প্রকার অভিমান বা অহঙ্কার উদয় না হয়, সেদিকে তোমাদিগকে সর্ব্বদা একটা হুঁস্ জাগিয়ে রাখতে হবে ; সাধক ভক্ত এমন একটিও কাজ করিবেন না বা লোকের সহিত এরূপ কোন ব্যবহার করিবেন না, এমনকি, এরূপ একটি চিন্তাও করিবেন না যাহাতে বিন্দুমাত্র অহঙ্কার বা অভিমান প্রকাশ পায়। তবেই দেখ, সাধনপথে এ বিষয়ে কত বেশী সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন।

পরিশেষে তোমাদিগকে একটি রহস্যের কথা বলিতেছি, মনোযোগ দিয়া শুন এবং সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে চেষ্টা করিও। দেখ, পূর্ব্বেই তোমরা শুনিয়াছ যে, অভিমান ও অহঙ্কার মায়িক বৃত্তি। ইহারা যখন মানবকে মোহ বা অজ্ঞানতা দ্বারা অভিভূত করে, তখন মানুষ তাহার পারিপার্শ্বিক অন্যান্য সকলের অপেক্ষা নিজেকে 'বড়' ব'লে মনে করে। কিন্তু যাঁহারা সাধকশ্রেণীভুক্ত হইয়া ভক্তিপথের পথিক হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে 'বড়' হইতে হইলে অর্থাৎ আধ্যাত্মিক পথে অগ্রসর হইতে হইলে ঠিক ইহার বিপরীত দিক দিয়া চলিতে হইবে অর্থাৎ তাঁহাদিগকে বিনয়ের দিক দিয়া, দীনতার দিক দিয়া, সহিষ্ণুতার দিক দিয়া বাড়িয়া যাইতে হইবে। অপরের কাছে 'ছোট' হইয়া এবং প্রতিকূল ঘটনা বা অবস্থাগুলি সহ্য করিয়া চলিতে হইবে। তোমরা ভক্তিপথের পথিক, সর্ব্বদা মনে রেখো যে, 'বড়'র দিক দিয়ে তোমাদের বেড়ে যাবার আর সময় নাই। সেরূপ বেড়ে যাওয়া অর্থাৎ অভিমান ও অহঙ্কারে নিজেকে 'বড়' ব'লে মনে করা প্রকারান্তরে আধ্যাত্মিক পথে অবনতি

মাত্র। চলিত কথায় ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে যে,—'অহঙ্কার পতনের মূল'; আবার অন্যপক্ষে ইহাও বলা হইয়াছে যে,—'বড় হবি তো ছোট হ'। অতএব তোমরা সাধনপথের প্রবল শত্রু মনে ক'রে ঔদ্ধত্য, অভিমান ও অহঙ্কার এগুলিকে একেবারে বর্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে এবং খুব ধীরভাবে বিনয় ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক নিরভিমানী হইয়া নিজেদের সাধনপথে অগ্রসর হইবে।

ব্যবহারে কার্পণ্য ও অত্যধিক সঞ্চয়বুদ্ধি।

দেখ, সাধক ভক্ত যতই আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রসর হইতে থাকেন, ততই তাঁহার চিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থের এবং সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী কেটে উদার এবং মহান্ হ'তে থাকে; একথা ইতঃপূর্ব্বে তোমরা আরও কএকবার শুনিয়াছ। কাজেই যাঁহারা উদারচেতা তাঁহারা লোক-ব্যবহারে কদাচ কার্পণ্যের প্রশ্রয় দেন না; যেহেতু তাঁহারা জানেন যে, সামর্থ্যসত্ত্বে কৃপণতা করা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণতারই পরিচায়ক। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে এই স্থূল দেহ রক্ষার উপযোগী অন্ন বস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয় মাত্র; তদতিরিক্ত অর্থ যদি হস্তগত হয়, তবে তাহা অবশ্যই পরদুঃখমোচনের জন্যই ব্যয়িত হওয়া উচিত; কারণ সেইটিই অর্থের সদ্ব্যবহার এবং শ্রীভগবানের অভিপ্রেত। দেখ, নিরর্থক অর্থসঞ্চয়ে কোন ফল নাই; কারণ একটু চিন্তা করিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অতিসঞ্চয়কারীকে অবশ্যই একদিন না একদিন প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চিত-উদ্বৃত্ত অর্থ পরিত্যাগ ক'রে রিক্ত হস্তে চ'লে যেতে হবে। অতএব তোমরা এ বিষয়ে খুব সাবধান হইবে অর্থাৎ

শ্রীভগবদিচ্ছায় যদি কখন ন্যায্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থাদি তোমাদের হস্তগত হয়, তবে সঞ্চয়বুদ্ধি না করিয়া তাহা পরদুঃখ-মোচনের জন্য অকাতরে ব্যয় করিয়া যাইবে। সাধ্যায়ত্ত হইলে কখন কোন অভাবগ্রস্তের দুঃখ মোচনের জন্য অর্থব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইও না এবং কদাচ ব্যবহারে কার্পণ্য করিও না। মনে রেখো, অত্যধিক সঞ্চয়বুদ্ধি দ্বারা সাধকের ভক্তিভাব এবং ভগবন্নির্ভরতা মন্দীভূত হইয়া যায়। অতএব 'পেটভাতায় মজুরী' ক'রে 'পরের ধনে পোদ্দারী' যতটা ক'রে যেতে পারা যায় ততটাই লাভ।

অন্যপক্ষে এ কথাটিও তোমাদের জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে, **ঠিক ঠিক সৎপথে থেকে খুব ধনবান হওয়া যায় না, তবে কোনরূপে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী সাদাসিদে রকমের গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় হয় মাত্র।** শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"। এই 'বহাম্যহম্' এর অর্থ তোমরা এরূপ মনে করিও না যে, সৎপথে থেকে নিয়ত সাধন ভজন করিতে থাকিলে শ্রীভগবান্ আমাদিগকে প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া দিবেন; ইহার অর্থ এই যে নিত্যযুক্ত সাধকের জীবনধারণোপযোগী অন্ন বস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য যতটুকু অর্থের প্রয়োজন ততটুকু তিনি নিশ্চয়ই যোগাড় করিয়া দিবেন এবং তাঁহার রক্ষণা-বেক্ষণের একটা সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন। অত্যধিক সঞ্চয়বুদ্ধি সাধক ভক্তের পক্ষে বড়ই অনিষ্টকর; যেহেতু উহা সাধককে সর্ব্বদা ভগবদ্বহির্ম্মুখ ক'রে থাকে। আরও দেখ, ঐশ্বর্য্যশালী ধনবান ব্যক্তিগণের প্রয়োজনাতিরিক্ত সঞ্চিত ধনরাশী অনেক ক্ষেত্রে অন্যায়ো-পার্জ্জন-দোষদুষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত অর্থ যে কত গরীব দুঃখীর চোখের জলের ভিতর দিয়ে, কত নিরন্নের মুখের গ্রাস কেড়ে

নেওয়ার ভিতর দিয়ে সঞ্চিত হ'য়ে থাকে, তাহা তাঁহাদের ধনসঞ্চয়ের পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলেই জানিতে পারা যায়। ঐ সকল ক্ষেত্রে ধনী ব্যক্তিগণ নিজেরাই ঐরূপ অন্যায়ভাবে ধনসঞ্চয় করিয়া থাকুন অথবা তাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের মধ্যে যে কেহই ক'রে থাকুন এরূপ অত্যধিক ধনসঞ্চয়ের গোড়ায় যে যথেষ্ট গলদ থাকে তাহা অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই প্রমাণিত হইতে পারে।

শ্রীভগবানে ভক্তিলাভ করিতে হইলে অবশ্যই মনের স্থিরতা এবং পবিত্রতা সযত্নে এবং সর্ব্বাগ্রে রক্ষণীয়, কিন্তু অত্যধিক সঞ্চয়বুদ্ধি মনের স্থিরতা ও পবিত্রতা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট প্রতিকূল; যেহেতু উহাতে ভক্তির বিঘাতক অনেক মালিন্য আসিয়া পড়ে। অত্যধিক সঞ্চয়-বুদ্ধির দ্বারা নিয়ত ইতস্ততঃ ধাবমান্ ব্যক্তির চঞ্চল চিত্তে কদাচ ভগবদাবেশ হইতে পারে না; এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন,—"বিষয়াবিষ্ট-চিত্তস্য কৃষ্ণাবেশঃ সুদূরতঃ"। প্রয়োজনাতিরিক্ত ধনসঞ্চয়ের কথা দূরে থাকুক ভক্তিশাস্ত্রে বিষয়ী ব্যক্তির সঙ্গ, এমন কি, তৎপ্রদত্ত অন্নাদির আহারও ভক্তিকামীর পক্ষে বিষবৎ পরিত্যাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা,—

"বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতএব ভক্তি লাভের পক্ষে অত্যন্ত প্রতিকূল জানিয়া তোমরা অবশ্যই অত্যধিক সঞ্চয়বুদ্ধি ও কার্পণ্যকে একেবারে পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইবে।

অপরের প্রাণে আঘাত দেওয়া।

দেখ, যাঁরা সাধকজীবন লাভ করিতে চান তাঁদের আর একটি বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। ইতঃপূর্ব্বে 'ব্যবহারের স্নিগ্ধতা' প্রসঙ্গে তোমাদিকে বলিয়াছি যে, সাধকমাত্রেরই যাবতীয় ব্যবহার অতি স্নিগ্ধ এবং অপরের প্রাণস্পর্শী হওয়া উচিত। সাধক ভক্ত এমন কোন কার্য্য করিবেন না বা এমন একটি কথাও বলিবেন না যাহার দ্বারা কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগে। কাজেই যাঁরা ভক্তি-পথের পথিক, তাঁরা তাঁদের ব্যবহারে সর্ব্বদা এরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিবেন যেন তাহাতে সততার বিন্দুমাত্র হানি না হয় অর্থাৎ তাহার দ্বারা যেন কেহ মনে কোনরূপ কষ্ট না করেন। অতএব তোমরা হটকারিতা পরিত্যাগ ক'রে সংযত হ'য়ে এবং বিশেষ চিন্তাশীলতার সহিত বাক্য প্রয়োগ করিতে অভ্যাস করিবে। বাক্যকথনে যিনি যত বেশী চিন্তাশীল ও নিপুণ তিনি সাধকশ্রেণীভুক্ত হইবার তত অধিক যোগ্য। যিনি নিজ আচরণের দ্বারা কখন কাহারও প্রাণে আঘাত দেন না তিনি বাস্তবিক অজাতশত্রু। মোট কথা জেনে রেখো যে, যখনই তোমাদের ব্যবহারে কাহারও প্রাণে বিন্দুমাত্র কষ্ট হবে, এমন কি, যখনই কেহ তোমাদের সহিত বাক্যালাপ ক'রে মনক্ষুণ্ন হ'য়ে অসন্তুষ্টচিত্তে চ'লে যাবে, তখনই তোমরা সাধনপথ-ভ্রষ্ট হ'য়ে প'ড়বে। মনে থাকে যেন, ঐরূপ অন্যায় আচরণ দ্বারা তোমরা যে কেবল ঐ লোকটির প্রাণে আঘাত দিলে তা নয়, তদ্দ্বারা তোমাদের উপদেষ্টারও প্রাণে যথেষ্ট আঘাত দেওয়া হইল। অতএব তোমরা সর্ব্বদা ব্যবহারের সততা

সযত্নে রক্ষা করিও। এমন কাজ ক'রনা বা এমন কথা ব'লনা যাতে কাহারও প্রাণে সামান্য মাত্র ব্যথা লাগে।

অপরের প্রাণে আঘাতকারী ব্যক্তি কদাচ ভক্তি লাভ করিতে পারে না। শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামী-রূপে সর্ব্বজীবের হৃদয়াভ্যন্তরে বাস করিতেছেন; কাজেই কাহারও প্রাণে আঘাত দিলে শ্রীভগবানেরই শ্রীঅঙ্গে আঘাত দেওয়া হয়। জীবমাত্রকেই 'তাঁর' অর্থাৎ তোমারই উপাস্য দেবতা 'শ্রীভগবানের' জেনে সর্ব্বদা সকলের প্রতি একটা অকপট এবং নিঃস্বার্থ ভালবাসার ভাব পোষণ করিবে; তাহা হইলে তোমরা অচিরে শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইবে।

পরিশিষ্ট।

---:০:---

সাধক জীবনে ধর্ম্মানুশীলন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সাধকজীবন গঠনোপযোগী (১) **ভক্তির অনুশীলনগুলি** এবং (২) **ভক্তিপথের অন্তরায়গুলি** সম্বন্ধে মোটামুটি যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। ধর্ম্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত অতি সূক্ষ্ম জটিল রহস্যগুলি আপাততঃ তোমাদের বোধগম্য না হইলেও উহার অন্তর্গত সহজ সরল সত্যগুলি এই যে, আদর্শ ধর্ম্মজীবন অর্থাৎ সাধকজীবন যাপন করিতে হইলে তোমাদিগকে অবশ্যই সদ্গুরুর চরণাশ্রয়পূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও একান্ত অনুগত হইয়া নিজ নিজ চরিত্রে মানবোচিত সমস্ত সদ্গুণের সম্যক্ পরিপুষ্টি লাভ করিতে হইবে। নতুবা প্রকৃত সাধক জীবন গঠনের ভিত্তি-পত্তনই হইবে না। পূর্ব্বেই তোমরা শুনিয়াছ একমাত্র 'মনুষ্যত্ব'ই মানবের ধর্ম্ম। যে সমস্ত সাধকোচিত সদ্গুণের কথা এই গ্রন্থে প্রবন্ধাকারে আলোচিত হইল, সেইগুলির পরিপূর্ণ পুষ্টি সাধনের উপর সেই মনুষ্যত্বের অর্থাৎ মানবধর্ম্ম বা প্রেমধর্ম্মের উপলব্ধি নির্ভর করে। যে সমস্ত নীতির সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত না হইলে ধর্ম্মভাব বা ভক্তিভাব সাধকের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থায়ী হয় না, সেইগুলি সম্বন্ধে যে সকল কথা

আলোচনা করা হইল, ঐগুলির সারাংশ তোমরা অতি অবশ্য সর্ব্বদা মনে রাখিবে। আর যে সমস্ত দুর্নীতি বা অবনত প্রবৃত্তি প্রকৃত ভক্তিধর্ম্ম লাভের পথে মারাত্মক অন্তরায়-স্বরূপ অর্থাৎ যেগুলি সাধক-জীবনে উন্নতি লাভের পক্ষে প্রবল বাধা বিঘ্ন উৎপাদন করে, সেই ভক্তিপথের অন্তরায়গুলি অগ্রে সম্যক্ বর্জ্জন করিয়া তোমরা ভক্তিলাভের পথে—শ্রীভগবানের পথে—অগ্রসর হইবে।

দেখ, ভক্তের উপাস্য শ্রীভগবান্ পরম মঙ্গলময়। তিনিই জীবের চরম প্রাপ্তব্য লক্ষ্য বস্তু। জীবের সহিত তাঁহার একটা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিভালবাসার নিত্য-সম্বন্ধ বিদ্যমান। বলিতে কি, তাঁর তুল্য মানবের প্রিয়তম প্রিয়জন আর কেহ নাই। এমন যে পরম কারুণিক আনন্দময় শ্রীভগবান্, তাঁহার প্রতি একটা প্রগাঢ় আন্তরিক ভালবাসা—ভক্তি ও প্রেম—থাকাই আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু অজ্ঞানতা বা মায়া কর্তৃক অভিভূত হওয়ায় সেই প্রিয়তম শ্রীভগবানের সহিত আমাদের এই মধুময় সম্বন্ধবোধের অভাব হইয়া গিয়াছে; তাই তাঁর প্রতি আমাদের এই স্বভাবসিদ্ধ ভক্তি, প্রেম বা ভালবাসা ঠিক ঠিক আমরা উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না। অতএব দেখ, সেই পরমানন্দময় শ্রীভগবানের প্রতি আমাদের এই স্বভাবসিদ্ধ ভালবাসার ভাবের—ভক্তি ও প্রেমের—উদ্বোধন বা জাগরণ করাই আমাদের যাবতীয় সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তা।

ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে,—"ভক্তির্ভক্তস্য জীবনম্" অর্থাৎ একমাত্র 'ভক্তি'ই ভক্তের জীবন-স্বরূপ। শ্রীভগবানে প্রেমভক্তি বিনা ভক্ত জীবনধারণ করিতে পারে না; যেহেতু ভক্তিই ভক্তজীবনের সঞ্জীবনী। ভক্তসঙ্গে ভগবৎ-প্রসঙ্গের আলোচনায় যেরূপ নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়, সেরূপ পবিত্র আনন্দ আর কিছুতেই লাভ করা যায় না।

আদর্শ ভক্ত শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় যথার্থই বলিয়া গিয়াছেন,—

"কেবল ভকত সঙ্গে কৃষ্ণ কথা রসরঙ্গে
লীলা কথা ব্রজ রস পুরে।"

অর্থাৎ সাধক কেবল ভক্তসঙ্গে শ্রীভগবানের গুণ ও লীলা-কথা-প্রসঙ্গে পরমানন্দে কালাতিপাত করিবেন। অবশ্য ইহা সাধকজীবনে অতি উচ্চ অবস্থার কথা। বাস্তবিক, সেরূপ উন্নত অবস্থায় সাধকের ইহা বই করণীয় বা চিন্তনীয় আর কিছু থাকে না। যে প্রেমভক্তি লাভ সাধক ভক্তের একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, তাহা ভক্ত সঙ্গে ভগবৎ-গুণ-লীলা আলোচনা দ্বারাই লভ্য হয়; শ্রীভগবানের গুণ-লীলা কথার এমনই মহিমা।

অতঃপর ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা তোমাদিগকে সংক্ষেপে বলিতে ইচ্ছা করি। দেখ, প্রকৃত ধর্ম্মের—প্রেমধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মের—আচরণ অবশ্যই জীবের মনোরম আন্তরবৃত্তিনিচয়ের উদ্বোধন করিয়া দিবে। ধর্ম্মাচরণ যদি জীবের মনোরম আন্তরবৃত্তির পুষ্টি না করিয়া কেবলমাত্র কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি করিয়াই সীমাপ্রাপ্ত হয়, তবে সেরূপ ধর্ম্মাচরণ বৃথা পণ্ডশ্রম মাত্র বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মানবের হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ সুপ্ত অর্থাৎ অবিকশিত অতি মনোরম ও স্নিগ্ধ, আন্তরবৃত্তি-বিশেষের উদ্বোধন বা জাগরণই ধর্ম্মাচরণের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রত্যেক মানবের অন্তরে অতি স্নিগ্ধ, প্রাণস্পর্শী এবং মধুময় একটি 'ভাব' আছে; সেই আনন্দময় ভাবটির নাম—'ভক্তিভাব'। বর্ত্তমানে আমাদের অন্তরস্থ সেই মধুময় ভাবটি মায়ার আবরণে এক প্রকার আবৃত বা সুপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সেই সুমধুর ভক্তিভাবের জাগরণ অর্থাৎ বিকাশ ও অনুভবই ধর্ম্মানুশীলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; ইহা ব্যতীত ধর্ম্মাচণের অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।

জীবের উপাস্য-তত্ত্ব শ্রীভগবান্ সম্বন্ধে সাধক ভক্তের কিরূপ বোধ থাকা উচিত তাহা বলিতেছি মনোযোগ দিয়া শুন এবং বিষয়টি খুব ধীর ভাবে অভিনিবেশ সহকারে ধারণা করিতে চেষ্টা করিও। দেখ, শ্রীভগবান্ সকল জীবেরই উপাস্য। বহু জীব বহু ভাবে তাঁর উপাসনা ক'রে থাকেন। নিজেদের অধিকার এবং উপযুক্ততা অনুযায়ী বিভিন্ন ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগণ বিভিন্ন ভাবে তাঁহাদের উপাস্য শ্রীভগবান্‌কে ধারণা করিয়া থাকেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ 'প্রেমময়' অর্থাৎ 'মাধুর্য্যময়' বা 'আনন্দময়' ইহাই তাঁহার ভগবত্তার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং পরিপূর্ণতম আদর্শ। যতদিন এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শে মানব তাহার উপাস্য-তত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে ধারণা ও অনুভব করিতে না পারিবে, ততদিন মানবের অতৃপ্ত আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ কিছুতেই সম্ভব হইবে না।

যে পরিপূর্ণ মাধুর্য্যের এবং প্রেমের পূর্ণতম আদর্শ লইয়া সেই রসিকশেখর রসরাজ শ্রীভগবান্ **শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র** জীবের নিকট মূর্ত্তিমন্ত করুণা ও প্রেমের ঘনীভূত বিগ্রহ **শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ** রূপে প্রকটিত হইয়াছিলেন, তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর অন্য কোন আদর্শ মানবের ধারণায় আসে না; কাজেই যার ধারণা বা কল্পনাই হয় না অর্থাৎ মানব যাহা চিন্তা করিতে পারে না, তাহা মানবের চিন্তাশক্তির অর্থাৎ অনুভবের বিষয়ীভূত নয়। অতএব তোমরা স্থির জানিও যে, সেই করুণাময় এবং প্রেমময় শ্রীভগবানের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি বা প্রকাশ ঐ করুণাবতার শ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ-তত্ত্বে এবং এই মনোরম আদর্শই তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ। একথা আমি তোমাদিগকে কোনরূপ সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাবে বলিতেছি না—উদার সার্ব্বজনীন ভাবেই বলিতেছি। তোমরা স্থির জানিও যে, **প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর যে কে, এবং সেই 'প্রেমের ঠাকুর' জগৎকে**

কৃপা ক'রে কি যে অমূল্য প্রেম-সম্পত্তি প্রদান করিয়া গিয়াছেন, একথা অবশ্যই একদিন সমস্ত জগতের লোকের বুঝিয়া পড়িয়া লইবার বিষয় হইবে। 'শ্রীভগবান প্রেমময়'—এই কথা যে দিন মানুষ বুঝিবে, সেইদিন ধর্ম্মতত্ত্বের যাবতীয় অবান্তর ও জটিল অংশগুলি অর্থাৎ ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি ও বিভূতি প্রাপ্তি-কামনা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের দিকটা সমস্ত বাদ দিয়া কেবল বিশুদ্ধ মাধুর্য্যের দিকটা গ্রহণ ক'রে জীব প্রেমানন্দে বিভোর ও আত্মহারা হ'য়ে বাহু তুলে 'হরি' ব'লে নাচবে ও কাঁদবে। সাধক যেদিন যে শুভ মূহুর্ত্তে শ্রীভগবান্‌কে 'করুণাময়' ও 'প্রেমময়' ব'লে বুঝিবেন, সেইদিন তিনি ধন্য হইবেন, সেইদিন তিনি মুক্ত হ'য়ে যাবেন অর্থাৎ তাঁর হৃদয়ের সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হ'য়ে যাবে—সমস্ত গণ্ডগোল মিটে যাবে—তাঁর যাবতীয় ব্যতিব্যস্ততার সম্পূর্ণ অবসান হ'য়ে যাবে। আমার মনে হয়, **এমন কঠিন হৃদয় জগতে সৃষ্ট হয় নাই যাহা 'হরি' ব'লে বাহু তুলে কাঁদলে প্রেমে দ্রবীভূত না হয়।**

আরও দেখ, ভক্তিশাস্ত্র-মুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ **কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।**"

ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন,—

"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণম্॥"

এইরূপ আরও বহু প্রামাণিক শাস্ত্রগ্রন্থ সর্ব্ববাদীসম্মতিক্রমে সমর্থন করিতেছেন যে, সেই অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সেই সচ্চিদানন্দঘন প্রেমময় ভগবৎ-তত্ত্ব এবং প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের প্রকট লীলা দ্বারা সেই প্রেমময় ভগবৎ-তত্ত্বের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। বলিতে কি, **সেই সুগভীর রহস্যপরিপূর্ণ শ্রীকৃষ্ণ-তত্ত্বের**

কিঞ্চিৎমাত্রও আমরা কোন দিনই ধারণা ও বোধগম্য করিতে পারিব না, যদি সেই আনন্দলীলাময়বিগ্রহ শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের সুধামধুর লীলা-আলোচনার ভিতর দিয়া আমরা উহার অনুশীলন ও বুঝিবার চেষ্টা না করি। তোমরা এই 'করুণাময়', 'আনন্দময়' এবং 'প্রেমময়' আদর্শ ভিন্ন অন্য কোন আদর্শে তোমাদের উপাস্যতত্ত্ব শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিতে যাইও না অর্থাৎ তাঁর স্মরণ, মনন, ধ্যান ও ধারণা করিতে চাহিও না ; ইহাতেই তোমরা পূর্ণ পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারিবে। তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীমুখে ব'লেছেন ,—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

ভেবে দেখ দেখি, যে সমস্ত ভগবদ্ভক্ত সাধক, কেবলমাত্র প্রেম, ভক্তি ও ভালবাসা দ্বারা শ্রীভগবানের উপাসনা ও ভজনা করেন, তাঁদের নিকট গীতার এই অমর অক্ষয় সত্যবাণী কত বড় আশার কথা!

শ্রীভগবানের আদর্শ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইল। এইবার ভগবদ্ভক্তের আদর্শ সম্বন্ধে দুই একটি কথা তোমাদিগকে বলিতে ইচ্ছা করি, মন দিয়া শুন। তোমরা সাধন পথের পথিক, শ্রীভগবানের সাধন ভজন করিতেছ এবং 'ভক্তি' লাভ করিয়া 'ভক্ত' হইতে চাও ; কিন্তু ভক্তের আদর্শটি যে কিরূপ তাহা কি চোখের সামনে ধ'রে রেখেছ? দেখ, ভক্ত হওয়া বড় শক্ত ; যতদিন একটিও জীবের প্রতি তোমাদের বিদ্বেষ-বুদ্ধি থাকিবে, যতদিন আপামর সকলকেই ভালবাসার চক্ষে—করুণার দৃষ্টিতে—দেখিতে না শিখিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তোমরা 'ভক্ত' হইতে পারিবে না। আর এক কথা, ভক্ত শ্রীভগবানের করুণায় কিরূপ বিশ্বাসী এবং কত বেশী নির্ভরশীল হইবেন জান? জাগতিক যাবতীয় বিপদ, যাবতীয় দুঃখকষ্ট, সমকালে আসিয়া উপস্থিত

হইলেও ভগবদ্ভক্ত—"প্রভু আমার মঙ্গলময়"—এই বোধ সুদৃঢ়রূপে ধারণ ক'রে অটলভাবে অম্লানবদনে হাসিমুখে সব সহ্য করিবেন। আদর্শভক্ত এই সংসার মরুভূমি মাঝে একটি অতি স্নিগ্ধ সুশীতল অভয় ছত্র-স্বরূপ হ'য়ে বিরাজ করিবেন। তাঁর চলন, বলন, হাসি, দৃষ্টি এমন কি তাঁর প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি সবই কত মধুময় বলিয়া বোধ হইবে। বাস্তবিক, ভক্তকে দেখেই জীব সেই মকুন্দপদারবিন্দের সন্ধান পায়। মনে হয়, যাঁকে ভ'জে মানুষ এত সুন্দর হয়—এত স্নিগ্ধ ও মধুর হয়—না জানি তিনি কত সুন্দর! কত মধুর!

এক একজন ভগবদ্ভক্ত মহাপুরুষ জগতের কত উপকার করেন জান? জগতের কত ত্রিতাপদগ্ধ সন্তপ্ত ও অশান্ত জীব তাঁদের চরণপ্রান্তে—শান্তির শীতল ছায়ায়—বসিয়া তাপিত প্রাণ জুড়াইবার অবসর পায় এবং এই দুঃখকষ্টপূর্ণ মরজগতে থাকিয়াই সেই আনন্দময় নিত্যধামের সন্ধান পায়। শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-পূরিত-হৃদয় শ্রীমন্মাধবেন্দ্র পুরী, হরিনাম-জপ-সম্পত্তির সম্রাট্ শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, দৈন্যাবতার শ্রীল রূপ-সনাতন, জীবদুঃখকাতর শ্রীল বাসুদেব দত্ত, মূর্ত্তিমান্ বৈরাগ্য শ্রীল রঘুনাথ দাস, বিনয়ের খনি ও অকিঞ্চন শ্রীল শ্রীধর, ইষ্টনিষ্ঠ শ্রীল অনুপম ও শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর—যাঁহাদের কথা ইতঃপূর্ব্বে তোমরা শুনিয়াছ—এই সমস্ত এবং আরও কত শত শ্রীগৌরাঙ্গগতপ্রাণ আদর্শ ভক্তের সমভূমিস্থ কত উর্দ্ধে তাহা তোমরা কি একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ? ইঁহাদের শ্রবণমঙ্গল পবিত্র চরিত-কথা আলোচনা করিলে তোমরা মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া যাইবে। মনে হইবে, এই সমস্ত জগতপাবন আদর্শ ভক্তের সমুন্নত অমর আত্মা কোন্ সমুজ্জ্বল পুণ্যধাম হইতে এই মর-জগৎ পবিত্র করিতে—এই ত্রিতাপ-দগ্ধ অশান্ত জগতের শান্তি বিধান করিতে—নেমে এসেছিলেন। ইঁহাদের প্রেমের, সহিষ্ণুতার, দৈন্যের, পরদুঃখকাতরতার,

বৈরাগ্যের, বিনয়ের, ইষ্টনিষ্ঠার অর্থাৎ ভক্তজনোচিত সদ্‌গুণরাশির পরিপুষ্টির কথা স্মরণ করিলে প্রাণ যুগপৎ বিস্ময়ে ও পুলকে শিহরিয়া উঠে। শ্রীভগবানে ভক্তি প্রেম লাভ যদি তোমাদের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং তোমরা যদি জীবনে পরমানন্দ লাভ করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইতে চাও, তবে এই সমস্ত ভগবদ্ভক্তের সমুজ্জ্বল আদর্শ সর্ব্বদা সম্মুখে রাখিয়া এবং তাঁদের চরণে নিত্য প্রণত হইয়া নিজ নিজ সাধন পথে অগ্রসর হইও।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, ধর্ম্মাচরণ সম্বন্ধে তোমরা সংক্ষেপতঃ নিম্নলিখিত কএকটি সার সত্য উপদেশ সর্ব্বদা স্মরণ রাখিও। এবং এইগুলিকে আদর্শ ধর্ম্মজীবন গঠনের মৌলিক ভিত্তি-স্বরূপ বলিয়া মনে করিও। যথা,—

১। 'মনুষ্যত্ব'ই জগতের মূলধর্ম্ম বা মানবধর্ম্ম।

২। 'ঈশ্বর-বিশ্বাস', 'ঈশ্বরে প্রেম ভক্তি' এবং 'মানবোচিত সদ্‌গুণরাশীর সম্যক্ পরিপুষ্টি'ই সেই মনুষ্যত্ব।

৩। 'ধর্ম্ম' নীতির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

৪। নীতিজ্ঞানশূন্য ধর্ম্মাচরণ বর্জ্জনীয়।

৫। মঙ্গলময়, আনন্দময় এবং প্রেমময় শ্রীভগবান্‌ই জীবের উপাস্য তত্ত্ব-বস্তু।

৬। 'প্রেম' বিনা ধর্ম্ম নাই।

৭। 'নাম' বিনা সাধন নাই।

৮। 'শ্রীগুরু' বিনা বন্ধু নাই।

শ্রীশ্রীশুকমুখামৃত দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৭	২৩	ষে	যে
২১	৩	তঁাকে	তাঁকে
২৫	৬	ষত	যত
২৭	৯	ষে	যে
৩২	৬	তমগুণের	তমোগুণের
৩৩	৮	দীনদয়াদ্র	দীনদয়ার্দ্র
„	৯	মূচ্ছিত	মূর্চ্ছিত
„	১৩	ন।	না
৩৪	১৪	ষায়	যায়
„	২৪	ষাওয়া	যাওয়া
৩৫	১৩	ষে	যে
„	১৮	পর্ষ্যন্ত	পর্য্যন্ত
৩৬	১৫	ষে	যে
„	২২	ষার	যার
„	২৩	অপকর্ষতা	অপকর্ষতা
৩৭	৯	কাহায়ও	কাহারও
„	১১	কয়িলে	করিলে
৪০	১৬	ঠাকুয়	ঠাকুর
৪১	৫	অরশ্য	অবশ্য
৪২	৬	যায়ী	যায়

পৃষ্ঠা	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৫	১৪	বে	যে
৪৭	১	যে	যে
৫৬	৩	তমগুণের	তমোগুণের
„	৪	তমগুণের	তমোগুণের
৫৮	২২	দুবৃত্ত	দুর্বৃত্ত
৫৯	১৮	ব'লে	ব'লে
৬১	৬	জগতকে	জগৎকে
„	১৪	জ্বালা পোড়াময়	জ্বালাপোড়াময়
৬৪	১১	হন	হন ;
৮৩	১৪	প্রয়োজন ও	প্রয়োজনও
৮৯	২৪	সুক্ষ্ম	সূক্ষ্ম
৯১	৫	বদ্ধিত	বর্দ্ধিত
১০১	১০	রখিয়া	রাখিয়া
১০২	১২	সত্তেও	সত্বেও
১১৭	Page Heading	ধর্ম্মভীরুতা	শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও জ্ঞানবিচার
১২১	২৪	কর্ম্মক্ষেত্রে	কর্ম্মক্ষেত্রে নামিতে
১৪৭	৭	ডেঙ্গায়	ডাঙ্গায়
১৬৮	১৩	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাদি
১৭৩	১৯	সহমূ	সমূহ
১৮১	৩	তোমাদিকে	তোমাদিগকে
১৯০	২১	শ্রীশ্রীগুরুমুখামৃত ২য় খণ্ড	শ্রীশ্রীগুরুদেবকথামৃত ১ম ভাগ